

নিউকালাই তিথানভ



গল্পসম্ভার



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

‘আমায় কবি করেছে অক্টোবর বিপ্লব।
বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ও
সরিক হবার মহাসৌভাগ্য হয়েছে আমার,
অস্ত্র হাতে রক্ষা করেছি আমাদের
সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমি, দেখেছি তার
মৃত্যুহীন জয়লাভ, দেখেছি কী ভাবে নতুন
প্রেরণায় গর্দ্বিষে উঠছে জীবন, প্রসারিত
হচ্ছে মদ্রুত্তি ও গগতন্তের শিবির...’

নিউকালাই তিথানভ



গল্পসম্ভার



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্কসজ্জা: লেভ গ্রিৎচিন

Н. ТИХОНОВ
Рассказы
На языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৪

T $\frac{70302-272}{014(01)-74}$ 592—74

সূচি

ভূমিকা	৫

ভারত কাহিনী

ওকে অর্মানি থাকতে দিন	২৩
বসন্তদিন	৩০
বিপ্লি	৪০
হাতি	৫১

প্রাচ্যের পথ

মহানদী	৫৯
সিমন বলশেভিক	৮৪
ঘোড়দৌড়	১২১

লেনিনগ্রাদ কাহিনী

দ্বৈরথ সমর	১৫৫
ভেলার ওপর	১৫৮
মা	১৬৩
বামনরা আসছে	১৬৯
অগ্নিকুণ্ড	১৭৫
কুহ	১৮১
চালের ওপরে	১৮৯
নিজামী	১৯৭
শীতের রাতে	২০৩
পাহাড়ের ছেলেমেয়ে	২০৭
‘এখনো বেঁচে’	২১৪
বসন্ত	২২৪
বৃদ্ধ যোদ্ধা	২৩২
মুহুর্ত	২৩৭
মেয়েটা	২৪৯
নবজাতক	২৫৪
পথে দেখা	২৫৮
সিংহের থাবা	২৬২
সংসার	২৬৭

হাত	২৭২
আপেল গাছ	২৭৭

আত্মকথা

প্রথম লেখা	২৮৫
প্রাসাদ	২৯২
নেভিস্কি সরণী	২৯৯

ভূমিকা



অক্টোবর মহাবিপ্লবে যার জন্ম, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির জন্যে সোভিয়েত জনগণ ও সমগ্র মানবসমাজের উন্নত ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রামে যা বিকশিত ও সুপরিণত সেই সোভিয়েত সাহিত্যের প্রকৃতিগত অনেক শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ন. তিখনভের রচনায়, সমাজচেতনায় তা সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধত আদর্শের দিকে ধাবিত।

‘সাহিত্য-কর্ম চায় গোটা মানুষটাকে, চায় চড়াশু প্রয়াস, প্রবল অনুরাগ, অক্লান্ত উদ্যোগ, অবিরাম দাহ, বিকাশ, ও সম্পূর্ণতা’ — ন. তিখনভের এই উক্তি তাঁর সমগ্র জীবনের মন্ত্রবাণী। তাঁর সমস্ত রচনাই হল জীবনের সঙ্গে লেখকের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিলিত সমৃদ্ধ নাগরিক কর্তব্যবোধ ও স্বাদেশিকতা তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। গোটা সোভিয়েত সাহিত্যেরই একটা বিশেষ গুণ এটি।

সর্বদাই তাঁকে টানে দ্বন্দ্ব সঙ্কল্পের মানুষ, বীর্যবান চরিত্র, সর্বদাই তিনি গিয়ে দাঁড়ান বর্ণাঢ্য, গতিময়, পূর্ণতেজা জীবনের গভীরে। ‘বৃহৎ ইচ্ছাশক্তির মানুষ দেখে, বীর দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত হন’ — তিখনভ সম্পর্কে গোর্কি এই কথা লিখেছিলেন ১৯২৩ সালেই। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বহুচর ও বহুমুখী: কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক। সত্য করেই লোক সাহিত্যিক তিনি, নিজে তিনি এসেছেন জনগণের গভীর থেকে, তাঁর রচনায় কায়া ধরেছে জনগণের ভাবনা ও ভাগ্য।

পিটার্সবুর্গে (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) কারুজীবী পরিবারে ন. তিখনভের জন্ম হয় ১৮৯৬ সালে। ছোটো থেকেই তিনি

রাজধানীর কারখানা এলাকার জীবন, গরিব ও শ্রমজীবীদের অভাব-অনটনের সঙ্গে পরিচিত। বই পড়েন তিনি অনেক। নিজের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘বই ছিল আমার প্রধান সহচর। জীবনে কী হব সেটা আমায় ভাবতে শেখায় বই।’ তরুণ তিখনভ ছিলেন কবিতার ও জীবনের ভক্ত, শুদ্ধ ও ন্যায়ের প্রত্যাশী, জনগণের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত, ভাবুক ও রোম্যান্টিক।

শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। স্বেচ্ছাসেবী হয়ে তিখনভ যান ফ্রণ্টে, কিন্তু এই লক্ষ্যহীন রক্তপাতে দ্রুত চৈতন্য হয় তরুণ ভাবুকের। সত্যকার বীরত্বের দৃষ্টান্ত তিনি পেলেন না যুদ্ধে, কেননা তা ছিল জনস্বার্থের একান্ত প্রতিকূল। যুদ্ধেই তিখনভ লিখতে শুরু করেন। ‘নক্ষত্রের তলে’ নামে তাঁর যে সমর কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় মাত্র ১৯৩৫ সালে, তাতে ফুটে ওঠে একটা নিরুপায় সুর। যুদ্ধকে তিনি অভিহিত করেন ‘রক্তাক্ত বিমূঢ়তা’, মনে করেন ‘...যুদ্ধের চেয়ে নিষ্ঠুর আবহাওয়া, নৈরাশ্যজনক আবহাওয়া বিশ্বে আর নেই।’

এল ১৯১৭ সাল। ‘অরোরা’র কামান গর্জনে সারা বিশ্বে ঘোষিত হল মানব ইতিহাসের এক নব যুগোদয়। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই তিখনভ ঘটনাবলীর মাঝখানে। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তিনি যোগ দেন লাল ফোঁজে, গৃহযুদ্ধে নেন সক্রিয় অংশ। বৈপ্লবিক যুদ্ধের ঝঞ্ঝায় শাণিত হয়ে ওঠে তাঁর লেখনী, সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর আদর্শ আর শিল্পরুচি। গৃহযুদ্ধ ও রাশিয়ায় সোভিয়েত রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে তিখনভের কবিতাগুলি জীবনের বরাভয়, বিজয়ের অটল বিশ্বাস, শত্রুর প্রতি ঘৃণা, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রেরণায় ঝঙ্কত। ১৯২২ সালে প্রকাশিত ‘ওর্দা’ ও ‘সঞ্জীবনী’ কবিতা-সংকলনে তিনি এঁকেছেন বিপ্লবে প্রসূত বলিষ্ঠ, পৌরুষপ্রাণ মানুষের ছবি। ‘সঞ্জীবনী’ গ্রন্থের শীর্ষলিপিতে তিনি তুলে দেন বিখ্যাত রুশ কবি আলেক্সান্দর

রকের স্ফুটিত বাণী ‘রণই চিরন্তন! স্বস্তি শূন্য মায়া’ — এতে
তাঁর তখনকার মনোভাব সন্দেহ ফুটে উঠেছে।

তিখনভের এই প্রথম সংকলনগুলির অনেক স্তবকই হয়ে
দাঁড়িয়েছে প্রবচনের মতো। যেমন শব্দর শেষ ঘাঁটি জয় নিয়ে
তাঁর ‘পেরেকপ’ কবিতার দুটি ছত্র:

মরছে তবুও
এক পা এগিয়ে মরে।

বিপ্লবী নাবিকদের নিয়ে তাঁর ‘পেরেকের গাথা’ খুবই জনপ্রিয়
হয় সর্বাপেক্ষে তার শেষ দুটি পঙক্তির দীপ্তোজ্বলিত:

এই লোকেদের ধাতুতে
যদি পেরেক হয়,
অমন কড়া পেরেক
কোথাও পাবার নয়।

‘ওর্দা’ এবং ‘সঞ্জীবনী’ সেসময়কার সোভিয়েত সাহিত্যের
প্রথম সারিতে তুলে আনে তিখনভকে।

শেষ হল গৃহযুদ্ধের গর্জন, নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নামল
নবজীবন নির্মাণে। সংগ্রামে ও শ্রমে দেখা দিল নতুন মানুষ,
জীবনকে বদলে দিয়ে যারা বদলে যাচ্ছে নিজেরাই। সোভিয়েত
সাহিত্যের সামনে দাঁড়াল অতি দায়িত্বশীল একটা কাজ — দুনিয়া
কাঁপানো ঘটনাগুলিকে লিপিতে বাঁধা। প্রথম সেই সোভিয়েত
লেখকদের মধ্যে তিখনভ অন্যতম, যাঁরা আকৃষ্ট হন প্রাক্তন জার
রাশিয়ার পশ্চাৎপদ অঞ্চলে, ককেশীয় প্রজাতন্ত্র ও মধ্য এশিয়ায়।
তাঁর সমস্ত রচনায় প্রাচ্য প্রসঙ্গ একটা প্রধান স্থান নিয়েছে। একবার
তিনি বলেছিলেন, ‘মনে-প্রাণে আমি প্রাচ্যের লোক।’ তাঁর এক
চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এশিয়াকে আমি বহু দিন
থেকে, বহু দূর থেকে ভালোবেসে এসেছি।’

তিনি তাঁর নায়ক খোঁজেন সোভিয়েত প্রাচ্যের প্রজাতন্ত্রে, নতুন জীবন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ তীব্র ও আপোসহীন সংগ্রাম চলেছিল এখানেই। সদ্দুর এইসব এলাকায় একাধিক সফর করেন তিনি, সীমাহীন রুশ ভূমিতে সোভিয়েত রাজের জয়যাত্রার মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। এর ফলে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হল তাঁর গদ্য রচনা-সংকলন ‘ঝুঁকিদার লোক’, সোভিয়েত প্রাচ্য নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৯২৮ সালে বইটি পড়ে গোর্কি মন্তব্য করেছিলেন: ‘ন. তিখনভ খাশা গদ্য লেখেন।’ তিখনভের তুর্কমেনিয়া ভ্রমণের ফলশ্রুতি — রেখাচিত্র ‘যাষাবর’ এবং কবিতাগুচ্ছ ‘ইউর্গা’; মধ্য এশিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণ নিয়ে এই বইদুটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। সমৃদ্ধ প্রত্যক্ষ মাল-মসলার ভিত্তিতে লেখা যেমন তাঁর বাস্তবধর্মী গদ্য তেমনি রোমান্টিকতায় উদ্দীপিত কবিতা, উভয়েরই বৈশিষ্ট্য হল একটা তীক্ষ্ণ সমাজবোধ, টের পাওয়া যায় কালের ঐতিহাসিক ছন্দ।

তিখনভের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় ককেশাস অঞ্চল। তাঁর চোখে এটা তেজস্বী, নিভাঁক, সং, আত্মোৎসর্গী মানুষের এলাকা, গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাজের জন্যে ঘোরতর সংগ্রামের ক্ষেত্র, সমাজতন্ত্রের বিপুল নির্মাণ প্রাঙ্গণ। চিরন্তন তুষারশীর্ষ পর্বত আর দুর্গম ভূগু, অতল গহ্বর, আর সুফলা উপত্যকা, বোড়ো নদী আর জলপ্রপাতের এই দেশটার কাব্যপ্রতিমা তিখনভের লেখায় ফুটে উঠেছিল বিশেষ দশকের গোড়াতেই।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলোর সময় সারা দেশ যখন পরিণত হয় এক বিশাল নির্মাণক্ষেত্রে, তিখনভের লেখায় ককেশাস প্রসঙ্গ তখন একটা নতুন ব্যঞ্জনা নেয়। বিপ্লবোত্তীর্ণ যে মানুষেরা সমাজতন্ত্র নির্মাণের মহাযজ্ঞে কাঁধ দিয়েছে, তারা তাঁকে টানে। ককেশাসের আগুয়ান একটি লোক বলশেভিক সিমনের চরিত্র সোভিয়েত সাহিত্যে একটা পাকা ঠাঁই করে নিয়েছে। তিখনভ

দেখিয়েছেন কি ভাবে উদ্দীপিত সচেতন শ্রমে বদলে যায় প্রকৃতি, গড়ে ওঠে নতুন মানব, ভেঙে পড়ে সাবেকী অচলায়তন, মানুষের পথ রোধ করা পাহাড় ফুটো করে রাস্তা পাততে গিয়ে অদৃশ্য হয় মধ্যযুগীয় রীতিনীতি, উদ্দাম নদীকে বশ করে মানুষ বদলে নেয় নিজের খাত, গোটা জীবন। তিখনভের ‘বলশেভিক সিম্ন’, ‘কুয়াশায় কসম’ আখ্যান এবং ‘কাখেতীয় কবিতা’, ‘পর্বত’ কবিতা-সংকলন সোভিয়েত সাহিত্যের স্বর্ণভান্ডারে উজ্জ্বল রহ্ন।

সমরোত্তর লেখাতেও তিখনভ ককেশাস প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন।

এই সময় তিখনভ ককেশীয় কবিদের অনুবাদক-কবি হিশেবে এগিয়ে আসেন। খুবই একটা গুরুত্ব আছে তাঁর এই অনুবাদ কর্মের। তাঁরই কল্যাণে বহু ককেশীয় কবি সারা সোভিয়েত দেশে এবং বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন।

তিখনভের ককেশাস প্রসঙ্গে চিরায়ত রুশ সাহিত্যের সেরা ঐতিহ্যের অনুবর্তন ও সৃজনী নবীভবন চোখে না পড়ে পারে না। বিশেষ করে ককেশাস নিয়ে লেরমন্তভের কাব্যমণ্ডল তাঁর মনের সঙ্গে খুবই মেলে। তাঁর ‘পর্বত’ কবিতাগুচ্ছে লেরমন্তভের ‘মোর কাছে পুণ্যময় ককেশীয় পর্বত’ এই উক্তি শিরোলিপিতে দিয়ে তিনি যেন ঐ রুশী মহাকাবির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ঘোষণা করেছেন।

তিরিশের দশকে যখন বিশ্বের ওপর ঘনিয়ে আসে নতুন বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ, তখন তিখনভের লেখায় একান্ত তীক্ষ্ণতায় ও বাস্তবতায় ঝঙ্কার দেয় যুদ্ধবিরোধী উচ্চারণ। তারুণ্যে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত কসাইখানায় তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটেছিল, তখন থেকে আজো পর্যন্ত সারা জীবন তিনি যুদ্ধ ও প্রতিগ্র্যার তামস শক্তির ধিক্কারে অক্লান্ত। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকদের কাছে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের বিষয়বস্তু হল আন্তর্জাতিকতা।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ সফরের

পর বেরয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘বন্ধুর ছায়া’। তাঁর নিজের ভাষায়, এতে তিনি ‘আসন্ন ফ্যাসিস্ট বিভীষিকার কাছে আত্মবিক্রীত ও আত্মসমর্পিত, হতবিহ্বল ও মৃত্যুদণ্ডিত ইউরোপের ছবি দিতে চেয়েছেন’। ‘বন্ধুর ছায়া’ বইটি উদ্বেগে এবং রক্তাক্ত ট্রাজেডির পূর্বানুভূতিতে সশঙ্ক, তবে নৈরাশ্যবাদী নয়: আড়ষ্ট নিখর ইউরোপে কবি খুঁজেছেন এমন লোক, ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের মূখের ওপর যারা বলে ‘না’। প্যারিসের বাহ্য সচ্ছলতার পেছনে, তার ফুল আর বাদাম-গাছের তলে তিখনভ দেখেছেন বন্ধুকের ছায়া পড়ছে নিশ্চিন্তে ক্রীড়মান শিশুদের পিঠে। রোমাঁ রোলাঁ আর আঁরি বারবুস, টি. ড্রেইজার আর রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক খ্যাতনামা বাণীকারের সঙ্গে একত্রে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন: বিশ্বের ওপর ভয়াবহ বিপদ আসন্ন, ডাক দিয়েছিলেন ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, শান্তি এবং বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে মৈত্রীর জন্যে।

এল প্রলয়ংকর ১৯৪১ সাল। বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্যাসিস্ট দঙ্গল হানা দিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। মাতৃভূমির মর্যাদা ও মূর্ত্তির জন্যে, সারা মানবজাতির শৃঙ্খল-মোচনের জন্যে শুরু হল সোভিয়েত জনগণের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ। ফ্যাসিজমের সঙ্গে মৃত্যুপণ আলিঙ্গনে সমস্ত সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন সোভিয়েত লেখকেরাও, লেখনীর অস্ত্রে তাঁরা সোভিয়েত মানুষের মনে জাগিয়েছেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই দেশপ্রেমিক সোভিয়েত লেখকদের প্রথম সারিতে ছিলেন নিকোলাই তিখনভ। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই ‘লেনিনগ্রাদ প্রাভদায়’ প্রকাশিত কবিতায় তিনি লিখলেন:

যুদ্ধে আগত শত্রু জানো,
কুসুদমিত দেশে খজা হানো —
সামনে কেবল ধ্বংস তোমার...

নয় শত দিনব্যাপী লেনিনগ্রাদ অবরোধের সেই বীরত্বের দিনে তখনও ছিলেন লক্ষ লক্ষ লেনিনগ্রাদীর সঙ্গে একত্রে, যারা তাঁর ভাষায়, ‘ভাবে না নিজের জীবন নিয়ে, ভাবে নগরীর ভাগ্যে’। পরে তিনি লিখেছিলেন, ‘লেনিনগ্রাদের অধিবাসী লোকেরা পরিণত হয় একটি পরিবারে, একটি অভূতপূর্ব যৌথ... সবাই হয়ে দাঁড়ায় ফ্রন্ট নগরীর যোদ্ধা।’ এবং ‘আমি হয়ে উঠি কঙ্কালের মতো শীর্ণ, তাতে ছিল শুধু হাড় আর দুর্মর আশাবাদ।’ তাঁর শহরবাসী লেনিনগ্রাদীদের নিয়ে তাঁর রেখাচিত্র, কাহিনী, কবিতাগুলি সঞ্জীবনী আশাবাদ ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত। নায়কেরা তাঁর কল্পিত নয়, অস্তিত্ব তাদের বাস্তবে। অসাধারণ কোনো লোক তারা নয়, একেবারে সহজ সাধারণ মানুষ। বীরত্ব তাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল চলতি, দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। তা না করে তারা স্নেহ পারে নি।

লেনিনগ্রাদ অবরোধের বীরোত্ত্বকে তখনভের ‘কিরভ সঙ্গে আছেন’ কাব্যটির স্থান অক্ষয়। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সাত বছর আগে তাঁর স্ব-নগরীতে স. ম. কিরভ নিহত হন শত্রুর হাতে, লেনিনগ্রাদবাসীরা তাঁকে ভালোবেসে ডাকতেন ‘মিরোনিচ’ বলে। লেনিনগ্রাদের ১৯৪১—১৯৪২ সালের উচ্চাঙ্গ শীতের মধ্যে লেখা তখনভের এই কবিতায় সেই দুর্জয় বলশেভিক একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। তুষার-ঝঞ্ঝায় আলোড়িত, শীতাতর্, ট্যাঙ্ক-প্রতিবন্ধকে কণ্টকিত, পরিখা, ডাগ-আউট, ব্যারিকেডে পরিবেষ্টিত, ফ্যাসিস্ট বোমা ও গোলায় বিধ্বস্ত লেনিনগ্রাদে কিরভ পরিদর্শন করছেন লেনিনগ্রাদীদের, বুক দিয়ে যারা রুখছে তাদের নগরকে। শত্রুর সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে লেনিনগ্রাদীদের পুরোভাগে এগিয়ে চলেছেন কিরভ, তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছেন কবি:

মধ্যরাতের বিমান হানায়
গোলা গর্জন হোক ভৈরব,

লেনিনগ্রাদের লৌহনিশায়
আছেন কিরভ, আছেন কিরভ।
ফৌজী ওভারকোটে সম্মুখে
সেনাপতি তিনি, পেছনে বাহিনী,
বরাবরকার মতো রণে রুখে
মুক্ত কদমে চলেছেন তিনি।

সমরোত্তর সোভিয়েত সাহিত্যে তিখনভ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। শান্তি এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের প্রসঙ্গটি আরো বিকশিত হয় তাঁর মধ্যে। বহু দেশ সফর করেন তিনি, পরিচিত হন বহু জাতির জীবনের সঙ্গে, আর প্রতিটি পর্যটনই তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক নতুন শিল্পাবিস্কার, দেখা দেয় নতুন রচনা। সোভিয়েত জনগণের ভাগ্যকে তিনি জড়িয়ে নেন সমগ্র মানবজাতির নিয়তির সঙ্গে, স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা তাঁর কাছে এক হয়ে মিলে গেছে।

* * *

ন. তিখনভের সারা জীবনের রচনায় ভারতের স্থানটি অনন্য। ভারত প্রসঙ্গ নিয়েছেন বহু সোভিয়েত লেখক, তাঁদের মধ্যে তিখনভ স্বাধিকারেই অগ্রগণ্য।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম দিককার ‘ভারত’ কবিতায় তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ‘নীলকান্ত রজনীতে ধান্যবর্ণ শোভামাঝে বুক ভরি তৃপ্তিতে’, তাঁর ইচ্ছে, ‘পুত-প্রাচীন মর্মরে দিই পা’।

যে রোম্যান্টিক কুহেলী তখন ভারতকে ঘিরে ছিল, তা সত্ত্বেও নবীন কবির চোখে ভারতবাসীর আসল জীবন এঁড়িয়ে যায় নি, দঃখ, দুর্দশা, সংগ্রাম ও আশায় যা পরিপূর্ণ। ভারতের জাগরণ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, নিজের প্রথম দিককার কবিতায় তা ফুটিয়েছেন। এদিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য তাঁর অপপ্রকাশিত একটি কবিতা ‘মৃত্যুদণ্ড’ (১৯১৪), যা তিনি লিখেছিলেন রুশী

শিল্পী ভেরেশ্যাগিনের ‘ভারতে ইংরেজদের সন্ত্রাস’ নামক বিখ্যাত চিত্রটির প্রেরণায়। গত শতকের আশীর দশকের গোড়ায় বিদ্রোহী ‘নামধারী’ সম্প্রদায়ের নেতাদের ওপর ঔপনিবেশিক রাজের বর্বর অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে ছবিটিতে। বিদেশী রাজকে অভিসম্পাত দিয়ে প্রাণ দিচ্ছেন স্বাধীনতার যোদ্ধারা, স্বদেশের আসন্ন মুক্তিতে তাঁদের বিশ্বাস অটল। আরো শত শত, হাজার হাজার ভারতীয় দেশপ্রেমিক, স্বদেশের মুক্তির সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, যাঁদের নিয়ে কবিতা ও গান বেঁধেছেন ভারতীয় কবিরা, তাঁদের কথা তিখনভ মনে করিয়ে দিয়েছেন কবিতাটিতে।

বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই ঘটনাবলীর মাঝখানে দাঁড়িয়েও, সৌভিয়েত সাহিত্যের উদয় ও বিকাশে সক্রিয় অংশ নিয়েও তিখনভ ভারতের কথা কখনো ভোলেন নি, কান পেতে শুনছেন তার কণ্ঠস্বর, খুঁজে পেয়েছেন তাতে নতুন নতুন সুর। বিপ্লবের অল্প পরেই ভারত নিয়ে, ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ নিয়ে লেখা তাঁর কবিতা কেমন যেন মিলে যায় ভারতের বিপ্লবী কবিদের রচনার সঙ্গে, হয়ে দাঁড়ায় যেন এক অখণ্ড কাব্যিক ইতিবৃত্ত, যাতে বন্দিত ভারতীয় জনগণের জাগৃতি, নব পুরুষের, জনগণের সৌভাগ্যের লক্ষ্যে সচেতন যোদ্ধার উদয়। সে সময় আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তিখনভের ‘সামি’ কবিতা। এতে কবি ভারতের একটি গরিব ছেলের প্রাণ ধরতে চেয়েছেন, দুনিয়া দেখতে চেয়েছেন তার চোখ দিয়ে। দুঃসহ ছেলোটের জীবন, মানুষ বলে তাকে ধরা হয় না, গোরা সাহেব তাকে পেটায় ছিড়ি দিয়ে। একদিন এই আতুর অভাগা ছেলোট শুনলে কোথায় এক দূর দেশে, হিমালয়ের ওপারে থাকেন লেনিন নামে একটি মানুষ, গরিবের রক্ষক, পিটুনি ও গালাগালি থেকে তিনি তাকে বাঁচাতে পারেন। লেনিনকে সে পূজা করতে শুরু করলে। লেনিনের কথা ভেবে, তাঁর অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস করে আশা পায় সে, বাঁচতে পারে।

প্রসঙ্গত বিশ ও তিরিশের দশকের বহু ভারতীয় কবিও লেনিনকে দেখেছেন জনগণের রক্ষক হিশেবে।

১৯২০ সালে লেখা ‘ভারত স্বপ্ন’ কবিতায় তখনও ভারতবাসীর বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ দেখিয়েছেন। ভারতে কখনো না গেলেও এতে দেশটার একটা সত্য, অনুভবযোগ্য চিত্র আঁকতে পেরেছেন তিনি। এখানে আর প্রাচীন মন্দির আর মসজিদ, ভারতীয় নিসর্গের কুহকী শোভায় তিনি আকৃষ্ট নন। কল্পনায় তিনি চলে গেছেন ভারতে, হাঁটছেন অমৃতসরের রাস্তায় — দেখছেন নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের ওপর বর্বর গুলিবর্ষণ। আপনা থেকেই চিন্তা তাঁর চলে যায় স্বদেশের ঘটনায়, মনে পড়ে ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারির ‘রক্তান্ত রবিবার’, শীত প্রাসাদের সামনে জারের কাছে ন্যায় বিচারের প্রার্থনায় আগত লোকেদের যখন জারের হুকুমে গুলি করে মারা হয় শয়ে শয়ে।

মনে পড়ে সেই গুলি-বেঁধা জানুয়ারি,
রক্তের ছোপ বৃথায় যায় নি তারই।
ভারতীয়দের ভাগ্যেও এক হীন
যমদূত এসে মরণ ছড়ায় কি করে?
নয় তারিখের সেই জানুয়ারি দিন
তের তারিখের এপ্রিলে এল ফিরে।

কবির কাছে রুশী ও ভারতীয় যমদূতেরা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও রুশী জার আর তাদের যত দালালেরা সমান ঘৃণ্য। রুশ জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে তিনি মিলিয়ে দেন ভারতীয়দের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে।

এই সময় অমৃতসরের রাস্তায় তাঁর সঙ্গে এক তরুণ ভারতীয়ের দেখা। একে তিনি চেনেন ‘ছেলেবেলা থেকেই’। ছেলোটি হয়ত সেই ‘সামি’ই, বড়ো হয়ে উঠেছে, হয়ত-বা সেই ভেরেশ্যাগিনের ছবির তরুণ বিদ্রোহী, কামানের মুখে বেঁধে যাকে অন্যান্য বিদ্রোহীদের

সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা, কবির যাদুকর স্বপ্নে ফের বেঁচে উঠেছে। ছেলোটর হাত ধরে কবি বসেন প্রাচীন মন্দিরের পৈঠায়। বগুনা ও সংগ্রাম আর আশায় ভরা তার জীবনের কথা সে শোনায় রুশ কবিকে। কবির ‘নিবিড়’ বোধ হল ‘এই আনন্দে যে ছেলোট বেড়ে উঠেছে’ ‘স্পর্শতার তীক্ষ্ণ দীপ্তি’ তার, হয়ে উঠেছে সত্যিকারের যোদ্ধা, তাই ভারতের মুক্তি আর দূরে নয়।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তিখনভ ভারতে আসেন সোভিয়েত শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে। তিখনভের সঙ্গে এই প্রতিনিধিদলে থাকার সৌভাগ্য আমারও ঘটেছিল। ‘বসন্তদিন’ এই প্রতীকী শিরোনামার রেখাচিত্রটিতে তিখনভ একেছেন পঞ্চাশের দশকের ভারত, সে ভারত নয় ‘যেখানে ঘুমায় শ্লাঘা ও লজ্জা,’ কৈশোর থেকেই যা দেখবার জন্যে অধীর স্বপ্ন ছিল তাঁর — এ এক নতুন স্বাধীন ভারত, যার জনগণ হয়ে উঠেছে নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। তিনি লেখেন: ‘আগত মহাবসন্তের দিন — মহাভারতের বসন্ত, তার আলো, জনকল্যাণে তার তাপ কেড়ে নেবার সাধ্য নেই কারো!’

ভারতীয় লেখক খাজা আহমদ আব্বাস ন. তিখনভকে অভিহিত করেছিলেন শান্তিদূত। কথাটা সত্যি। আমাদের দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে, সোভিয়েত ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে মৈত্রী ও সমঝোতার বিকাশে তিখনভের ভূমিকা বিপুল। মনে পড়ছে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের সোভিয়েত জয়ন্তী কমিটির সভাপতি হিসেবে কতখানি তিনি করেছিলেন।

আর অর্ধশতক আগের মতো আজো তিখনভ প্রগতিশীল ভারতীয় লেখকদের সমধর্মী। নব ভারতের যোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি একই সারিতে।

তাঁর সমগ্র সচেতন জীবন যাবৎ, সৃজনের প্রথম প্রয়াস থেকে তিখনভ ভারতের কণ্ঠস্বরে উৎকর্ণ। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি প্রবেশ

বরাবরের মতো ন. তিখনভ এখনো শক্তি, সৃজন-পরিকল্পনা, উদ্যোগ আর জীবন-তৃষ্ণায় নবীন। বয়স বা খ্যাতিতে তাঁর বদল হয় নি। চিরকালই তিনি নিরহংকার, সহজ, সদালাপী, সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। তাঁর মনোযোগী দৃষ্টি ও স্নেহ হাসিতে মনের ভার কেটে যায়, জীবন ও কর্মে প্রেরণা পায় লোকে।

* * *

বর্তমান গ্রন্থে ন. তিখনভের সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বের কয়েকটি গদ্য-রচনা সংকলিত হল। তাতে আছে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের কথা, সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ও ককেশাসে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাহিনী, লেনিনগ্রাদ রক্ষার বীরগাথা, ভারতবর্ষ নিয়ে ছোটো ছোটো স্কেচ, এবং শেষত আত্মজীবনের কয়েকটি চিত্র।

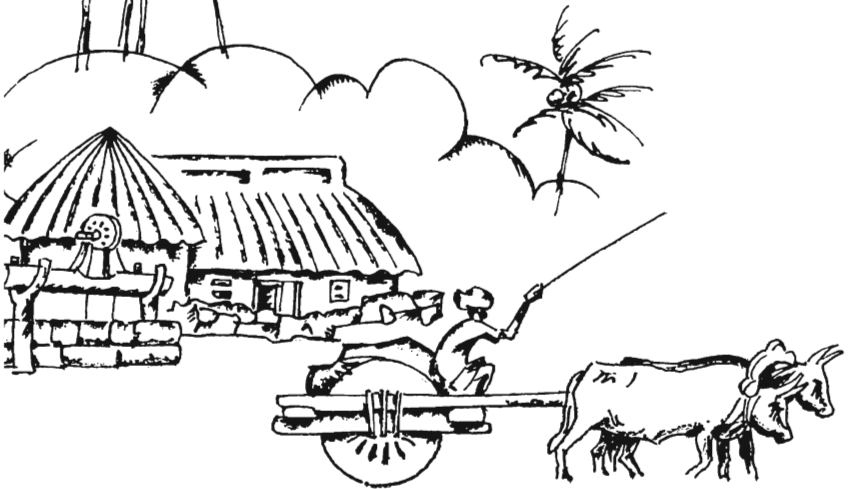
এ থেকে তিখনভের ভাবগত ও নান্দনিক বৈচিত্র্যের খানিকটা ধারণা মিলবে। আশা করি মূল রুশে না হলেও অনুবাদেও তাঁর এই রচনাগুলি থেকে ভারতীয় পাঠক তাঁর সমৃদ্ধ ভাবব্যঞ্জক গদ্যের সমস্ত রূপ রস ও গন্ধের স্বাদ পাবেন, বড়ো একজন সোভিয়েত লেখকের প্রতিভার অনুরাগী হবেন।

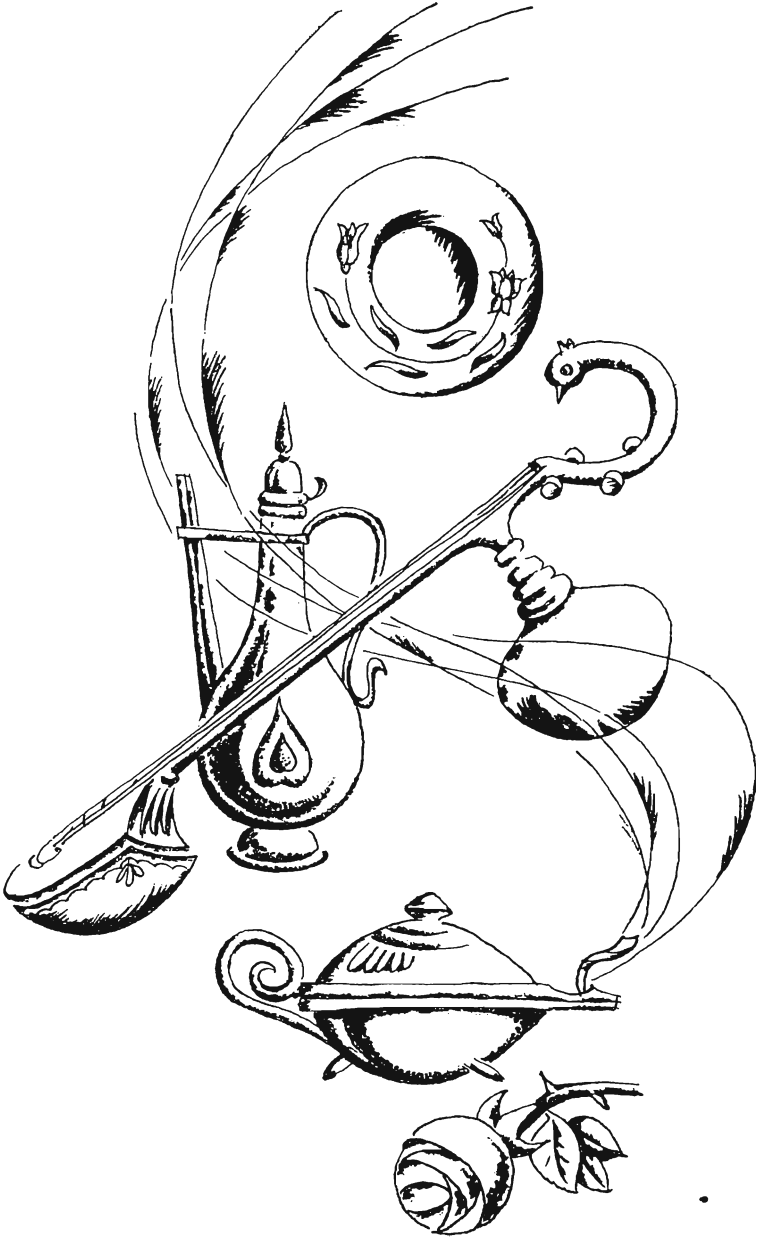
প্রফেসর ইয়ে. চোলিশেভ





ভারত কাহিনী





ওকে অর্মানি থাকতে দিন



‘ওকে অর্মানি থাকতে দিন,’ বললেন ডক্টর বালিগা। তবে বোম্বাইয়ের যে স্মরণীয় সন্ধ্যায় ডক্টর বালিগা এই কথাগুলো বলেছিলেন, তারো আগে আছে একটা অন্য কাহিনী। সেটা আমাকে নিয়ে। ছোটো থেকেই ভারতবর্ষ আমার নেশা। বসে থাকতাম সেকালের পিটার্সবুর্গের গরোখোভায়া রাস্তায় ছোট্ট একটা অঙ্ককার ঘরে, বইপত্র ছবি মানচিত্রে তা ঠাসা, সদুদ্ভূতের এক রূপকথার দেশের ইতিহাস আর প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যেতাম। নিজের ছেলেমানুষী ভাবনাগুলো টুকে রাখতাম খাতায়, নোট রাখতাম, ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ন নিয়ে লিখে ফেলেছিলাম গোটা কত উপন্যাস, আর আমারই মতো যারা স্কুল-ছাত্র, শূদ্ধ বয়স-ধর্মে রঙ্গ-রস নিয়ে থাকত, তাদের কাছে ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার স্পর্ধা পর্যন্ত করেছিলাম।

ওদের আগ্রহ জাগাবার দরকার ছিল যাতে বসে বসে ওরা আমার কথা শোনে আর সেটা যেন ইশকুলের পড়ার মতো না হয়। সে সময় খুব সোরগোল তুলেছিল ম্যাজিক লন্ঠন। কিন্তু আমার কাছে তা ছিল না, টাকাও ছিল না তা কেনার মতো।

নিজেই বাক্স দিয়ে ঐরকম লন্ঠনের মতো একটা বানালাম, নিজেই এংকে নিলাম ভারতের দৃশ্যপট, হাতি, বাঘ, দৈনন্দিন জীবন ও ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি। এংকেছিলাম খুব পাতলা কাগজে, তার ওপর ঘন রঙ চিড়িয়ে তার উল্টো পিঠটা সামনে দিয়ে এংটে দিলাম আমার স্বহস্ত-রচিত ম্যাজিক লন্ঠনের ফ্রেমে। ছবির পেছনে রাখলাম রান্নাঘরের একটা সাধারণ বাতি আর তার আলোয় আমার শ্রোতাদের সামনে জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে উঠল আমার ছবি। শূদ্ধ ছবি হলে তারা দেখত না। কিন্তু আমার ঐ

সরল কারসাজিটায় তারা উৎসুক হয়ে ওঠে। অন্ধকারে চুপচাপ ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে তারা মন দিয়ে দেখতে লাগল যাকিছু আমি দেখাচ্ছিলাম। তখন যা খুঁশি আমি বলতে পারতাম। এক কান দিয়ে ওরা শুনছিল।

কিন্তু অচিরেই আমার এই কায়দাটায় তাদের অরুচি ধরে গেল। তখন আমার নতুন ছবির ওপর ফাউ হিশেবে লজেন্স কেনার জন্যে ওদের দ্ব-তিন কোপেক করে দিয়ে উৎসাহিত করতাম যাতে ওরা আমার কথা শোনে — আর সে দেশটা সম্পর্কে আমার তখন কী যে ইচ্ছে হত গল্প করার।

আর পরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলতেও পারতাম আমি অনেক। সাধারণভাবেই আমার ঝোঁক ছিল যুদ্ধের ইতিহাসে, জানতাম ভারত নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ, বর্গীর হাঙ্গামা, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের কথা, বলতে পারতাম শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ, বাবরের আগমন, পাঠান এবং ইংরেজদের সঙ্গে তাদের লড়াই, এমনকি আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের কথাও।

তাছাড়া ভারতের ভূগোল আমি ভালো করে পড়েছিলাম, জানতাম উত্তরের কাশ্মীর আর হিমালয়, দক্ষিণে তামিল ও সিংহলীদের বিবরণ। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ — মহাভারত ও শিবপুরাণ পর্যন্ত পড়া ছিল। মোট কথা, আমি ছিলাম একটি ক্ষুদ্রে ভারতবিদ অথচ সে সময় কাউকে আমি বোঝাতে পারতাম না এত সব জেনে আমার লাভ কী।

মানচিত্র আর বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়া ইশকুলের এই ছোটো ছেলেকে যারা তখন দেখেছে, তারা ভাবত, বড়ো হলে আমার ও নেশা কেটে যাবে।

কিন্তু কাটল না। জমল কেবল আরো খবর। আর বইগুলো আমায় যা বিস্তারিত জানিয়েছে, বেড়ে উঠল স্বচক্ষে তা দেখার এক অদম্য বাসনা।

তারপর কালক্রমে পা দিলাম ভারতের মাটিতে। বিমান থেকেই চোখে পড়ল সমুদ্রে বাঁকা বাঁকা অজস্র কাটা কাগজ ছড়ানো। তবে কাগজ তো আর নয়, ওগুলো হল অসংখ্য জেলে নৌকোর পাল, তা থেকে বোঝা গেল কাছেই ডাঙা। তারপর নিচে দেখা দিল ঝুঁটিওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেশলাই কাঠির কেমন সব বন। অনেক উঁচু থেকে অমনি দেখায় নারকেল গাছগুলো। তারপর বিমান যখন নামল, দুয়োের খুলতেই মুখে লাগল তপ্ত, কেমন একটা ঝাঁঝালো ঝাপটা, বুঝলাম ভারতের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছি।

আমার সফরের প্রথম শহর হল বোম্বাই, ভারতের পশ্চিম সমুদ্র-তোরণ।

তার বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁক উপকূল বরাবর দৃক্ষশুদ্ধ রক্ত-নীল আলোর মালা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। উল্লসিত হয়েছি নামকরা ঝুলন্ত উদ্যানের সবুজ স্থাপত্য দেখে, যেখানে যাদুকর মালীদের হাতের গুণে স্নকৌশলে ছাঁটা গাছ-পালা ঝোপঝাড় পরিণত হয়েছে যত রকমের জন্তু আর পাখিতে, হাতি, ময়ূর, মহিষ, এমনকি হল-চালক চাষীতে।

খাঁড়ির সবুজাভ ভারি-ভারি ঢেউয়ে ধোওয়া দ্বীপটায় গিয়ে দেখেছি গুহামন্দির, যেখানে পূর্ণ মহিমায় পৌরাণিক ভারতের দ্বিমূর্তি শিব অধিষ্ঠিত।

আর যত আশ্চর্যই লাগুক, রাস্তার জীবন্ত মোজেইক, ধবল জনস্রোত, ব্যাংক আপিস হোটেলের গম্ভীর ভবন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবির মতো বাজার, গরিবদের ডেরা বস্তি আর চালা, পার্কের মাঠে এমন কি সরাসরি রাস্তায় ঘুমন্ত হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ — এসবই মনে হয়েছিল যেন অনেক দিনকার চেনা, যেমন চেনা মনে হয়েছিল বিরাট শহরের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো। এসবই আমার জানা, আমার কল্পনায় ছিল তা, গরিব এই লোকগুলোর সঙ্গে ছিল আমার সহানুভূতির যোগ, তাই আমার সঙ্গে তাদের

জীবনযাত্রা ও অস্তিত্বের যত পার্থক্যই থাকুক, মনে হয়েছিল পরিচিত।

ডঃ বালিগা ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, উদার ও সংবেদনশীল মানব, ন্যায়পর ও প্রাজ্ঞ। নামকরা ডাক্তার তিনি, ভারতের সেরা সার্জন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু, শান্তি ও জাতি-মৈত্রীর বোদ্ধা, সত্যিকারের বন্ধুসুলভ সমাদরে তিনি আমাদের ঘরে রেখেছিলেন। শান্ত সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা, গুরুত্ব দিয়ে রোগী দেখতে অভ্যস্ত লোকের মতো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ছোটো ছোটো সুন্দর শক্ত হাত, যেন ক্লাসিক্যাল কোনো সামুদ্রিক পাখি — আমাদের তিনি যে বোম্বাই দেখান সেটা কেবল টুরিস্টদের বোম্বাই নয়।

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের, কারবারী লোকের সঙ্গে, পরে তাঁরা মস্কোয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন, সাক্ষাৎ হয় সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রাভিনেতাদের সঙ্গে, সবাই এঁরা যত পারেন আমাদের দেশটার খবর জানতে চেয়েছেন তৃষিতের মতো। সেটা উনিশ শো' বাহান্ন সাল, কিছু দিন আগে প্রদর্শনী হয়ে গেছে বোম্বাইয়ে, আর সেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মণ্ডপ দেখা গিয়েছিল তাতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে ঔৎসুক্য তখন প্রচণ্ড।

তবে ডঃ বালিগা সাধারণ মেহনতীদের জীবনও আমাদের দেখান। নির্মাণ-শ্রমিক, সূতাকল শ্রমিক, ট্যানারি শ্রমিক ও কুলিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় আমাদের।

সদ্য-নির্মিত একটি মস্তো ভবনে তিনি আমাদের নিয়ে আসেন। এখানে যে শ্রমিকরা এখন উঠে এসেছে তারা আগে যে বিচিত্র আস্তানাগুলোয় থাকত তাকে কণ্ঠে বলাও শক্ত।

‘অবিশ্যি,’ বললেন ডাক্তার, ‘আধুনিক ইউরোপীয় ধাঁচের ফ্ল্যাট ওদের এখনো জুটছে না। এ ঘরগুলোও ঘরই বটে, তবে দেখছেন

তো কীরকম ঘেঁষাঘেঁষি, সংসার ওদের বড়ো, ছেলেপড়লে অনেক, তাছাড়া ওদের ঘরকন্নার ধরনটাও এই ধরনের বাড়ির উপযোগী নয়...’

হ্যাঁ, আমরাও দেখলাম ঘরগুলো এমনতে জনাকীর্ণ, গুমোট, আধা-অন্ধকার আর তার ভেতরেই রান্নাবান্নার আদিম উন্মূখ, আসবাবপত্র একেবারেই নেই, তার বদলে সতরঞ্চি আর কম্বল, কোথাও কোথাও বড়ো জোর খাটিয়া। বাসন-কোসন সামান্য। তাহলেও মাথার ওপর চালা আছে, ঝড়বৃষ্টি আটকায়।

‘এটা হল প্রথম বাড়ি, মজুরদের জীবনে প্রথম দালান ঘর,’ বললেন ডঃ বালিগা, ‘নতুন পথে নেমেছে ভারতবর্ষ, তা সে ছাড়বে না। এটা ভারতের প্রথম পদক্ষেপ... চলুন আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাকে...’

যে জায়গায় তিনি আমাদের নিয়ে এলেন সেটা ক্লাবের মতো। বলা বাহুল্য এটাও প্রথম পদক্ষেপ। ঘরটায় আলো খেলে, তবে এখনো ফাঁকা-ফাঁকা। আসবাবপত্র কম। বইয়ের শেল্ফ, আলমারি। পত্র-পত্রিকা, দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র। কয়েকটি ফোটো। একটা টেবিলে কেরম খেলা হচ্ছে। আরেকটা টেবিল ঘিরে আলাপ করছে জন কয়েক, দু’জন কাগজ পড়ছে। একটু দূরে অপ্রত্যাশিত এমন একটা জিনিস দেখলাম যাতে অবাক হতে হল।

আমার দিকে পেছন ফিরে টেবিলে বসেছিল একটি ছেলে, সামনে তার বইপত্র, মানচিত্র। কেমন যেন আমি তার মুখখানা দেখার জন্যে এগিয়ে গেলাম সামনে।

খোলা পত্র-পত্রিকা, ও খাতা নিয়ে ঠোঁটে পেনসিল ঠেকিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছে একটি ছেলে। গায়ে তার একটা সাধারণ পরিষ্কার ডোরাকাটা হাফ-শার্ট, মনে হয় ইশকুলে পড়ে, কোনো একটা কঠিন অঙ্ক কষছে।

সামনে তার একটা মানচিত্র, তাতে আমার জন্মভূমির পরিচিত রূপরেখা। পত্রিকাটায় দ্রুত দৃষ্টিপাত করতেই বোঝা গেল ওটা ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন’, তার খোলা পাতায় লেনিনের ছবি, আরো কীসব পাহাড় আর বাড়ি।

ইচ্ছে হয়েছিল আরো কাঁছিয়ে যাই, কিন্তু সাবধানে ডঃ বালিগা আমার হাত চেপে ধরলেন জোরে। ছেলেটা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না, নিজের ভাবনায় এতই সে নিবিষ্ট।

ঘরের অন্য কোণটায় পেঁছতে মৃদুস্বরে ডঃ বালিগা বললেন:

‘ছেলেটাকে আমি ভালোই চিনি, ও ঠিক করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে’ যা কিছু জানা সম্ভব সব সে জানবে এবং তারপর সেখানে যাবে। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে পুস্তিকা-পত্রিকা তাকে দিই, ছেলেটা জেদী, মেধাবী, কিন্তু মৃদুচোরা, নিজের মধ্যে ডুবে থাকে। ওর পড়ার জায়গা নেই কোথাও, সংসারটা বড়ো, খুবই অসুবিধা। তাই এই ক্লাবে ওর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এখানে ওর অটেল সুবিধে। যা কিছু ওর কাছে আশ্চর্য ঠেকেছে, ওকে ভাবিয়েছে তা সব ও টুকে রাখে। কিন্তু সে কথা বলে বেড়াতে ভালোবাসে না। দেখছেন তো, কেমন একমনে ভাবছে। ওকে বিরক্ত না করাই ভালো। অর্মানি থাকতে দিন...’

শেষ কথাটা উনি বললেন দৃ’বার, ‘হ্যাঁ, ওকে অর্মানি থাকতে দিন...’

আরেকবার চকিত দৃষ্টিপাত করলাম আমার কৈশোরের এই বিচিত্র জুড়িটির দিকে। মৃদুখানা ওর টিকলো, এলোমেলো কালো চুলের ভেতর বাঁ হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো গোঁজা, উঁচু ভুরু। সুগঠিত ঠোঁটে ঠেকানো পেনসিলের ডগাটা। তন্ময়তায় কেমন নরম হয়ে উঠেছে মৃদুখানা, দৃঢ়চোখ দিয়ে কী যেন একটা দেখছে যা আমাদের অদৃশ্য।

না, ব্যাঘাত ঘটাব না ওর...

আমাদের এই কিশোর বন্ধুটিকে ডঃ বালিগাই তো বেশি চেনেন।
ধ্যানীর ধ্যানভঙ্গ না করেই আমরা নীরবে চলে গেলাম...

বোম্বাই থেকে চলে যাই আমরা। মহান দেশটার নব নব চিত্র
ক্রমাগত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমাদের সামনে, কিন্তু ভারতে আমার
বারম্বার সফরের পরেও, মনের ওপর জোরালো সব ছাপ পড়া
সত্ত্বেও স্মৃতিতে থেকে গেছে আমার শৈশবের এই অভাবিত জুড়ি,
এই তন্ময় ধ্যানী, ইশকুলের ছেলেটির ছবি, ছোটো থেকেই যে
কথা দিয়েছে তার আদরের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, লেনিনের
জন্মভূমি, তার স্বদেশের মহাবাক্ষবের কথা সব জানবে আর
দেখবে।

বসন্তদিন



বসন্ত বলতে ভারতে বোঝায় মার্চের মাঝামাঝি থেকে মধ্য মে। এপ্রিলের এক বসন্তদিনে আমরা যাচ্ছিলাম মস্তো এক ক্যানেল বরাবর, মনে হচ্ছিল তীর যেন তার অসীমে মিশেছে। মাপা তালে, শান্তভাবে বইছে নাঙ্গল ক্যানেলের জল, চাপ দিচ্ছে তার কৃত্রিম দুই পাড়ে। জিনিসটা একেবারে আধুনিক, চোখে পড়ছিল তার পাড়ের সমান মাপের হলুদ-শাদাটে ঢালু, পারাপারের পরিপাটী সেতু, ক্যানেল বরাবর সটান রাস্তা।

মনে আমার তখনো দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনের স্মৃতি তাজা, বর্ণবহুল সেইসব অধিবেশন, বক্তাদের মধ্যে ফুটে উঠছিল প্রাচ্যের সমস্ত চিত্রময়তা, অবিরাম উপভোগ করা যেত মূখের আশ্চর্য ভাব-ব্যঞ্জনা, গতিভঙ্গির অপরূপ মূর্তিময়তা, ভাষণের আবেগ, উক্তির গভীর সত্যতা।

মনে আমার দিল্লির রাস্তার স্মৃতি, সেই রাস্তা সর্বদাই যা জনাকীর্ণ, যেখানে বাসন্তী সূর্যের ঢল, বৃড়ো বৃড়ো তেঁতুল আর ডুমুর, চেণার আর খেজুর গাছের সবুজ।

দেশটার অসংখ্য স্মৃতিস্তুপে এসে দাঁড়াতে তার অতীত। কী ভালোই লাগত সন্ধ্যায় শহরের বাইরে গিয়ে ঠান্ডা হাওয়া খেতে। প্রাচীন সব মিনার আর সমাধি-মন্দিরের ছায়ায় ধূসর আঁধারার মতো ছোটোছোটো করত বানরের পাল। লোক দেখেই তারা ছুটে আসত রাস্তায়, সরাসরি হাত থেকেই বাদাম নিয়ে গম্ভীর মুখে চিবাত, সরু সরু শুকনো আঙুলে মানুষের হাত চেপে ধরত নিশ্চিত্তে এবং সজোরে। হোটেলের ব্যালকনিতে আমাদের পাশেই এসে বসত পাখিরা, আমাদের একেবারে উপেক্ষা করে লাল বা

সবুজ ঠোঁটে তাদের ঝক্‌ঝকে পালক খুঁটত। জানত তারা, কেউ তাদের ব্যথা দেবে না, মারবে না, তাড়িয়ে দেবে না ব্যালকনি থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে পশুপাখিদের বাঁচিয়ে রেখেছে, সমাদর করেছে এ দেশ। রাস্তায় বাস মোটরগাড়ির মাঝখানে দিবিয় হেঁটে যেত গরু, যেন দুনিয়ায় তারাই সব। হর্ণ দিয়ে বা জোর হাঁক ছেড়ে তাদের তাড়ানো চলত না।

অনাবৃত ও অর্ধনিগ্ন লোকেরা খাটত বাগানে আর মাঠে। এবং তা শুধু আজকে নয়, শত শত বছর ধরে। নতুনকে আমরা দেখেছি বড়ো বড়ো আধুনিক ভবনে, বিশ শতকের মোটরগাড়িতে, ধনপতি ও মহারাজাদের প্রাসাদে, বিশ্বের যে কোনো দেশের মাল কেনবার আধুনিক মার্কেটের আচ্ছাদিত গ্যালারিতে, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে, তরুণদের মদ্যুর ভিড়ে, চওড়া পর্দার সিনেমার বিজ্ঞাপনে, রোডিওর সর্বভেদী কণ্ঠে।

গেছি পুরানা আগ্রা, মহান আকবরের নিস্তরু সমাধি-মন্দিরে উঠেছি, পাষণ কফিন তাঁর স্থাপিত উঁচুতে, উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে, আর সমাধি ও আকাশে তোলা এই অস্থিপাত্রের প্রাচীর গায়ে ক্ষোদিত করাল বাদশাহের প্রশস্তি কবিতা। সুনীল শূন্যে গলে যাওয়া তুষার-ধবল তাজমহলের সূচরু কাস্তি দেখেছি একাধিক বার, পথ হারিয়ে ঘুরেছি পুরনো কেল্লার কক্ষ, মহল্লা দ্বারপথের গোলকধাঁধায়, স্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি সেই অলিন্দে শাহজাহান যেখান থেকে রোজ দেখতেন তাঁর মহিষী মমতাজের সমাধি। তাঁর জন্যে তিনি যে স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছেন, বিশ্বের আর কোনো নারীর ভাগ্যে তা জোটে নি।

কিন্তু সেদিন, মসৃণ গতিতে আমাদের গাড়ি যখন চলছিল নাস্তল ক্যানেল ধরে, সেদিন আমরা দেখেছি আরেক ভারতবর্ষকে, চিরকালের জন্যে যা মনে গেঁথে গেছে। বিশাল ভাখরা-নাস্তল বাঁধ যেখানে উঠছিল, সারা দিন আমরা ঘুরেছিলাম সেসব জায়গায়।

সাধারণ মজুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত যারা এক বিশাল সৃজন-
 যজ্ঞে নিবিষ্ট সেই ভারতীয়দের দেখলাম আমরা। উঠলাম আমরা
 সেই উঁচুতে, যেখানে তখনো অবশীভূত উদ্দাম শতদ্রু পর্যন্ত নেমে
 যাওয়া খাদটার দুই খাড়া পাহাড়ের মাঝখানটা শূন্য। এই ফাঁকা
 ব্যবধানটা চিরকালের জন্যে জুড়ে যাবে বাঁধের অটল প্রাচীরে।
 যেখানকার নীল বাতাসটা মিহি কাশ্মীরী মসলিনের মতো স্বচ্ছ,
 কল্পনা করাও কঠিন হয়েছিল যে সেখানে উঠবে এক বিশাল
 প্রাচীর আর তার ফটকগুলো দিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে
 জলের ফেনারিত জটা, কেননা সে বাঁধ হবে দু'শ' বিশ
 মিটার উঁচু।

আরো অবাক লেগেছিল পেছনে পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে।
 নীলাভ উপত্যকার ওপরে শান্ত গ্রামগুলোর মাথায় ধোঁয়া, বোঝা
 যায় নিশ্চিত কৃষিজীবন ওখানে। কিন্তু এই খাঁ খাঁ শূন্যে যখন
 উঠবে বাঁধের দেয়াল, এখন যেখানে চলছে মানুষ আর গরু, মোটর
 আর গাড়ি, স্তব্ধ হয়ে সেখানে বিছিয়ে থাকবে এক বিশাল হৃদ,
 সাড়ে তিনশ'র বেশি গ্রাম তলিয়ে যাবে তাতে। আর পড়ন্ত
 জলস্রোতের সেই গর্জনটা হবে এই উদ্দাম মৃত্ত শতদ্রুর অস্তিম
 সঙ্গীত, আর যেন তা টের পেয়েই নদী আজ তার দুই পাড়ের
 মধ্যে দ্রুত ডাক ছাড়ছে, ঘুরলিয়ে তুলছে মত্ত স্রোতের বড়ো বড়ো
 পাক।

স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা অন্ধকারের গন্ধ ছড়ানো টানেলগুলো
 দেখলাম আমরা, জল-নিকাশী ক্যানেলগুলো বসবে সেখানে, অনেক
 ট্রাক আর টিপ-আপ লরি দেখলাম, খুঁড়ে ফেলা মাটি সরিয়ে নিয়ে
 যাচ্ছে, শূন্যলাম পাহাড় বেয়ে ওঠা গাড়িগুলোর ফোঁসফোঁস,
 ভারতের পক্ষে অভূতপূর্ব এই বাঁধটা যারা দিনের পর দিন নিজের
 হাতে গড়ে তুলছে দেখলাম সেই মেহনতীদের। সংখ্যাগুলোর
 মূখেও এখানে অন্যকথা, অতীতের সঙ্গে যার তুলনা হয় না।

খরার সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ন্যূনতম ক্ষমতা দাঁড়াবে ৪ লক্ষ কিলোওয়াট, বর্ষায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৯ লক্ষ কিলোওয়াট!

সারা দিনটা আমাদের কাটল এই আশ্চর্য দৃশ্যটার প্রভাবে, লোকে যেখানে পাহাড় আর উদ্দাম জলপ্রোতের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে জয়ের সংকল্প নিয়েছে।

আর নতুন ক্যানেল বরাবর যখন আমাদের গাড়ি চলল, তখন দেখলাম এক নতুন দৃশ্যপট, স্বদেশীয় প্রকৃতির পুনর্নির্মাণে নামা এক মহান জাতির সংকল্প ফুটে উঠেছে যাতে।

গাড়ির গতি কমালে ড্রাইভার কেননা লোক বসেছিল রাস্তায়। পোষাক-আশাক তাদের খুবই সাধারণ, বহুদক্ষণ গুরুভার বোঝা বয়ে, ক্লান্ত হয়ে লোকে যখন তপ্ত মৃত্তকের ওপর ফুরফুরে ঠাণ্ডা ঝাপট খেয়ে জিরিয়ে নেবার জন্যে জলের পাশে গিয়ে বসে, তখন তাদের মৃত্তকের ভাব যেমন হয়, এদেরও তাই।

কেউ তারা বসে, কেউ আধা শুয়ে, মাঝখানে একটা পাল্কি। ভারতবর্ষের মতো দেশে এই ধরনের হাল্কা রঙীন পাল্কিতে কোনো চাপল্য জাগার কথা নয়। কিন্তু একটি কথা বললে ড্রাইভার আর উৎসুক হয়ে উঠলাম আমরা। সে বললে, কনে!

‘নতুন বোঁ নিয়ে যাচ্ছে,’ বললে ড্রাইভার, এবং আমরাও বোঁ দেখলাম। পাল্কিতে আধ-শোয়া অবস্থায় সে তাকিয়ে আছে সামনে ক্যানেলের ছুটন্ত জলের দিকে। নানা রঙের ঝলমলে শাড়িতে, কোলের ওপর একরাশ ফুলে, পাল্কির আধা-অন্ধকারে তার মাকড়ি, কঙ্কণ, অঙ্গুরীর ছটায় তাকে দেখাচ্ছিল যেন অন্য এক জগতের লোক। ষড়্‌গের হিশেব ভোলা প্রাচীন ভারতের মূর্তি সেটা, অজস্র গৃহাগাত্রে দেখা, প্রাচীন শিল্পীদের পটে রঙে রসে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকা স্মরণাতীত কালের প্রতিমা। তা সত্ত্বেও তাতে ফুটেছে তারুণ্যের রূপ, উদ্ভিন্ন যৌবনা, বিজয়িনী, আধুনিকা। মৃত্তখানা

তার কঁচি, শ্যামল রঙের, ভেতরকার কী একটা ভালোবাসা আর জগতের প্রতি অসীম কৌতূহলে উদ্ভাসিত — এ জগতকে সে এই প্রথম দেখছে, প্রতি পদেই তা দ্রুতগতিতে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠছে তার সামনে।

সাধারণ একটি কুমারীর কেন এতটা কদর করছে বয়স্ক লোকে, সম্ভ্রম করে তাকে পার্লিকতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সযত্নে, তা বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয় না। জীবনের প্রতি, যৌবনের প্রতি, তাদের কাছে এ জীবনের যা কিছু সেরা ও তাৎপর্যময় তার প্রতি তাদের নিজেদের ভালোবাসাকেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। নিজেরাও তারা একদা ছিল নবীন, হয়ত-বা সেটা খুব বেশি দিনের কথাও নয়। আর আমার মনে হল যেন আমি অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানকে দেখছি যুগপৎ। তারুণ্যের বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ মেলে মেয়েটি দেখছে ক্যানেলটা, নবযুগের ঐ কাণ্ড-কারখানা, তার বাপ-ঠাকুর্দারা যা কখনো দেখে নি, কিন্তু অন্তরের গভীরে তার সুপ্রাচীন দেশের এক নারী, জানে সে, এখন তাকে পালন করতে হবে সবটা পুরো না বৃদ্ধলেও অবশ্যপালনীয় এক কর্তব্য, যে মানুষটার কাছে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সে সংসার পাতবে, মা হবে, মহাপুরুষ মেহনতীদের বংশ রক্ষা করবে, হোক তা কঠিন কিন্তু এখন সে তো নবীনা, আর এই বসন্তদিন মানুষের গড়া ওই ক্যানেলটার মতোই অপরূপ এক তাজা আমেজের ঝাপট মারছে, যেন চাপা করে তুলছে সামনের পথটার জন্যে।

অতীত থেকে ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে চলেছে তার স্বজনেরা, এখন তারা জিরিয়ে নিচ্ছে, কেননা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পার্লিক বয়ে যাওয়া সহজ নয়। আর ক্যানেল বরাবর ধীরে ধীরে যতক্ষণ গাড়ি চলল, আমরা চোখ ফেরাতে পারলাম না ওই তরুণী মেয়েটির কাছ থেকে, পার্লিকর আধো-অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল তার পুর্লিকিত তন্ময় মুখখানা।

যে চাষীরা পার্লিক বইছিল, তাদের পোষাক-আষাকও ওই বাঁধ তৈরির মজদুরদের মতো। এতে কেমন যেন আত্মীয় হয়ে উঠেছিল তারা, কাঁচিয়ে এসেছিল সদুদর কাল-ব্যবধান।

চারিদিকে আমাদের ঐতিহাসিক সব স্মৃতি। এটা শিখদের এলাকা। ঐ নানাদেবী পর্বত, ওইখানে শিখদের দুর্গ-মন্দির, গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর অনুশাসন দেন সেখানে। এইখানেই শিখদের কৃপাণ বহন, লম্বা চুল ও চিরুনি রাখা, খাটো ইজারা ও লোহার বালা পরার শপথ নিতে বসেছিলেন তিনি। বর্তমানে শিখেরা নিভাঁক যোদ্ধা ও বেরোয়া ড্রাইভার, এমনভাবে গাড়ি চালায় যেন যুদ্ধে ছুটেছে। তবে এখনো তারা শিখই রয়ে গেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। কিন্তু বদলে গেছে পুরনো অমৃতসর, বদলে গেছে তারাও।

গোধূলির নীলাভ আবছায়ায় হঠাৎ ঝট করে ব্রেক কষল গাড়ি। ফুটো টিউব থেকে ওঠা মৃদু শিসটায় বোঝা গেল রাস্তায় পেরেক থাকে।

গাছ-পোঁতা রাস্তাটা ফাঁকা। একটু দূরে দেখা যাচ্ছিল একটা কুয়ো। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল পুরনো কপিকলের ক্যাঁচকাঁচ শব্দ। জল নিতে আসা মেয়েরা সবাই ঝুঁকে আছে কুয়োর কাছে। বাড়তি টিউব ড্রাইভারের ছিল, কিন্তু স্বভাবটা তার ভাবুক গোছের। বাড়তি টিউব থাকলেও এরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তার একটাও ছিল না। এমন কিছুই ছিল না যা দিয়ে স্কু খোলা যায়, চাকা তোলা যায়। রাস্তায় গিয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল সে। কিন্তু চলন্ত গাড়িগুলোতেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় আমাদের করার কিছু রইল না। ঘরমুখো চাষীরা আমাদের গাড়ি দেখে থেমে যাচ্ছিল কোতুহলে।

তারপর পাওয়া গেল এক ড্রাইভার, তার ট্রাক থামতেই সেখান থেকেও একদল কোতুহলী লাফিয়ে নেমে ঘিরে ধরল আমাদের।

কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে সৈঁধল গাড়ির নিচে, কেউ কেউ সদুপদেশ দিলে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা শব্দ করলে কোথেকে আসছি। আমরা সোঁভিয়েতের মানুষ জেনে সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করলে তারা, প্রশ্ন প্রশ্ন ছেঁকে ধরল। মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল রাস্তায় একটা জোর আলাপ জমে উঠেছে। আধ-ঘণ্টা আগেও আমরা কল্পনা করতে পারি নি যে বড়ো বড়ো গাছের নিচে পুরনো কুয়ার কাছে আমাদের কথা কইতে হবে লোকজন, সাধারণ মানুষ, চাষীদের সঙ্গে, কী একটা অধীর আগ্রহে যারা সবকিছু জেনে ফেলতে চায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা করলে তারা, সত্যিই কি আমরা ভারতীয়দের সাহায্য করব, ভারতে লোহা কারখানা গড়ব, তা চালাবার বিদ্যা শেখাব ভারতীয়দের, মের্সিনটুল আর যন্ত্রপাতি বিক্রি করব তাদের? ড্রাইভার যতক্ষণে টিউব বদলালে, তার মধ্যে বলতে হল আমাদের অনেক। আর যে রকম মন দিয়ে সমাদরে তারা আমাদের কথা শুনলে, তার ভেতর কী যেন ছিল বৃকে ভারি দোলা দেওয়ার মতো। যেন আমরা বিশেষ করে ওদের জন্যেই এসেছি, রাস্তার এই সাক্ষাৎটা দৈবাৎ নয়, আগে থেকেই তা ঠিক করা ছিল, অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের পথ চেয়ে ছিল ওরা।

আশ্চর্য ওদের গভীর প্রিয় সম্ভাষণ, সোঁভিয়েত জনগণের উদ্দেশে নিবেদিত অভিনন্দন, চারিপাশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক ও উত্তম বোধ, সোঁভিয়েত জনগণের ওপর তাদের বিপুল আস্থা। আশ্চর্য এই জন্যে যে সোঁভিয়েত জনগণের প্রতি ওদের এই অনুরাগটা মাত্র গতকাল দেখা দেয় নি, ওদের কথার ভেতরকার ওই আস্থার সূরটা উদার এই জনগণের স্বভাবসুলভ অমায়িকতার লক্ষণ নয়। আলাপটা ছিল সত্যিই আন্তরিক।

গরম লাগছিল আমার, জল খেতে গেলাম কুয়ার কাছে। জল ছড়ানো পাথুরে পৈঠাটা, ওখানে কেবল একটি মেয়ে, কলসী এগিয়ে দিলে সে, জল খেয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

ফিরতেই ধর্মস্থানের মতো কী একটা চোখে পড়ল কুয়ের কাছে — মাটির একটা ছোটো ঘর, গরাদে দেওয়া দরজা তার বন্ধ। গরাদের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বেদীর মতো একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি দুটি মাটির মূর্তি। পায়ের কাছে তাদের মেঠো ফুলের সামান্য কিছু পুষ্পার্ঘ্য। জানা গেল ছোট্ট এই মন্দিরটি কৃষ্ণ ও রাধার। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে অতীতের অতিকায় একটা আবেগ পরিণত হয়েছে শিশু কাহিনীর মোহন মূর্তিতে। সে মূর্তি নিরহংকার, শূভংকর, স্ফুটাম, লৌকিক শিল্পীদের হাতে গড়া। একজন কৃষ্ণ — ভগবান বিষ্ণুর অবতার, অন্যজন রাধা — তার চিরসুতনী প্রণয়িনী।

মনে হল যেন ইচ্ছে করেই তারা অমন ছোট্ট হয়ে গেছে, কুয়ের কাছে জল নিতে আসা লোকগুলো অথবা মন্দিরটির ছায়ায় জিরতে বসা মানুষদের যেন ব্যাঘাত না হয়। কিংবা হয়ত কালই এমন বদলে গেছে যে আমাদের গাড়ির চারপাশে ভিড় করে আসা ওই লোকগুলোই হয়ে উঠেছে অতিকায়, অতীতের পৌরাণিক আদর্শ পথ ছেড়ে ফিরে গেছে রূপকথায়, ভুলে গেছে তার শাস্ত্রকথিত দেবত্ব ও প্রতাপ।

ফের সেদিন আমি টের পেলাম কী ভাবে অতীত রয়েছে কাছেই, আর সামনের কুঞ্জবনটার ওপাশ থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো কী ভাবে উদ্ভিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ। আর হয়ত-বা এখানকার ভালো মানুষদের মনে করুণা হয়েছে এইসব প্রাচীন দেবতাদের জন্যে, তাই পথের পাশে ছোট্ট ঘর তুলে দিয়েছে তাদের, শান্তভাবে তাদের বার্ষিক কাটাক সেখানে, জেনে রাখুক বর্তমান ভারতের বড়োসড়ো ছেলোপিলেরা, মহাভারতের ভাবী কর্মী ও স্রষ্টারা কখনো লাজিত করবে না তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতির স্বপ্নকে, যা কায়া নিয়েছে রাধা-কৃষ্ণের এই ছোটো ছোটো রূপকথাসুলভ মূর্তিতে।

অমন সুস্পষ্টভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ ফুটিয়ে তোলা এই লোকগদুলোর মধ্যে ঐ দেবমূর্তি দর্শন আমার বেশ লাগল। যাত্রার জন্যে যখন তৈরি হয়ে গেল আমাদের গাড়ি, চাষী বন্ধুদের কাছ থেকে অনুরাগে বিদায় নিতে শুরু করলাম, ধূর্ত হেসে একজন বললে, ‘আপনাদের গাড়ি বিকল হয়ে ভালোই হয়েছে। গাড়ি না ভাঙলে তো আর প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারতাম না আপনাদের সঙ্গে। আলাপ দরের কথা, সোঁভিয়েত মানুষদের চোখেও দেখতাম না। অনেক দিন থেকেই তাদের আমরা ভালোবাসি, কিন্তু দেখছি এই প্রথম। তা এবার আপনারা আমাদের দেশে ঘন ঘন আসবেন। এখানেও দেখবার জিনিস আছে। ধরুন না কেন ঐ বাঁধটাই...’

কণ্ঠে তার বেজে উঠল দেশ-নির্মাতা ও স্বদেশ-প্রেমিকের গর্ব। আবেগে কর্মদর্শন করে বিদায় নিলাম আমরা, হাত প্রায় ব্যথা করে উঠেছিল। অচিরেই সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লোকগদুলো আর ছোটো দেউলটির দেবতা। কিন্তু নিশ্চয় আমরা এসব এলাকায় আরো আসব এবং একাধিক বার, আমাদের দেখাবার মতো জিনিসও থাকবে এদের।

বিশাল এই বাঁধের নির্মাতা আর সুন্দর এইসব অনামা চাষী বন্ধুদের কথা আমার ফের মনে পড়েছিল যখন দিন কতক পরে অমৃতসরে তিন লক্ষ লোকের জনসভায় জওহরলাল নেহরুর ভাষণটা পড়ি। দেশের যারা আশা ও নির্ভরস্থল সেই সাধারণ লোকগুলিই নিশ্চয় ছিল সেখানে। নেহরু বলেন, ‘ভারত ইতিহাসের নব অধ্যায়ের সূচনামুখে আমরা দাঁড়িয়ে। তার উদ্বোধন ঘটবে সামনের বছর যখন দ্বিতীয় পাঁচসালী পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হবে। এই পর্বে আমরা শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে অন্যান্য দেশের পাল্লা ধরব যাদের ওখানে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৫০ বছর আগে...’ এই বলেছেন নেহরু এবং

শুদ্ধ অমৃতসরের তিন লক্ষ লোক নয়, গোটা ভারত ও সারা বিশ্ব তা শুনেছে।

মহান ভারতীয় জনগণ হয়ে উঠছে নতুন দুনিয়া, নব ভারতের প্রমুখ। আমরা এ কথা বলতে পারি যে আমরা ছিলাম এই লৌকিক বীরকীর্তি সূচনার চাক্ষুষ সাক্ষী, যা থেকে জেগে উঠবে নতুন লৌকিক মহাকাব্য আর সেখানে দেবতারা নয়, মানুষেরাই হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ পুরুষদের চোখে শ্রুতকীর্তি মহাবীর, আর চিরনবীনা ও প্রাজ্ঞ-প্রাচীনা ভারত ওই ক্যানেল পাড়ের বালিকা-বধূটির চোখ দিয়ে সক্রতজ্ঞে চাইবে তার মদন্ত নবীন পুরুষদের দিকে, বিদেশী শাসন যাদের অজানা, সুখ জ্ঞান ও মুক্তির পথে যাদের কোনো বাধা নেই।

আগত মহাবসন্তের দিন — মহাভারতের বসন্ত, তার আলো, জনকল্যাণে তার তাপ কেড়ে নেবার সাধ্য নেই কারো!

বিব্লি



একবার ব্যাংকক থেকে দিল্লি যাবার পথে কলকাতায় নামি। সঙ্গে ছিলেন একজন পণ্ডিত লোক — ওলেগ নিকোলায়েভিচ বীকভ। আমাদের বাণিজ্য সংস্থাটি খুঁজে বার করা গেল। ভালো ভালো ওয়ার্কবহাল লোক আছেন সেখানে। সব ব্যাপারেই সাহায্য করতে পারেন।

স্বদেশবাসীদের দেখে তাঁরা খুঁশি হলেন। রাতের ট্রেনেই যাতে দিল্লি যেতে পারি, সে ব্যবস্থা করে দিলেন চটপট। টাকা ভাঙবার দরকার ছিল আমার।

জানা গেল, সেটা করে দেবেন আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট। কিন্তু কোথায় তিনি? জানা গেল, ছেলেটিকে নিয়ে তিনি গেছেন চিড়িয়াখানায়। আজ রবিবার। প্রতি রবিবারে তিনি ছেলেটিকে চিড়িয়াখানা দেখান।

‘আমরাও যাই, কী বলেন?’ বললেন বাণিজ্য সংস্থার একজন কর্মী ভাসিলি ইভানোভিচ।

‘কলকাতার চিড়িয়াখানায় গেছেন কখনো?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি আমায়।

বললাম, ‘গেছি, তবে আরো একবার জানোয়ার দেখতে আমার কখনো আপত্তি হয় না।’

তাই রওনা দিলাম আমরা তিনজন: ভাসিলি ইভানোভিচ, বীকভ আর আমি। চিড়িয়াখানায় এসে, টিকিট কিনে শূরু হল খাঁচা থেকে খাঁচায় ঘোরার। কপালের ঘাম মুছে ভাসিলি ইভানোভিচ বললেন:

‘সত্যি এই দুপরে চিড়িয়াখানা ঘোরার মানে হয় না। গরম কী, একেবারে আগুন। শূরু একটা তাগিদ, অ্যাকাউন্টেন্টকে খুঁজে

বার করা। নইলে শহরের বাইরে বেরিয়ে যাবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত পান্ডা মিলবে না। শব্দ জাণি না কোন জন্তু ওর পছন্দ। খুঁজি কোথায়? বিরাট চিড়িয়াখানা...’

‘আসুন পর পর দেখে যাই,’ বললাম আমি।

গরমটা সত্যিই বিরক্তিকর। কাঠের মতো কাত হয়ে পড়ে আছে সিংহ, তার খাবার মধ্যে চড়ুইগুলো আলস্যে খুঁটে বেড়াচ্ছে মাংসের উচ্ছ্রষ্ট।

বাঘটা, খাঁচার সামনেকার ভারতীয়রা বললেন ওটা বেঙ্গল টাইগার, দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। তার কয়লার মতো কুচকুচে কালো মণি আর বড়ো বড়ো করে মেলা হলুদ আভার লালচে চোখ দেখে আমেরিকানদের সম্প্রতি উদ্ভাবিত বৈঠকী চশমার কথা মনে পড়ে। সে চশমা পরে অনায়াসে চোখ বদজে ঘুমনো যায়, কিন্তু দেখাবে যেন তার চোখ খোলা, লোকে ভাববে জেগে আছে। এ বাঘটাও নিশ্চয় চোখ খুলেই ঘুমচ্ছিল।

একটা ডাল নিয়ে শব্দ দোলাচ্ছিল হাতি। নিতান্ত ভদ্রতা করেই এক টুকরো আখ সে নিলে, ভাব করলে যেন সেটা খাচ্ছে, আসলে কিন্তু কায়দা করে সেটা সে পাঠিয়ে দিলে তার পেছনকার পায়ের কাছে, তারপর কোণের দিকে সরে গেল। আর হাতির বাচ্চা সেটা কিছুক্ষণ মুখে রেখে সোজা দর্শকদের কাছেই ফেরত পাঠালে। আখ বিক্রি হচ্ছিল হাতিগুলোর কাছেই — সেটা খারাপ নাকি গরমে ক্ষিদে উবে গিয়েছিল হাতিদের, বলতে পারব না। দুটিতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছিল।

দুটি বানর, বোঝা যায় খুবই দুরন্ত, গরমেও কিছু এসে যায় না তাদের, গিয়ে বসেছে বিরাট এক সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলার ওপর। কাঁছমটার মোটা মোটা খাটো পা, মনে হয় যেন হাতির চামড়ায় তৈরি, সেও পা ফেলাছিল ঘুমন্তের মতো, সন্দেহও করে

নি যে পিঠে দুই সাঙাত জমিয়ে বসে তাদেরই মাসতুতো ভাইদের বৃত্তান্ত বলাবলি করছে।

আলাপের উত্তেজনায় লম্বা লম্বা রোমশ হাত দিয়ে তারা চাপড় মারছিল কাছিমের পিঠে, কীসব বাদাম চিবাচ্ছিল আর ঐ পিঠেই থুথু করে ফেলছিল বাদামের খোসা।

ধীরে ধীরে তারা চলে গেল তালগাছের ছায়ায়, কৌতূহলী সহাস্য লোকগুলোর দিকে দ্রুক্ষেপও করলে না।

জিরাফ তার ছোটো ছোটো শিঙওয়ালা সরু মাথাটা নাড়ছিল বড়ো বাজুর মতো। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার লম্বা গলাটা থেকে নিজের মাথাটাই পাক দিয়ে খুলে ফেলতে চায়, নইলে বড়ো অসুবিধা হচ্ছে তার।

বনবিড়াল জাতের ছোটো ছোটো জানোয়ার জোড়ায় জোড়ায় তাদের বাকের ছায়াটুকুতে এমনভাবে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে যে মনে হয় যেন শূন্যে আছে দুই মৃগের একটা জন্তুই, ঘূমের মধ্যে ফোঁসফোঁস করছে।

যেখানেই তাকাই, সর্বত্রই দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা দিচ্ছে পশু-পাখি অথবা আধা ঘূমে ব্যাজার হয়ে আছে। আর সে কী পাখি! এক ধরনের পাখির মাথায় থালার মতো কী একটা, আর সেটা তার ঠোঁট ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে, রঙও তার ঠোঁট বা মাথার চেয়ে অন্যরকম। যেমন, ঠোঁট হয়ত হলদে, মাথাটা নীল কিংবা লাল অথবা নীল লাল ডোরাকাটা, আর থালাটা বাদামী। কোনো কোনোটার গলা পর্যন্ত গোটাটা আলতা রঙের, গলা আর মাথাটা ধবধবে শাদা। কোনো পাখির মাথা নানা রঙের। প্রথম বার যখন তাদের দেখি, তখন বর্ণোজ্জ্বলতার বৈশিষ্ট্যে খ্যাতিমান এক স্থানীয় শিল্পীকে বলেছিলাম চিড়িয়াখানার ওই পাখিগুলোকে বোধ হয় তিনিই রাঙিয়ে দিয়েছেন। হেসে উঠলেন শিল্পী, তবে বোঝা গেল খুঁশিই হয়েছেন আমার কথায়।

সারসগুলো তাদের নীল উর্দী গায়েই ঘুমুচ্ছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কাদাটে সবুজ জল থেকে বেরিয়ে এসেছে কুমির, ঘোলাটে একটা চোখ তার মিটমিট করছে, ঘুমুচ্ছে অন্যটা। চেপে বসা চোয়াল থেকে বুলছে ভেজা খানিকটা বাদামী শ্যাওলা, যেন বলতে চায় ও কেবল ঘাসপাতা শ্যাওলা খেয়ে থাকে, প্রাণী বধ কখনো করে না।

ফুঁতর্তে আছে কেবল ভূরিভোজী ভোঁদড়গুলো। ছুঁড়ে দেওয়া মাছগুলোর পেছনে ধাওয়া করছে তারা, তাড়িয়ে আনছে চৌবাচ্চার কোণে, জল থেকে ছুঁড়ে দিয়ে লোফাল্‌দ্রিফ করছে মজা করে, কত রকম খেলছে, গরম তাদের গায়ে লাগছে না। কোনো কোনো মক'ট এক ধরনের কাকাতুয়ার মতো মাথা নিচের দিকে করে বুলছে এক বড়ো ডুমুর গাছ থেকে, ভারি ভারি কালচে-সবুজ পাতার কম্বল জড়িয়ে মোটা মোটা ডাল আঁকড়ে ওই অবস্থাতেই ঘুমুচ্ছে।

শাদা কালো রাজহাঁসগুলো জলের মধ্যে তাদের লম্বা গলা ডুবিয়ে স্থির হয়ে আছে লেজ তুলে। আমাদের চারপাশের সবকিছুই ঘুমুচ্ছে আর ঢুলছে। বন্ধ মণ্ডপগুলোর দরজার আতপ্ত ধাতব হাতল থেকে বেরচ্ছে নীলাভ ছটা। মনে হল আমাদের চারপাশের সব জিনিস থেকে বিকিরিত হচ্ছে তাপ। নিস্তার নেই তা থেকে।

খোলা মাঠে, হালকা কিন্তু বেশ ঘন তারের জালের ওপাশে একটা টিবি'র ওপর পড়ে আছে কালচে-বেগুনী কী একটা জিনিস। আমার মনে হয়েছিল নগ্ন কোনো মানুষই বৃষ্টি শুষে শুষে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল ওটা প্রকাণ্ড একটা হনুমান, শুষে আছে মাথার তলে হাত দিয়ে, আমাদের হাজার ডাকাডাকিতেও নড়ল না।

এই নারকীয় গরমে হিমসিম খেয়ে আমরাও চাইছিলাম আধ-ঘুমন্ত চোখে, হাঁটছিলাম কোনো ছকের বালাই না রেখে, খুঁজছিলাম

কেবল আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টকে। কিন্তু পাখি বা পশু জগতের কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

লম্বা একসারি খাঁচার দিকে গেলাম আমরা। ছেলেপিলেদের ভিড় জমেছে সেখানে, মা-বাপেরাও আছে তাদের সঙ্গে, নানান কণ্ঠে তারা জন্তুদের ডাকাডাকি করছে, যাতে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এসে দর্শন দেয়। কিন্তু ওদের সব আবেদনই ব্যর্থ হল, প্রায় কেঁদে ফেলে জানোয়ার দেখার ঝোঁক ধরিছিল বাচ্চারা। কিন্তু একগুঁয়ে এই সব জন্তু তাদের কাঠের ডেরার ভেতর ঢুকে এমনি ঘুম দিচ্ছিল যে দেখা যাচ্ছিল কেবল তাদের ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করা পেটের খানিকটা কিংবা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মরার মতো পড়ে থাকা পেছনকার থাবা।

একটা খাঁচার কাছেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিছিল। তেমনি সপরিবারে দাঁড়িয়ে আছে একটা দল, কাঁদছে একটা ঝোঁক-ধরা খুঁকি, খুঁত-খুঁত করছে থোকা। ওদের দাবি, মা-বাপে যেমন করে পারে জন্তুটাকে জাগিয়ে তুলুক, এশ্বর্দুনি যেন তা বেরিয়ে আসে তাদের সামনে। অনেক করে মা বোঝালে যে কাঁদতে নেই, চেঁচাতে নেই। বাপ রহস্য করে কী যেন একটা বললে ছেলেটাকে, কিন্তু তার নাকি কান্না তাতে আরো বেড়েই গেল।

‘বাপ কী বললে?’ জিজ্ঞেস করলাম ভার্সিলি ইভানোভিচকে, দেশী ভাষা তিনি জানতেন।

‘বললে, ও কান্ড করতে পারে কেবল যোগীপদ্রুর্ষে... তাহলে,’ একটু চুপ করে থেকে যোগ করলেন তিনি, ‘যোগীই হতে হয়।’

এই বলে একেবারে এগিয়ে গেলেন শিকের কাছে, ঠিক যেখানে নোটিশ টাঙানো: কাছে আসা নিষেধ, বিপদ হইতে পারে। এই সময় একটা জিনিস চোখে পড়ল আগে যা খেয়াল করি নি। হাতে তাঁর একটা সাধারণ কাগজের ব্যাগ আর খবরের কাগজের কী

একটা মোড়ক। খাঁচায় ধাক্কা দিয়ে তিনি শান্ত সুরেলা গলায় ডাকলেন: ‘বিপ্লি, এই বিপ্লি।’

‘বিপ্লি আবার এখানে কোথায়?’ বললাম অবাক হয়ে।

শিকের ভেতরে বাসাটায় ঘুমছে হুণ্টপুণ্ট সন্দের একটি চিতাবাঘ, পিঙ্গল রঙের সারা গায়ে কালো কালো ছোপ। সেও কাত হয়ে শূন্যে আছে, কোনো শব্দেই কানটুকু পর্যন্ত নাড়াচ্ছে না। কিন্তু আমাদের ভাসিলি ইভানোভিচ ফের তাকে ডাকতে লাগলেন, এবার আরো জোরে, ‘বিপ্লি, এই বিপ্লি!’

হঠাৎ আধখানা চোখ মেললে জন্তুটা, কান পেতে শুনলে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, তারপর বড়ো একটা বেড়ালের মতো গরগর শব্দ করে লাফিয়ে উঠল, চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল আলোয়, এবং এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে শিকের কাছে, একটা গাড় ঘড়ঘড় শব্দ করতে লাগল বুক দিয়ে।

ভাসিলি ইভানোভিচকে দেখে বাঘটা শিকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল যেন চায় ওর গায়ে হাত বুলানো হোক। বেড়ালেও ঠিক এইভাবেই গৃহস্বামীর পায়ে ঘা ঘসে আদর কাড়ে। আর সমস্ত ভারতীয়দের তথা আমাকেও অবাক করে দিয়ে ভাসিলি ইভানোভিচ সোজা শিকের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে জানোয়ারটার খাটো, মোটা মোটা কানের পেছনে সড়সড় দিতে লাগলেন এমন অনায়াসে যেন ওটা বাঘ নয়, বাড়ির পোষা বেড়াল।

ভারতীয়দের মধ্যে তখন সে কী হুলস্থূল! উল্লাসে বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল তারা, চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে উঠতে লাগল, আর ছেলেপিলেরা নাকি কান্না থামিয়ে ছোটো ছোটো মূখ হাঁ করে দৃশ্যটা গিলতে লাগল দৃ’চোখ দিয়ে। এই ঘূমের রাজ্যে এটা যে এক রূপকথা, সে রূপকথা ভারি মনে ধরেছে তাদের।

ব্যাগ থেকে খবরের কাগজের মোড়ক খুলে মুরগীর টুকরো বার করলেন ভাসিলি ইভানোভিচ, শিকের ভেতর দিয়ে যাতে সহজে গলে যায় সেজন্যে তা ছোটো ছোটো খন্ড করে খেতে দিলেন চিতাটাকে। মধু রঙের বড়ো বড়ো হলুদ চোখে তা দেখে বাঘটা বেশ ঘোঁৎঘোঁৎ করেই তা গিলতে লাগল, তার মসৃণ গরগরানির ফাঁকে ফাঁকেই কেবল শোনা যাচ্ছিল হাড় চিবানোর হালকা কড়মড়। এক লহমাতেই মুরগীটা খেয়ে, মুখ চেটে সে তার গা এগিয়ে দিলে, এবার তা চুলকে দিতে হবে।

দেখলাম, তার মোটা খড়খড়ে গা'টা ভাসিলি ইভানোভিচ রগড়ে দিচ্ছেন আদর করে। তবে এমন বেড়ালকে আদর করা সহজ নয়। লোম তার এতই ককর্শ যে সাধারণভাবে হাত বুলানো অসম্ভব, আগে সিঁথি কাটার মতো তা পাট করে নিতে হচ্ছিল, কিন্তু সিঁথি জমিছিল না তেমন। এ হল একটা মোটা গালিচায় বিলি কাটার মতো, যাতে চিমাটিও দেওয়া যায় না।

এইভাবেই চিতাবাঘের মহানন্দে লোমে তার বিলি কাটতে লাগলেন ভাসিলি ইভানোভিচ। জন্তুটা চোখ উলটে এমনভাবে শিকে চাপ দিতে লাগল যে মনে হল এই বুকি তা ভেঙে পড়ে। ভাসিলি ইভানোভিচের আঙুলগুলো ঘাড় বেয়ে উঠে গেল মাথা পর্যন্ত, তারপর কানে। শেষকালে তিনি স্ফুটস্ফুট দিতে লাগলেন তার থুতনিত। অন্ধ আতঙ্কে ভারতীয়রা নিখর হয়ে তাকিয়ে রইল কেবল, মুখ দিয়ে তখন আর তাদের কোনো হর্ষধ্বনি বেরাচ্ছিল না।

‘এ নিশ্চয় যোগীপুরুষ,’ ছেলেদের বললে বাপ, ‘আস্তে, গোলমাল করিস না।’

কার সাধ্য গোলমাল করে এই অসাধারণ দৃশ্যটায়! সত্যি বলতে, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। ব্যাদিত মূখটা আমার এত

কাছে আর সে মুখের এত কাছে ভাসিলি ইভানোভিচের হাত
যে জানোয়ারটার একটা ঝটকাতাই অপঘাত অনিবার্য। জানোয়ারটা
কিন্তু কেবল আহ্বাদে গরগর করে মেঝে আঁচড়াতে লাগল তার
বড়ো বড়ো কালো নখ দিয়ে। কালো কালো ছোপ দেওয়া তার
পিঙ্গল দেহটা বেঁকে গেল তৃপ্তিতে।

ভাসিলি ইভানোভিচের দিকে ভারতীয়রা চাইছিল যেন সে
একজন যোগীপুরুষ, ঐন্দ্রজালিক। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম।
ভিড় জমে উঠেছে আমাদের ঘিরে। দৃশ্যটায় সবাই আকৃষ্ট। পেছনে
ফিস্‌ফিস্‌ শুনলাম: ‘রুশী! রুশী!’

ওটা আমাদের উদ্দেশ্যে।

‘রুশী যোগী! রুশী যোগী!’ কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল
সশব্দে।

ব্যাপারটা কতক্ষণ চলতে পারত তা জানি না, কিন্তু এই সময়
ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি লম্বা মানুষ, কালচে-রঙা তার
মোচ, সঙ্গে বছর নয়েকের একটি ছেলে। বললে:

‘আরে আপনারা এখানে। আমি ওদিকে আপনাদের খুঁজে
বেড়াচ্ছি গোটা চিড়িয়াখানা। শুনলাম আমাকে নাকি আপনার
জরুরী দরকার ভাসিলি ইভানোভিচ।’

ভারতীয়রা ভাবল ইনি এক নতুন যোগী, জীবজন্তু বশীকরণের
মন্ত্র জানেন। কিন্তু না, ইনি হলেন আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট।

কী ঘটছে দেখে তিনি ফের বললেন, ‘আরে, গায়ে কেমন
মাংস লেগেছে বিপ্লির, বেড়ে উঠেছে, চেনাই যায় না। দিব্যি
হোমরাচোমরা জীব...’

শেষ বারের মতো ওর কানের পেছনটা চুলকে দিলেন ভাসিলি
ইভানোভিচ, থুতনি ধরে নেড়ে দিলেন, হাত বদলিয়ে দিলেন
চিতাবাঘটার নাকে, বাঘও তার চোখ দুটি বন্ধে এমন ঝঙ্কার
তুলে গরগর করতে লাগল যেন ঘণ্টি বাজছে। নিশ্বাস ফেলে

ভার্সিলি ইভানোভিচ চলে এলেন খাঁচাটা ছেড়ে। তাঁর সামনে পথ ছেড়ে দিলে ভারতীয়রা। বাঘটা কিন্তু শিকে ঠেস দিয়েই দাঁড়িয়ে রইল, যেন তখনও একটা হাত বন্ধ তার কান টিপছে, বিলি কাটছে তার কড়া লোমে। তারপর চোখ মেলে সে সামনে তাকাল, কিন্তু ভার্সিলি ইভানোভিচকে দেখতে না পেয়ে থাবা দিয়ে শিকে ঘা মেরে এমন হুঙ্কার ছাড়ল যে ভারতীয়রা পিছিয়ে এল খাঁচাটা থেকে।

আমরা না থেমেই এগিয়ে চললাম। শুনতে পাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে চিতার ক্ষুর কণ্ঠ।

‘হ্যাঁ, বিলি বটে,’ চিড়িয়াখানার গেটে পের্ণছে আমি বললাম, ‘সত্যিই আপনি যোগী নাকি, ভার্সিলি ইভানোভিচ?’

‘কিন্তু ওকে বিলি বলছেন কেন, ও তো চিতা?’ ওলেগ নিকোলায়েভিচ বীকভ জিজ্ঞেস করলেন ভার্সিলি ইভানোভিচকে, নীরবে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি।

‘সে এক অন্য কাহিনী,’ বললেন ভার্সিলি ইভানোভিচ, তাঁর গলার স্বরে কেমন একটা বেদনা ফুটে উঠল।

‘আমাদের কারবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে,’ বলে চললেন ভার্সিলি ইভানোভিচ, ‘চায়ের ব্যবসা। দার্জিলিংয়ের চা খুবই সেরা। চা জন্মায় টিলায়, চারিপাশে এখনো বুনো জঙ্গল। সেখানে শিকার করতে গিয়ে শিকারীরা আমার জন্যে একটি উপহার এনে দেয়, চিতাবাঘের একটা কচি বাচ্চা। এতই ছোটো যে রবারের চুষি দিয়ে দুধ খাওয়াতাম। ভারি খেলত, দামাল, জুতো টানত, চিবাত যা পেত। আমার ছেলোটো খেলা জুড়ত তার সঙ্গে। সময় যায়, ছেলেরা বেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে বাচ্চাটাও। তার সঙ্গে সবার ভাব, সবারই কাছে সে অভ্যস্ত। কিন্তু পরে শব্দ আমাদের বাড়ির নয়, সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই খেলা জমাত। তারা তো অনভ্যস্ত, ভয় পেত। কী ভাবে খেলত? লুকিয়ে থাকত ঝোপের আড়ালে, শূন্যে

থাকত মাটিতে পেট ঠেকিয়ে, জ্বলজ্বল করত চোখ, গুঁপে পেতে দেখত কে কোথায় যাচ্ছে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ছেলেটাকে উলটে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তার বন্ধুর ওপর। দাঁত বার করত। তাতে খুবই ভয় পেত কোনো কোনো ছেলে। মায়েদের আতঙ্ক হত, খেলতে খেলতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে যায় যদি। একবার লক্ষ করে দেখলাম ওকে, বসেছিল গুঁপে পেতে, ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার পিঠে, তখন টের পেলাম সত্যি, ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওকে একা ছেড়ে রাখা ঠিক নয়, ভারি হয়ে উঠেছে, নখ বেড়েছে।

‘হ্যাঁ, বিদায় নেবার সময় এসে গেছে ভাইটি। কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় কী, ওটা দরকার। আর বিল্লি নামটা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে, আমার ছেলে ওকে প্রথম দিন থেকেই ওই নামে ডাকছে। পোষা জন্তু, চিড়িয়াখানায় দিতে বন্ধ টন্টন্ করে ওঠে। কিন্তু দিতেই হল। প্রথম দিনটা মন-পোড়ানিতে ও প্রায় মরতে বসেছিল। কতদিন কেটে গেল, অথচ সবই মনে রেখেছে। ছেলেকে আর ওর কাছে যেতে দিই না, তাতে ওদের দুজনেরই বড়ো যন্ত্রণা। নিজেও আমি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কী দরকার, তাতে ওরও কষ্ট, আমারও কষ্ট, কিন্তু আজ আপনারা বললেন, অ্যাকাউন্টেন্টকে চাই, আর তিনি গেছেন চিড়িয়াখানায়। অনেকদিন বিল্লিকে দেখি নি, ভাবলাম, যাই ওর জন্যে একটু মদ্রগীর প্রসাদ নিয়ে, চুপিচুপি রেখে পালিয়ে আসব। আমি জানতাম এই সময়টা সবার মতো ও-ও ঘুমায়। সত্যিই ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু ওকে দেখে আর পারলাম না, ডেকে বসলাম। তারপর আর চলে আসা গেল না। কিন্তু কী আর করা যায়। কী ঘটল নিজেরাই তো তা দেখলেন। এখন দিন তিনেক ও রেগে থাকবে। শান্ত হয়ে আসবে তারপর। উপায় কী। ওর সঙ্গে তো আর এক ঘরে থাকা যায় না। আমি তো আর সার্কাসের জন্তু-খেলোয়াড় নই...’

‘আপনি সব খেলোয়াড়ের ওপরে,’ আমি বললাম, ‘ভারতীয়রা পর্যন্ত আপনাকে যোগীপুরুষ ঠাওরেছে...’

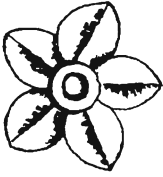
‘কী যে বলেন,’ হাত ঝটকা দিলেন ভাসিলি ইভানোভিচ, ‘আমি আবার যোগী কোথায়! এখন আমার ছেলেকে দেখবেন, কিন্তু বলবেন না যেন বিল্লিকে দেখে এসেছি, নইলে আমার আর রেহাই থাকবে না, কেন ওকে নিই নি... যাক গে, এবার কাজের কথা, কেবল আপনাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করছি। এই আমাদের কমরেড অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনাদের যা দরকার উনি ব্যবস্থা করে দেবেন...’

বাণিজ্য কেন্দ্রের ফটকে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো বিদায় নিলাম ভাসিলি ইভানোভিচের সঙ্গে। সেই সন্ধ্যাতেই দিল্লি রওনা দিলাম ওলেগ নিকোলায়েভিচের সঙ্গে এয়ার-কন্ডিশন্ড ট্রেনে।

ঘুমের আগে নানা কথা আলাপ করলাম আমরা, চিড়িয়াখানার কথা, বিল্লির কথা। সে রাতে বিল্লির স্বপ্ন দেখলাম, খরখরে গাটা সে এগিয়ে দিয়েছে আমার দিকে, বীরের মতো আমি তা চুলকে দিচ্ছি, কিন্তু হঠাৎ সে তার অসন্তুষ্ট মুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে এমন খেঁকিয়ে উঠল যে ঘুম ভেঙে গেল।

কুপের ভেতর সবাই ঘুমচ্ছে। আধো-অন্ধকার। তাকলাম জানলা দিয়ে। গাড়ি যাচ্ছে মহতী গঙ্গার শান্ত অববাহিকা দিয়ে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর পথের ধারে জ্যেৎশ্নায় ধবধবে ধূলিময় টিলাগুলোর ওপরকার স্নদূর ঝোপগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন বিরাত এক ঘুমন্ত চিতাবাঘের গায়ের ছোপ।

হাতি



বর্মা জঙ্গলের হাতির এই আশ্চর্য গল্পটা শুনেনিছলাম ভারতবর্ষে। যাঁর কাছে শুনেনিছলাম তিনি ব্রহ্মদেশে ছিলেন অনেকদিন।

ব্রহ্মদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গহন বনে জন্মায় মূল্যবান টীক গাছ। তার কাঠে বানানো হয় জাহাজ, ওয়াগন, স্লীপার, কেননা দৃঢ়তায় তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে খুব কম গাছই। কিন্তু গজায় তারা গোটাগুটি এক-একটা এলাকা জুড়ে নয়, অন্য নানা গাছের মধ্যে ছিড়িয়ে ছিটিয়ে। তার কাঠ পাবার জন্যে প্রথমে গাছে একটা গভীর ছেদ কেটে গাছ শুকিয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, নইলে কাঠ জলে ভাসবে না, ডুবে যাবে। গাছ শুকিয়ে ওঠার পর তা কেটে নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে, এবং নদী বেয়ে তা ভাসিয়ে আনা হয় ভাঁটি অঞ্চলে, সেখানে তা গুদাম-জাত করে বিক্রি করা হয়।

কিন্তু অর্থপিপাচ বাগিচা মালিকও আছে, যারা তাড়াতাড়ি বেচে টাকা করার জন্যে কচি টীক গাছও কেটে ফেলে। আর নদী পর্যন্ত গাছগুলোকে টেনে নিয়ে যায় হাতিতে, নদীতে কাঠের স্তুপগুলো সরিয়ে দেয় তারা। হাতির পক্ষে কাজটা খুব কঠিন, কেননা নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার পথে গাছগুলো অন্যান্য গাছের সঙ্গে আটকে যেতে থাকে।

লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে কাঠ বয় হাতিরা, কোথাও তা শৃঙে ধরে তোলে, কোথাও ঠেলা দেয় পা দিয়ে, কোথাও গুঁতো মারে মাথা দিয়ে, গাড়িয়ে নিয়ে যায় টীক গাছের ভারি ভারি কাণ্ড।

একবার মস্তো এক গহীন বনে সবার নজর এড়িয়ে একজন ঔপনিবেশিক ইংরেজ কচি কচি টীক গাছ কাটতে শুরুর করে, হাতিগুলো তার অবিরাম খেটে যায়, কেননা ভরা নদীতেই কাঠ

নিয়ে যাবার জন্যে তাড়া করছিল সে, তাতে কাঠ চড়ায় আটকাবে না।

একদিন সকালে তার বনের বাড়িতে ছুটে এল একজন হাতির সর্দার, চেঁচালে:

‘কী করা যায় সাহেব, বুনো হাতির পাল এসে ভিড়েছে।’

‘কোথায় এসেছে?’ জিজ্ঞেস করলে সাহেব।

‘আমাদের পোষা হাতিগুলোর সঙ্গেই তারা ঘুরছে, কাজ দেখছে ওদের।’

‘ওদের তাড়িও না,’ বললে সাহেব, ‘কেননা ওরা যদি মারামারি বাধায় বা মানুষদের ওপর ক্ষেপে ওঠে, তাহলে খুবই বিপদ হবে, গোটা কাজটাই পণ্ড হয়ে যেতে পারে। নজর রাখো ওদের ওপর এবং আমায় জানাও।’

পোষা হাতিরা যেসব জায়গায় খাটিছিল, সর্বত্রই ছাড়িয়ে পড়ে বুনো হাতিরা লক্ষ করছিল তাদের স্বজাতীয়দের কাজ। মনে হল যেন বন্ধু পাচ্ছে না ভারি ভারি কাটা গাছগুলোকে বনময় ঠেলে গাড়িয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনটা কী। মানুষদের দিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করলে না, তারাও হুকুম মেনে কোনোরকম বিরক্ত করলে না তাদের।

এইভাবে দিনের পর দিন কাজ লক্ষ করতে করতে বুনো হাতিরাও পোষা হাতিদের সঙ্গে কাজ করতে শুরুর করে দিলে, জঙ্গলে তারা ফিরে যেত কেবল তখন যখন পোষা হাতিরাও জিরতে আসত। প্রতিদিন তাদের আচরণের রিপোর্ট দেওয়া হত সাহেবকে। একদিন আশ্চর্য এক ঘটনা শুনল সে। খবরটা দেয় তার ভীত ও দিশেহারা সর্দার। সে বলে যে কয়েক দিন থেকে বুনো হাতিরা পোষা হাতিদের সাহায্য করে কাজ করছে। গুঁড়ি গাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা, শুঁড়ি দিয়ে তা তুলছে, মাথা দিয়ে ঠেলেছে, এবং সবই করছে খুব আগ্রহ নিয়ে। কী করে করতে হবে পোষা

হাতিরা তা দেখিয়ে দিচ্ছে। সবাই তারা খাটছে একসঙ্গে। এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার, সাহেবের আনন্দ আর ধরে না। মূফতে সে এতই নতুন নতুন হাতি পেয়ে গেছে যে যত পারা যায় গাছ কাটতেও আর বাধা নেই।

ব্যাপারটায় নিঃসংশয় হবার জন্যে সে ঘোড়ায় চেপে দেখতে গেল বুনো আর পোষা হাতি যেখানে একসঙ্গে খাটছে। সর্দার যা বলোঁছিল ঠিক তাই। পোষা হাতিদের পাশাপাশি বুনো হাতিরা ফোঁসফোঁস করছে, হাঁপিয়ে উঠছে অনভ্যস্ত কাজটায়। বোঝা যাচ্ছিল যে ওদের মূর্খাশীল হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে, বৃদ্ধিতে পারছে না কপাল দিয়ে ঠেলে গুঁড়িগুলোকে গাড়িয়ে নিয়ে যাবার দরকারটা কী, তাহলেও সেটা তারা করছে কেবল পোষা হাতিগুলোর দেখাদেখি।

খুঁশি হয়ে সাহেব হিশেব করতে লাগল কত সে মুনোফা ওঠাবে, প্রথমত দু'গুণ কাঠ নিয়ে গিয়ে, দ্বিতীয়ত কাজ শেষের পর বুনো হাতিগুলো বিক্রি করে।

কাজে এই পরিমাণ কোঁতুহল ও ক্লান্তিহীনতা দেখানো বুনো হাতিগুলোর সঙ্গে মাহুত ও সর্দাররা কিছু কাল পরে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে তারা সাধারণ পোষা হাতিদের মতোই চোটপাট শুরুর করে দিলে ওদের ওপর, এমন কি মারতেও লাগল।

একদিন সাহেবটি স্বপ্ন দেখলে, সে রাজার মতো ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে, আছে তার রাজপ্রাসাদ। হাতিরা তার সেবা করছে দাস-দাসীর মতো। পাহারা দেয় তার জন্যে, বাগানে ঘুমোবার সময় দোলা দেয় তার দোলনা-পালঙ্কে। বনে যেখানে বুনো আর পোষা হাতিরা অমন মিলেমিশে খাটোঁছিল, সেই জায়গাটা দেখতে গেল সে। কিন্তু কাকেও দেখা গেল না কোথাও।

লোকজন পশুপাল কেউ নেই দেখে অবাক হয়ে সাহেব এগুল গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্যের আরো গভীরে, কিন্তু কাজকর্মের কোনো

চিহ্নই কোথাও চোখে পড়ল না। সর্বত্রই টীক গুঁড়ি পড়ে আছে। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। অবিশ্য একেবারে স্তব্ধ নয়, কেননা পাখি ডাকছিল, কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করে ডালে ডালে লাফালাফি করছিল বানর, বাদাম আর পল্লব ছুঁড়ে ফেলছিল সাহেবের ওপর।

কী হয়েছে কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। কোথায় গেল তার হাতি আর সর্দাররা। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় তারা ফিরল একেবারে জেরবার হয়ে, দরদারিয়ে ঘাম বরছে, আতঙ্কিত চোখ। বললে:

‘চলে গেছে ওরা, সবকটা চলে গেছে...’

‘সে কী, হাতি চলে গেল?’ চিৎকার করে উঠল সাহেব, ‘বুনোগুলো নয় গেল, আমাদেরগুলো?’

‘আমাদেরগুলোও চলে গেছে ওদের সঙ্গে। সকালে কাজ শুরুর করে এরা, বুনোগুলোও আসে। ভিড় জমাল সবাই, তারপর কাজের বদলে চলে গেল বনে। আমরা পেছ পেছ ছুটে গিয়ে জোর করে ওদের ফেরাবার চেষ্টা করি, কিন্তু শুঁড়ে জড়িয়ে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আমাদের মাথার ওপর শুঁড় দোলাতে থাকে, পা দেখাতে শুরুর করে, তার মানে আমরা ওদের পেছ নিলে পা দিয়ে পিষে দেবে...’

‘হলটা কী,’ রোষে আতঙ্কে জিজ্ঞেস করল সাহেব।

‘বুনোগুলো ওদের বুঝিয়েছে সঙ্গে যেতে,’ বললে বড়ো মাহুত, ‘হাতিদের আমি-চিনি ছোটো থেকেই। জীবনে এই দ্বিতীয় বার এই দেখলাম। এই এলাকায় তিরিশ বছর আগেও এমনি ঘটেছিল। পোষা হাতিরা কেমন আছে দেখতে আসে বুনোরা। তাদের সঙ্গে খাটারও চেষ্টা করে তারা। তাদের মনে হল, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কে জানে কেন ভারি ভারি সব গুঁড়ি ঠেলার চেয়ে বরং বনে স্বাধীন থাকাই ভালো। আমাদের হাতিগুলোকেও ওরা বোঝায় কাজ ছেড়ে চলে আসুক।’

‘এক্ষুনি ওদের ফেরানো দরকার। ঘেরাও করতে হবে! বিদ্রোহী সব,’ চেঁচিয়ে উঠল সাহেব, ‘গুলি করা দরকার বুনোগুলোকে।’
কিন্তু মাথা নাড়লে সর্দার:

‘ওদের আর পাশ্লা ধরা যাবে না। চলে গেছে তল্লাট ছেড়ে। আমাদের পোষা হাতিগুলোও ফিরবে না আর। বনের জীবনের স্বাদ পেলে আর কাজে ফিরতে চাইবে না। আগেও একবার তাই হয়েছিল। কেন ফিরবে, দিবি্য থাকবে বনে। ফেরে কেবল মানুুষে, কেননা মানুুষ চায় মানুুষের সঙ্গে থাকতে, তা সে জীবন যতই কষ্টের হোক।’

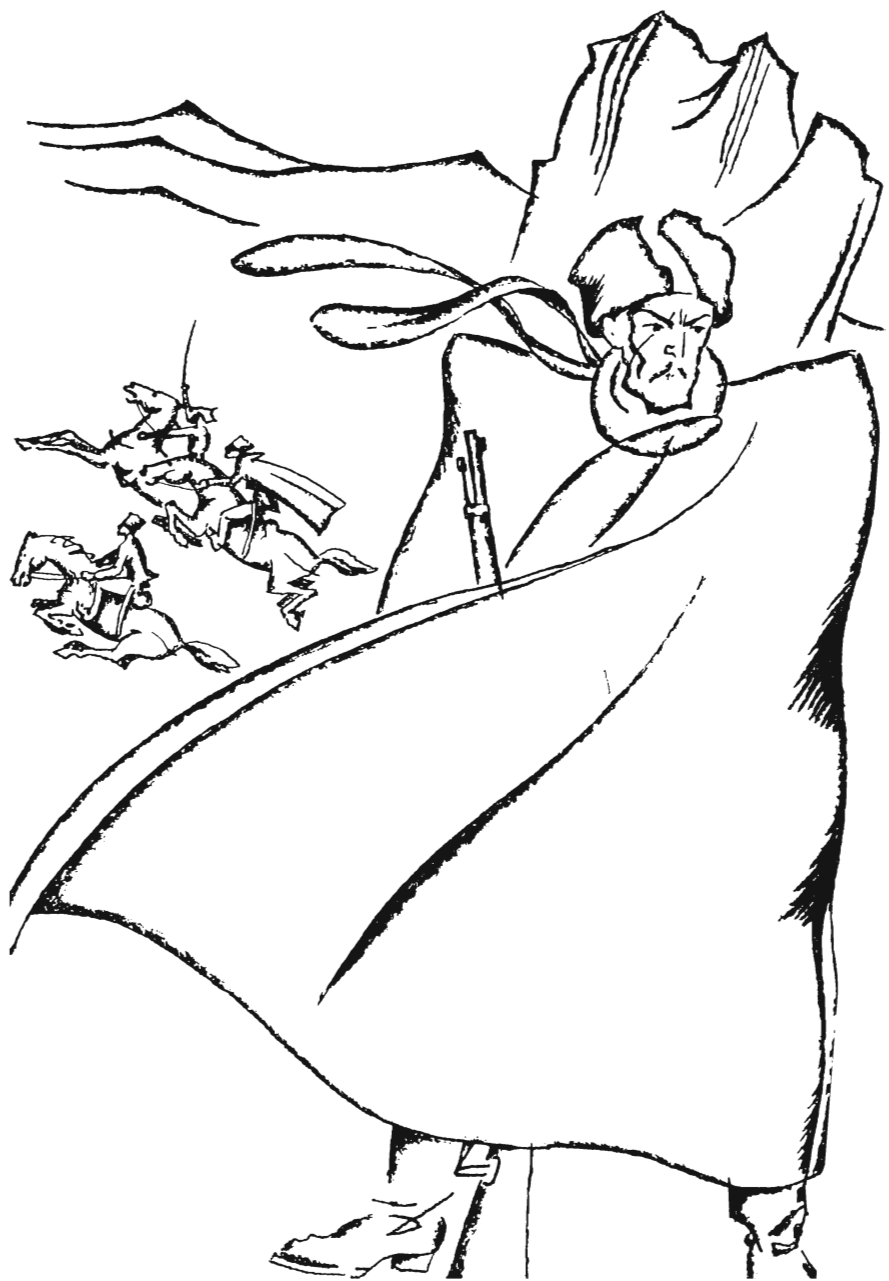
‘চুপ করো তো, যত বাজে কথা!’ বললে সাহেব, ‘ওই দ্যাখো, কী একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না?’

কান পেতে শুনলে সবাই। না, ওটা দূর থেকে আসা নদী স্রোতের কল্লোল, আর বানরগুলোর সঙ্গে ঝগড়া বাধানো রঙচঙে পাখিগুলোর তীক্ষ্ণ কাকলী।

‘ফিরবে না ওরা,’ বললে সর্দার, ‘আমি জানি, কখনোই আর ফিরবে না।’

রক্ত রাঙা চোখে সাহেব তাকিয়ে দেখল বেআইনীভাবে কাটা যত্রতত্র পড়ে থাকা টীক গাছের গুঁড়িগুলোর দিকে, এই ভেবে তার মনে জ্বালা ধরল যে দিন কয়েকের মধ্যেই নদী ভরে উঠবে, কিন্তু কোনোই লাভ হবে না তাতে, টাকা করার স্বপ্নটা তার মাত্র স্বপ্নই।

বাস্তবে রইল শুধু তাকে উপহাস করার জন্যে বন জুড়ে স্তব্ধতা আর পলাতক হাতির পাল, চলে যাচ্ছে তারা তাদের গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্যের গভীর থেকে গভীরে।





প্রাচ্য প্রথ





মহানদী

১



ব্যাপারটা ঘটে তিরিশ সালের বসন্তে।
বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একটি লোক।
গায়ে তার দলামোচড়া হালকা স্ফুটী কোট,
মোট কাপড়ের শার্ট, গলার বোতাম খোলা,
মাথায় ধূলিময় শাদা টুপি। পাকধরা মোচ,
রোদপোড়া গাঢ় রঙ, ঠোঁটের কাছে কড়া ভাঁজ,
আর থুতনির ওপর একটা কাটা দাগে তার মূখখানা দেখাচ্ছিল
প্রায় সৈনিকের মতো।

তাকিয়ে ছিল সে রাত্রির মরুভূমির দিকে। বেগুনী-সবুজ
আকাশে শাদা শাদা আর খোঁচা খোঁচা সবজেটে তারাগুলোর
মাঝখানে চওড়া-পানা গুরুভার চাঁদ। চমৎকার দেখা যাচ্ছিল কাছের
শাদা শাদা টিবিগুলো, মনে হয় যেন নূন ছিটানো। তাদের পেছনে
ধূসর আবছায়ায় তিলিয়ে যাওয়া অজানা, শেষ নেই তার। সেখান
থেকে, ঐ অজ্ঞাত, অপ্রসন্ন, জনহীন অঞ্চলটা থেকে বাতাসে ভেসে
আসছিল ঝাঁঝালো, কটু-লবণাক্ত, বিসদৃশ কী একটা গন্ধ।

সশঙ্ক বিষাদে স্থিসিত এই মরুভূমির সীমান্ত, যেখানে শেষ
হয়েছে পল্লবিত গাছ-পালা ভরা সবুজ বাসন্তী মাটি, আর নিষ্প্রাণ
টিবিগুলোর একঘেঁয়ে সারিটার পর শূন্য হয়েছে হতোদ্যমকারী
নিরানন্দ, ভয়ংকর, আপনার আদিম পরাক্রমে উল্লসিত এক বিস্তার,
যার সামনে শাদা টুপি পরা ওই লোকটা আর এই গ্রহণ পূর্ণিমায়
যারা তার সঙ্গে ছিল সবাই অসহায়।

সেখানে মরুভূমি আর তার সুকঠোর নিয়ম-কানুন, হাড়-
পোড়ানো গরম, রাতে তুহিন শৈত্য, নারকীয় স্তব্ধতা আর
বালুঝঞ্ঝার ঘর্ঘর, কষ্টকর, দন্ধে মারা মরীচিকা, আর জলাভাব, তার

তাপ রাজ্যে হানা দেওয়া মানুষের বিরুদ্ধে এটা তার রক্ষাকবচ।

বালি, পায়ের নিচে মড়মড় করে বালি, ধুলোর মতো মিহি ধূমায়িত বালি, ঝড়ে আর গরমে পালিশ হওয়া, ফেটে ফেটে যাওয়া, নুনের চোখ ধাঁধানো শাদা শাদা স্তরে ঝলকে ওঠা ভারি ভারি বালি, চামড়ার সোলের ভেতর দিয়েও টের পাওয়া উত্তপ্ত বালি, মরা, ন্যাড়া, নদীস্রোতের মতো ধাবমান বালি হঠাৎ যা উঁচু হয়ে উঠেছে বালিয়াড়িতে, নেমে গেছে অতীতের বিশুদ্ধ স্রোতোস্বিনীর ফাটলে, মরুর খাদে পড়ে থাকা বালি...

বালুময় টিলার ওপর যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার পায়ের কাছে চিকচিক করছে জল। সে জল যাচ্ছে ছোটো একটা ক্যানেল দিয়ে, আর নৈশ তমসায় অবিরাম মিলিয়ে যাওয়া তার স্রোতের ঝিকমিকিতে মনে হয় যেন বর্মান্বত কোন এক প্রাচীন কালের সৈন্যবাহিনী শত্রু আক্রমণে নেমেছে তাদের নিশীথ অভিযানে। আর সেনাপতির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা লক্ষ করছে হাজার হাজার স্রোত-সৈন্যের গতি।

শুকনো ছোটো ছোটো হাত দিয়ে সীমাহীন মরুর দিকে দেখিয়ে লোকটা আমাদের বলছিল, ‘এই ক্যানেল দিয়ে আমি আমু-দারিয়ার বাড়তি জল ছেড়েছি মরুভূমিতে। সে জল গেছে এমন খুশিতে, এমন দ্রুত যেন বহু কালকার চেনা খাত দিয়ে বইছে। এ হল খলিফার জল, মরুভূমি জয় করবে তা। ডজন ডজন কিলোমিটার পর্যন্ত তা গেছে, তুষিতের মতো তা শুষে নিয়েছে মরু মাটি। বসন্তে আমি পরখ করতে গিয়েছিলাম। জলধারা যেখানে একটা দীর্ঘ রচনা করে শেষ হয়েছে, সেখানে এর মধ্যেই জন্মেছে হোগলা, সেলিন, ঝাউ। তীরে এসে নামছে পাখি। এ হল মহাভবিষ্যতের জল। বিশ্বাস করুন, কুয়ো দিয়ে সমস্যা মিটবে না। আমি হয়ত ততদিন বাঁচব না, নিজের চোখে দেখা হবে না, কিন্তু নিশ্চিত জানি যে এখান থেকে আমু-দারিয়ার এই জল পৌঁছবে

মর্গাবে। আপনার বয়স কম, মোটর-বোট কি স্টিমারে আপনারা একদিন কোর্ক থেকে যাবেন মারিতে।

‘আমি বড়ো, লোকে ভাবে পাগলা! কেননা কেবলি খলিফার জলের কথা পাড়ি। জলের প্রাণ কোথায় টানছে সেইখানে আমার চোখ। এ জল প্রাজ্ঞ, জীবন্ত। জানে তার প্রাচীন পথটা ওইখানে, স্মরণাতীত কালে একসময় যে পথ দিয়ে সে গিয়েছিল, সেই দিকে যেতে সে উন্মুখ। স্বপ্ন দেখি এই রূপোলী ঝলকের, ঝলতে যা আমি পাঠাচ্ছি। আমার কাছে হার মানছে সে, কেননা আমি মানুষ, টের পাচ্ছে আমার প্রতাপ...’

চুপ করে গেল সে, অনেকক্ষণ চুপ রইল যেন ঘোলা, স্রোতোভঙ্গগুলোয় মিটমিটে ঝলক দেওয়া জলের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনছে।

থেকে থেকে সূর্যের বিদ্যুতের ঝলক দিচ্ছিল মরুভূমিতে, ভেসে আসছিল চাপা, নিভৃত খসখস শব্দ, ক্যানেলের ওপারে শক্ত শক্ত ঝোপগুলোর ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাঁক-ঝাঁধা মরা পঙ্গপালের ওপর দিয়ে শনশনিয়ে বইছিল বাতাস। খসে খসে পড়া সবুজ খোলা আর কুঁকড়ে আসা হিংস্র ঠ্যাঙ সমেত পঙ্গপালের অবশেষগুলো নড়ে নড়ে উঠছিল তাতে। ভয়ঙ্কর সেই ডানা-মেলা অক্ষৌহিনীর অবশেষ, যা উড়ে এসে, পদাতিক বৃহৎ রচনা করে ধ্বংস করে ক্ষেত-বাগিচা। পড়ে ছিল তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে, গত বছরের রণক্ষেত্রের স্মৃতির মতো, মরুভূমির মৃত দোসর।

মনে পড়ল কিছুদিন আগে দেখা একটা গ্রামের কথা, অলক্ষ্যে চোঁকাট পেরিয়ে বালি এসে পড়েছে সেখানে, পরিত্যক্ত ফাঁকা ঘরগুলোয় ফুঁয়ো-ফুঁয়ো টিপ বেঁধেছে, ঝরে পড়েছে ভাঙা মেটে সিলিঙ থেকে। সরে গেছে লোকে। বছর কয়েক পরে গাঁয়ের জায়গায় মাথা তুলবে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি, কাঁপা কাঁপা, উত্তপ্ত বাতাসে ধ্বংস করবে তার চুড়ো।

বালুময় টিপি ওপর দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, যেন মন্ত্রাবিশ্ট করছে মরুভূমি আর নিশীথনীরকে, যেন অন্ধকারে বাড়িয়ে দেওয়া ওর হাতটায় আছে কোন অলৌকিক শক্তি। আমিও দেখতে শুরু করলাম এই মরা রাজ্যে প্রাণ পাচ্ছে মাটি, বেড়ে উঠছে গাছ, উড়ে আসছে পাখি। অনাবিল প্রশস্ত জলস্রোতে ভাসছে জাহাজ।

ইচ্ছে হল, টিপি থেকে নিচে নেমে যাই ক্যানলে, জলের ওপর হুমুড়ি খেয়ে নিশ্চিত হই যে ওটা স্বপ্ন নয়, নয় মরিচীকা, যাতে তপ্ত বালুকে মনে হয় জলস্রোত। খাড়াই পাড় বেয়ে নেমে এলাম, বসলাম উবু হয়ে, অঞ্জলি ভরে নিলাম হাত কনকনিয়ে ওঠা ঘন জল, যা উঁচু উঁচু পর্বত থেকে নেমে, কালো কালো সঙ্কীর্ণ খাদ দিয়ে ঝাঁপিয়ে, ঘূর্ণিপাকে ফোঁসফোঁসিয়ে, চড়া ভাসিয়ে ছুটে এসে এখন একটানা স্রোতে চলেছে রাত্রির মরুতে। সত্যিই যুদ্ধে চলেছে তা। মরুকে দমন করতে।

২

যেখানেই চোখ ফেরাই জল। কখনো তা সোহাগ করে ছলকে পড়ছে আমাদের বোটের গায়ে, কখনো ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার বেগের স্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রাণপণ শক্তিতে, কখনো আবার আমাদের চড়ায় ঠেকিয়ে হিসহিসিয়ে হাসছে তার ধূর্ত জল-ঢাকা বালুপৃষ্ঠ থেকে সরে আসার জন্যে আমাদের তোড়জোড় দেখে, কখনো ঘুরিয়ে দিচ্ছে বোট, লীলাচ্ছলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে উল্টো তীরে, কখনো আবার রেগে পাক খাওয়াচ্ছে অপ্রত্যাশিত ডুবো বালুচরে।

দিনের পর দিন আমরা বেয়ে যাচ্ছি আমরু-দরিয়া দিয়ে। অপূর্ব সে যাত্রা। তীর প্রায় দেখাই যায় না। কোথায় যেন উত্তাপের নীলাভ কুহেলীতে আবছা দেখা যায় বন কি হোগলার সবুজাভ একটু

ফালি। কখনো সেই সবুজ ফালিটার ওপর আলস্যে ভেসে ওঠে মরুভূমির সবুজ ঢিপি, আর হঠাৎ তা মিলিয়ে যায় মরিচীকার মতো।

সরে সরে যাচ্ছে চ্যাটালো চ্যাটালো দ্বীপ, তার ঝোপ-ঝাড়ো নড়ে চড়ে উঠছে, উড়ে আসছে, তীরের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। দেখা যায় কেবল পাথার অসংখ্য ঝাপট আর ঝলক, শোনা যায় কেবল অবিরাম ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, সোরগোল, যেন নদীতে আছে কেবল ওরা একাই, নদীর গোটা রাজ্যটা কেবল তাদের জন্যেই।

রোদের যে সংহারক শক্তি থাকে মরুভূমিতে, জলে তা নেই। শূন্যে থাকা যায়, উপভোগ করা যায় নদীর শান্তি, দোলা যায় তার নীরবতায়, সবকিছুই দেখা যায় একেবারে অন্য চোখে।

এই নদীটার মতো প্রাচীন, চুপচাপ, রোগামতো এক তুর্কমেন গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ঘোরাচ্ছে প্রকান্ড, ভারি হালখানা। শ্যেনের মতো তার চোখ, গায়ে ঝল ঝোলা-কাটা সবুজ আলখাল্লা। সে আমাদের মাঝি বা ক্যাপটেন। তার সঙ্গীরা বিনা ব্যস্ততায় পলিভরা নরম তলদেশে লম্বা লম্বা লগি গেঁথে নৌকো ঠেলছে। আমাদের তাড়া নেই। তাড়া কেবল নদীর। মাঝে মাঝেই চড়ায় ঠেকাচ্ছে আমাদের।

সবই আমাদের ভালো লাগছে: জলের বিশাল বিস্তার, শান্ত মহিমায় তা স্থিসিত, হঠাৎ জলে সবুজ-খোঁচা হোগলার ওপর ভর দিয়ে কাছিয়ে আসা তীর, হাঁসের ঝাঁকের শাদা চাদর — এতই তা বিস্মৃত যে হঠাৎ ধরা যায় না ব্যাপারটা কী; ভালো লাগছে আমাদের নদী পথের বন্ধুদের—তুর্কমেন মাঝি-মাল্লা, স্বাধীন, সহজ, রোদে পুড়ে কালো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগছে যে আমাদের নিজস্ব নৌকো আছে। সে নৌকোর আছে একটা লক্ষ্য এবং কাজ।

নিজেদের আমরা ভাবতে পারতাম সেইসব সওদাগর বলে, যারা বলমলে তেরমেজ থেকে সওদা নিয়ে নৌকো করে যেত অদূরের বোখারা কিংবা খিবার সমৃদ্ধ অঞ্চলে একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত। অবশ্য আমাদের মালগদুলো খুবই সাধারণ। সঙ্গে নিয়েছি অসংখ্য খাবারের টিন, দেশলাইয়ের বাক্স, বস্তা বস্তা চাল, নুন, সাবান, সাবধানে প্যাক করা কাচ-বোঝাই বাক্স—অর্থাৎ বেশিরে, খোজাম্বাস সমবায়ের যা দরকার এবং পথে আমাদের যা লাগবে, সবই।

যোঁথখামার সমবয়ে মালগদুলো পেঁছে দেবার ভার নিয়েছি আমরা, এতে সেখানে থাকার সুযোগ হবে, তাদের প্রধান প্রধান সমস্যা নিয়ে কথা বলা যাবে লোকের সঙ্গে, খবর পেঁছে দেয়া যাবে নদীর তীরে তীরে, শোনানো যাবে কীসব কাণ্ড ঘটছে দুনিয়ায়।

জল আর মরু। জয় হোক আমদু-দরিয়ার, আমাদের দোলা দিচ্ছে সে, ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। আমদু-দরিয়া না থাকলে আমাদের উজিয়ে আসতে হত দেহের শেষ বিন্দু রস নিঙড়ে নেওয়া উত্তাপের ভয়াবহ হলকা দিয়ে, জ্বালা-পোড়া চোখ আর শূন্যকিয়ে-কাঠ গলায় বসে থাকতে হত জলহীন কুয়োর ধারে। এখন কিন্তু আমরা ভেসে যাচ্ছি তালিমারা ধূসর পাল তুলে, তার শীতল ছায়ায় বসে দেখে যাচ্ছি ওই নির্জন তীর, বলাবলি করছি কত কী না ঘটেছে এই নদীর জীবনে, কত জাতি নৌকা ভাসিয়েছে এতে। সে নৌবহর যদি আজ বেঁচে ওঠে, তাহলে নদী ভরে যাবে তরণীর ভিড়ে। অবাক হয়ে তা থেকে পরস্পর চেয়ে দেখবে চীনা আর ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক আর তাজিক, মোঙ্গল আর শক, পারসিক আর আরব, উজবেক আর মস্কা, রোম, মাদ্রিদ থেকে আগত লোকেরা।

রুশ পতাকা তোলা প্রথম স্টিমারগুলোর দিকে তৈমুর চাইত ক্রোধাক্রান্ত আতঙ্ক আর মোটর-বোটের শব্দে দিশেহারা হয়ে পালাত দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের নাবিকেরা।

কিন্তু নদী এখন ফাঁকা। আর, যেন-বা ঢেউয়ের আঙ্গাধীন এই ছোটো নৌকাটায় ভেসে যেতে যেতে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে টের পাওয়া যাচ্ছে কী আদিম, অদম্য, নিজের একগুঁয়েমিতে কী দুর্বোধ্য এক শক্তি, এই জলপদ্মজের কী অফুরন্ত একটা তেজ অবিরাম ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমে, ধাবিত হচ্ছে যে পথ বেয়ে, আরাল ও আরব সাগরের মাঝখানে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এই মহাজলরাশি থেকে ওঠা চিরন্তন কল্লোলের তালে তালে ভেঙে যাচ্ছে মরুর নিষ্প্রাণ নীরবতা। আর যত প্রাচীন সভ্যতা লোপ পেয়েছে এই খামখেয়ালী নদীর তীর থেকে, তার কথা ভাবলে মনে হতে শুরু করবে যেন চিরন্তন কেবল ওই উটগুলো, হাজার হাজার বছর আগের মতোই যা বালির ঢিপি আর ঢালু ভেঙে এগুচ্ছে, চিরন্তন কেবল এই নৌকার অপ্রশস্ত বাঁকা পাল, সুনীল ইঁজিয়ান সাগরের ফাঁকা থেকে, মহান আলেকজান্ডারের যুগ থেকে যা ভেসে চলেছে একই রকম আলস্যে আর সারল্যে।

আশ্চর্য এই নদী ও মরুর যোগাযোগ। সেটা বিশেষ করে টের পাওয়া যায় নৌকো থেকে, কনুইয়ে ভর দিয়ে যখন ভাবা যায় যে এখানে মরুভূমি গ্রামকে ঠেসে ধরছে তীরের কাছে আর তীরকে ভাঙছে নদী, সশব্দে তা থেকে খসে পড়ছে বিরাট বিরাট চাঙ, মানুষকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে দুই ফ্রণ্টে। আর মানুষ যদি রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যায়, তাহলে বালি এগিয়ে আসবে এই ঘোলা ভারি জল পর্যন্ত, ঝাঁপিয়ে পড়বে এক বালুময় ধূমায়িত স্রোতের মতো।

দিন ফুরিয়ে আসছে। তীরের দিকে নৌকো ফেরালাম। প্রথমে একটা বালি-ভরা, হলদেটে ফালির মতো এগিয়ে এল তীরটা, তারপর দেখা গেল এখানে-ওখানে হোগলার ঝোপ, অবশেষে উঁচু এক পাড়ে ঠেকল নৌকোর নাক, কাঁছ দিয়ে তা বেঁধে রাখল তুর্কমেনরা। দেখলাম জায়গাটা স্তপের মতো, ঘাস আছে, সরগাছও

গজিয়েছে, বিছিয়ে আছে সেলিনের চাপড়া, কাঁটাগাছ। এ মাটি আমরা চিনি না, রক্ষ তা, কিন্তু দূরের দিগন্তে দেখা যাচ্ছে গাছ। গ্রাম আছে সেখানে, আছে সমবায়, যার জন্যে মালপত্র নিয়ে যাচ্ছি আমরা।

৩

নৌকো টেনে আনা হল তীরে, ছোটো একটা ধাপ ভেঙে তা নেমে গেছে জলে। এই ধাপটার পেছনে উঁচু হয়ে উঠেছে তীর। কাদা-বালি মেশানো ঢালুটা বেয়ে আমরা উঠলাম সমভূমিতে। আমাদের মাঝি-মাল্লারা তীরে মাছুল পুঁতে কাছি দিয়ে নৌকো বেঁধে রাখল। নৌকোটা রইল অগভীর জলে।

পাল সমেত বাড়তি মাছুলটা তুর্কমেনরা সঙ্গে নিয়ে চলল। ওটা দিয়ে চাঁদোয়ার মতো কিছু একটা করা যাবে রাত কাটানোর জন্যে। একজন মাল্লা আমাদের অগ্রদূত হয়ে রওনা দিলে গাঁয়ের দিকে। খোঁচা খোঁচা ফ্যাকাশে কান্দিমের নিচু নিচু ঝোপের মাঝখান দিয়ে হাঁটা পথটা চট করে ঠাহর হয় না। সেটা ধরে সে এগুতে শুরু করতই দেখা গেল তার পায়ের কাছে ধুলোর কুণ্ডলী উঠছে।

একটা ছাউনির মতো বানালাম আমরা, সেটা এতই আদিম ধাঁচের যে তার তুলনায় অ্যাব্রাহামের সময়কার ছাউনি হবে একটা বিস্ময়কর স্থাপত্য।

বালির ওপর বিছানো হল সতরঞ্চি, কম্বল, ছাউনির সামনে জ্বালা হল বড়ো একটা ধূনি। এমন শান্ত, মনোরম সন্ধ্যা যে ইচ্ছে হয় অনেকক্ষণ বসে থাকি আগুনের কাছে। অষ্টাবহ্ন ধূসর সাকসাইল কাঠগুলোকে সানন্দে গ্রাস করে সে আগুন লকলকিয়ে উঠল ওপরে, ইচ্ছে হয় দেখি সিঁদুরে-বাদামী ঝিল্লিতে ঢাকা সন্ধ্যার নদী, গৈরিক আবছায়ায় ডোবা সুদূর, গাঁয়ের লোক আসার অপেক্ষায় নৌকো থেকে মাল খালাসি নিয়ে তুর্কমেনদের ব্যস্ততা, — আর নানা কাণ্ডে ভরপুর একটি লম্বা দিন শেষ হবার সময় যে নিশ্চিন্দি

ও সামান্য ক্লান্তি জাগে, সহযাত্রীদের সেই অনুভূতিটা টের পেতে চাইলাম নিজের মধ্যেও।

ধূনির কাছে বসে আছি আমরা, গড়াচ্ছি, চেয়ে দেখছি চারপাশে। নদীর কাকলী যেন কমে এসেছে, তবে কাঁছিয়ে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর, শোনা যাচ্ছে ঘণ্টা — উট আসছে, আমাদের কাছ থেকে মালপত্র নিতে আসছে ষোঁথখামারীরা।

তুর্কমেনরা নিজেদের মধ্যে কথা কইছে জোরে জোরে, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চায় গাঁয়ের লোকেরা, কেননা বেদম কাজ শূরু হয়ে যাচ্ছে এখুনি; উঁচু উঁচু লোমশ টুপি নড়ছে তাদের, নড়াচড়া করছে তাদের যাযাবরসুলভ শক্ত শক্ত হাত, নির্বাক দৈত্যাকার উটগুলোর পিঠে তারা যত রকমের জিনিস চাপাতে অভ্যস্ত, গম্ভীরভাবে উটগুলোও তাদের ধূসর মাথা নাড়াচ্ছে, বলকে উঠছে টিনের খাবার আর দেশালাই বাক্সের পেটী, চালের বস্তা, এক-একটা চ্যাপটা বাক্সকে যে রকম আলগোছে ও সন্তর্পণে নিয়ে যাচ্ছে যে বোঝা যায় তাতে কাচ আছে।

যে লোকগুলো খাটছে তাদের কাছ থেকে দূরে, একেবারে ঠিক পাড়ের ধারেই, বালির সরু ফালিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাদী উট। তার বেগুনী চোখ হয়ে উঠেছে প্রায় কালো। ভয়ানক গাড় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যা, মৃদু মৃদু দিনের স্লেট রঙা শিলাপটে এখন লাল হয়ে উঠেছে ধূনির অগ্নিকেশর। মাদীটার কাছে চরে বেড়াচ্ছে একটা বাচ্চা, যেন একটা অভূতপূর্ব খেলনা জন্তু। হালকা তার রঙ, লম্বা লম্বা ঠ্যাং, লম্বা, ক্ষীণ ঘাড়ের ওপর আশ্চর্য প্রকাণ্ড মাথা, ছড়কানো পা, কঁজুটা এতই হাস্যকর যে মনে হয় ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে দিয়েছে।

কড়া মেজাজের আনমনা মাকে ঘিরে বাচ্চাটা অল্প অল্প নাচ শূরু করল। প্রথমটা সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা তোলে আর নামায়, তারপর বিদ্ধুটে এক লাফ দেয় ধূনিটার দিকে, তারপর

আগুন দেখে ভয় পেয়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে, প্রকাণ্ড মাথাটা গিয়ে ঠেকে মাটিতে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চার পায়ে দড়াম করে মারে লাফ, বার দুয়েক পাক দিয়ে একজায়গায় থেমে ঘুরতে থাকে, যেন আমাদের ছায়া পড়া মাটিটার কাছে কী খুঁজছে। ফের বার দুয়েক লাফ মারে সে, তারপর ঘুরে গিয়ে এমন চুপিচুপি হাঁটে যেন পা টিপে টিপে যাচ্ছে। এতই বাচ্চাটা সুন্দর, এমন অপরূপ তার চলন যে মরুভূমির ওপর হঠাৎ উদ্ভিত হয়ে আজকের সোনা-সোনা নরম চাঁদটা নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। বাচ্চাটা যেন তার কুহকশক্তি টের পেয়ে তার মায়ের চারপাশে আশ্রয় করে পাক দিতে লাগল যেন নভশচরী ঘাঘাবরীর মোহ থেকে তাকে রক্ষা করতে চাইছে। চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘে। অন্ধকার হয়ে উঠল চারিদিক। ফুলের মতো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল আগুনের শিখা। তার সরস পাপড়ি ঘিরে ঝাঁক বেঁধেছে সোনালী মৌমাছি। অন্ধকারে ভেসে আসছে উটের ফোঁসফোঁস আর তুর্কমেনদের অস্পষ্ট হাঁকডাক। শেষ বাত্ম আর গাঁইটগুলো চাপাচ্ছে তারা।

উটের বাচ্চাটা এখন নাচছে প্রায় ঘুমের মধ্যে, আর নিজের মধ্যে ডুবে কাঁটাগাছ চিবাচ্ছে উট-মা, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

এমন উষ্ণ, এমন চুপচাপ যে ঘুমতে ইচ্ছে হয় না, কথা কইতে মন সরে না। একের পর এক চলে গেল উটেরা, মিলিয়ে গেল কালো হয়ে ওঠা কান্দিম ঝোপগুলোর মধ্যে; সব শেষে গেল মাদী উটটা আর প্রায় তার গায়ে গায়ে লেগে বাচ্চাটা। তার লম্বা, সরু সরু অনিশ্চিত ঠ্যাংগুলো প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই ছতরে যাচ্ছে, আর ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠছে সে।

ঘোর স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যায় ঝপাং করে পাড়ের চাঙ ভেঙে পড়ছে জলে। তারপর স্তব্ধতা হয়ে ওঠে আরো জমাট।

চাঁদের সোনালী আভাষ ঈষৎ রাঙা-রাঙা সবুজ-বেগুনী আকাশটা

এমন মেদুর আর লাবণ্যময় যে আপনা থেকেই পল্লবঘন তুর্কমেনী বাগিচার কথা মনে পড়ে, যেখানে বাতাস ভরে ওঠে ফুটন্ত নৈশ ফুলের যত সুরভিতে, মৃদু কণ্ঠে সুর তোলে ছোটো নালার অদৃশ্য জলস্রোত।

আশেপাশে আমাদের বাগিচা নেই, রুদ্ধ পৃথিবী কেমন সব অজানা অস্পষ্ট, ধূনির ধোঁয়ার মতো ঝাঁঝালো, ঘোলাটে গন্ধে ভরা, জ্বলে জ্বলে নিবে গেল আমাদের আগুন, শাদা ছাইয়ের স্তর পড়েছে তাতে, মৃদু কটকট করে উঠছে ফেটে যাওয়া অঙ্গার — এবার ঘুমতে হয়।

আমাদের ছাউনিটায় আমরা যার যেমন ইচ্ছে জায়গা করে নিলাম। ঘুম আসে-আসে। কোথায় যেন সরু, কাটা-কাটা গলায় শেয়াল ডাকছে — যেন শিশুর কান্না... শূন্য নেবা ধূনিটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা তুর্কমেন তরুণ, কালো থামের মতো দেখাচ্ছে অন্ধকারে। সত্যি করেই সে নিশ্চল। বোঝা কঠিন, ভাবনায় সে তন্ময়, নাকি পাহারা দিচ্ছে আমাদের। জেগে উঠলাম কী একটা প্রচণ্ড খরখর শব্দে, গর্জন শূন্য হল, যেন একটা শূন্য জলপ্রপাত এসে ভেঙে পড়ছে চারিদিক থেকে। লাফিয়ে উঠলাম আমি, আর সামনে থেকে ছুটে আসা ফুলকি-ধারার অদ্ভুত আলোয় দেখলাম যে, আমাদের শামিয়ানা খাটানো ছিল যে মাছুলে সেটা পড়ে গেছে, পালটাও পড়ে গিয়ে চাপা দিয়েছে আমাদের সঙ্গীদের। বুড়ির মধ্যে চিঙড়ির মতো তারা ছটফট করছে তার তলে। ওদের ডাক দেবার জন্যে হাঁ করতেই ভেজা বালিতে মুখ ভরে গেল। মুখে, কানে, মাথায় — সর্বত্রই বালির ঝাপটা। কী যেন শনশনিতে, গাঙিয়ে, গমগম করে উঠছে নারকীয় অন্ধকারে, তা ছিন্ন হচ্ছে কেবল দূরের বিজলী আর কাছের লম্বা লম্বা ফুলকির ধারায়।

নিচু হয়ে পালের তল থেকে সঙ্গীদের উদ্ধার করতে করতে একজন তুর্কমেন চেঁচিয়ে উঠল, ‘আফগানী!’ চিৎকার তার

ডুবে গেল যতদূর দেখা যায় সর্বত্র জ্বড়ে উন্মত্ত ঝড়ের
হৃৎকারে।

আমাদের বহুক্ষণ নিবে যাওয়া ধূনিটা ছোটো একটা
অগ্নেয়গিরির মতো উদ্গিরণ করতে লাগল ফুলকি। নীল হয়ে
আসা ভেজা অঙ্গারগুলো থেকে আগুন জ্বলে উঠল ঝড়ে, সারা
মাঠে ছুটে বেড়াতে লাগল সে আগুন, যেন ফেটে যাচ্ছে চতুর্দিকে
ছুটন্ত ফুলকির ফোয়ারায়।

এই আফগানী, দক্ষিণ থেকে আসা এই তপ্ত ভেজা মরুঝড়
সর্বশেষে, নির্মম। সবাই আমরা উঠে কুঁজো হয়ে বালুর ঝাপটা
থেকে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতেই টের পেলাম একধূনি ছুটতে হয়
নৌকাটার জন্যে। ওটা যদি ভেসে গিয়ে থাকে, তাহলে মহাবিপদ,
সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে, কী করব কে জানে। মাস্তুলে সামান্য
চোট লাগা দু'জনকে ওখানে ফেলে রেখেই আমরা ঝড়ের তোড়ে
প্রায় ধরাশায়ী হতে হতে ছুটলাম তীরের দিকে। নদী আর নেই।
সামনে কেবল উন্মত্ত, ফুঁসন্ত, আকাশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এক
জলরাশি। বালির স্তূপে ঢেকে গেছে মাস্তুলটা। তাহলেও ধরে
রেখেছে নৌকার কালো সিলিন্ডারটটাকে, বালিতে ভরে ওঠা, হাওয়ার
ফেঁপে ওঠা জলের শ্বেত তান্ডবে সে নৌকো লাফাচ্ছে। আরো
কাছে টেনে এনে নৌকাটা কষে বাঁধা হল। আমাদের পায়ের কাছে
কীসব ফড়ফড় করছিল, গোঙাচ্ছিল, বাতাসে উড়ে গিয়ে ফের এসে
ধাক্কা খাচ্ছিল মাস্তুলে। ওগুলো হল আমাদের মুরগী, মাস্তুলের
সঙ্গে বাঁধা, ঝালাপালা, পাগলা হয়ে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার ঝাপটায়।

ঠিক করলাম অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটা জায়গায় যাওয়া যাক,
আমাদের গাঁইট আর বাক্সগুলো যেখানে আছে, মালের আড়াল
নেওয়া যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে আমরা ফের এলাম আমাদের উন্মত্ত
ডেরায়, হঠাৎ একটু কমে গেল ঝড়, মাথায় ভেঙে পড়ল বালি-মেশা,
অবাধ উদ্দাম দরদর ধারায় ঠান্ডা বৃষ্টি, আর তাকে কেটে কেটে

সোজাসুজি নদী, স্তেপ, তীরে এসে বিঁধছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজাভ বিদ্যুৎ। তার বেগুনি-সবুজ ঝলকে এলাকাটা সর্বত্র আলোকিত। চাঁদের চিহ্ন নেই ঘোলাটে, ভারাক্রান্ত, নিচুতে নেমে আসা আকাশটায়।

আমাদের চারপাশে সবুজ সবুজ ফুলকি ঝরিয়ে শান্ত হয়ে আসা মাটিতে বেঁধা বিশাল বিশাল বৈদ্যুতিক বুমেরাঙের উদ্দাম বজ্রপাতের সমারোহ, সারা তীর মূখরিত করে বিশাল ঝরঝর ধারায় পৃথিবী প্লাবিত করা, নদীর ফেনায় এসে পড়া বৃষ্টির উল্লসিত তান্ডব। ভিজে আমরা জবজবে, হাঁটছিলাম না আমরা, যেন ভেসে যাচ্ছিলাম এক আদিম প্রলয়ের জলে, মাটি পাচ্ছিলাম না পায়ের নিচে। তাহলেও বাক্স-গাইটগুলোকে দেয়ালের মতো করে তার ওপর পাল টাঙালাম, ঢুকে পড়লাম আমাদের এই শেষ আশ্রয়টির ভেতরে, বসে রইলাম বালুময় ঢালু ঘেঁষে। দাঁত ঠকঠক করছিল। চারিপাশে পতপত করছিল ভেজা পোষাক। পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করে রইলাম আমরা, ঠিক করলাম এ দক্ষযজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওইভাবেই থাকি।

অবিরাম ঝঞ্কার দিয়ে চলল বৃষ্টি, পাগলার মতো আমাদের নাকের ডগাতেই ফেনায়িত তরঙ্গ ফুঁসে উঠতে লাগল নদীতে। বিদ্যুতে আলো হয়ে উঠছিল রাত, আর বাক্সগুলোর মাঝখানকার ফাঁকগুলো। তাহলেও জিরিয়ে নিলাম আমরা, এমন কি ঘুমিয়েও নিলাম, কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পর আমাদের ভেতরকার একজন ঠিক করলে বাইরে কী হচ্ছে দেখবে, কেননা ঝড় যেন ধরে এসেছিল। এই বীরবর পালের একটা কোণা তুলতেই সারা রাতের জমা জল এমন শ্লেষাত্মক কলরবে ঝরে পড়ল ঘুমন্তদের ওপর যে সবাই লাফিয়ে উঠল, অভিষেক হল কনকনে ঠাণ্ডা জলে।

সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ফরসা হয়ে আসছিল। বিশ্বের চেহারাটি বেশ বিস্ময়। রাত্রের ঝাঁকুনির পর আমদ-দরিয়া তখনো শান্ত হয়ে উঠতে পারে নি, নোংরা নোংরা ফেনা তোলা বড়ো বড়ো

টেউ ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরে, তীরে এসে পড়ছে তাদের কেশরের জটা। সর্বগ্রহী মৃদু চিকচিক করছে জল। ঝড়ে লুটিয়ে পড়া কান্দিম ঝাড়গুলোর চেহারা বড়ো করুণ; আমাদের ধূনিটার জায়গায় এক রাশ জঞ্জাল; ভেজা ভেজা জিনিসপত্র গড়াচ্ছে সারা তীরটায়।

ভেজা ছেড়ে শূকনো পোষাক পরতে লাগলাম আমরা। পরলাম হাতের কাছে যে যা পেলাম। কম্বল, বিছানার চাদর, রেনকোট, ডাস্টকোট, সতরঞ্চি জড়ানো লোকের এক মিছিল চলল নৈশাশ্রয় থেকে নৌকার দিকে।

‘আলখাল্লা জড়িয়ে’ নামে কোরানের ৭৪তম অধ্যায়ে আছে: ‘হাঁ, চাঁদ, আর বিলীয়মান রাত আর উদীয়মান উষার কসম নিয়ে বলছি যে জাহান্নম হল একটা অতি ভয়াবহ ব্যাপার।’ আমাদের চারপাশে সেই বালুময় জাহান্নম, মরুভূমি — ভয়াবহ সে ব্যাপার।

আলখাল্লা জড়িয়ে আমরা মাল তুলতে লাগলাম নৌকোয়। জল ছেঁচে ফেললাম তা থেকে, শূকতে দিলাম ভেজা জিনিসগুলো, মাস্তুল বসালাম, পাল খাটালাম, নড়ে চড়ে কাজ করে যাতে গরম হয়ে উঠতে পারি। নদী থেকে আসছিল অসহ্য ঠান্ডা। ভোদকা খেলাম, কিন্তু টের পাওয়া গেল না তার স্বাদ। ফের ধূনি জ্বালালাম আমরা, আর গনুগনে আঁচের আভাস দিয়ে যখন তা প্রথম শোঁ-শোঁ করে উঠল, সরে সরে গেল ভেজা, ভারি, নিচু কালো মেঘ, আলো হয়ে উঠল সূর্যোদয়ের বিপুল অরুণিমায়। মেঘ ফুঁড়ে দেখা দিল ঘর্মাক্ত রক্তিম সূর্য।

আমু-দারিয়ার গুরুভার তরঙ্গ-চুড়োয় নাচতে লাগল লাল লাল ছটা, বালিয়াড়িগুলোর ওপর দিয়ে তা ছুটে গেল দূরে, জমে যাওয়া হাত বাড়িয়ে দিলাম আমরা সূর্যের দিকে, যেন প্রাণদাতা সূর্যদেবের জয়ধ্বনি করছে প্রাচীনকালের একদল পথিক। বালির টিপিগুলোর ওপর লাফালাফি করতে লাগলাম আমরা, টের পাচ্ছিলাম শিরায় শিরায় তাপস্রোত।

ফের আমরা পাণ্ডুর-নীল তপ্ত আকাশের তলে মরুর নিস্তর খাড়া পাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে ভেসে চললাম মহানদীতে। পাড়গুলো এত উঁচু যে মাথা তুলেও দেখা কঠিন কী আছে এই পাড়গুলোর ওপরে। সেখান থেকে এতটুকু শব্দ না করে নদীতে এসে পড়ছে চওড়া-চওড়া বালি-প্রপাত। পাড়ের কিনারা থেকে বালি খসে পড়ে নিচের ধাপে, খসিয়ে দেয় নতুন স্তর, তারপর সরতে সরতে বালি-প্রপাত হয়ে পড়ে নদীতে, পড়ে অনেকক্ষণ ধরে, কেবলি নতুন নতুন বালিস্রোত এসে মেশে তার মূল প্রশস্ত ধারাটায়।

হঠাৎ জ্বলজ্বলে আকাশের পটে নিচুতে দেখা গেল একটা জন্তুর মূর্তি। কাঁছিয়ে আসছে তা। এখন বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। এ হল নেকড়ে, মরুভূমির ধেড়ে স্বাপদ। পা ফেলছে সে কণ্ট করে, তপ্ত বালিতে দেবে যাচ্ছে থাবা। দেখা যাচ্ছে তার বুড়ো, রোঁয়া-ওঠাপিঠ, পেটের এলোমেলো লোম। ইঁট-রঙা মস্ত জিবটা বার করে সে চলছে হাঁপাতে হাঁপাতে। নদীর দিকে চাইছে না। তাড়া নেই তার, নদীর দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা চেঁচামোঁচ করলেও সে ফিরে তাকাচ্ছে না। কে-একজন আর থাকতে পারল না, গুলি করলে। গুলি লাগল না, কিন্তু গুলির শব্দে সে থামল না, কেবল মূহূর্তের জন্যে মাথা ফিরিয়ে হতভম্ব দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার চেয়ে কালো কালো ফুটকি দেয়া গাড়-ধূসর পা টেনে টেনে চলতেই থাকল।

নৌকা আমাদের যাচ্ছে শেয়ালের গুহাগুলোর পাশ দিয়ে। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের কাছে ভাঙা ভাঙা কান্না জোড়া মিহি গলার এই ভবঘুরেরা থাকে তাহলে এখানেই। একেবারে জলের কাছেই বালির গায়ে গোল গোল গর্ত। ওগুলো তাদের বিবরে ঢোকার মূখ। বালুময় পাড়ের ছায়ায় ঘুমচ্ছে নৈশ সন্ধ্যা ক্লান্ত শেয়ালগুলো, শূন্যে আছে থাবার ওপর থাবা রেখে। একেবারে জলের কাছেই

পরস্পর ঝগড়া বাধিয়েছে শৈয়াল-গিন্নিরা, একাধিক পরিবারের জন্যে ব্যবহার্য সাধারণ রান্নাঘরে কোনো কোনো কুঁদুলে ঠাকরদুনের কথা মনে পড়ে যায়। ওদের মুখ-খিঁচুনি আর লাফালাফি দেখে, স্বল্পকালের জন্যে এক-একটা হিংস্র সংঘাত দেখে হেসে উঠি আমরা। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না তারা। ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো হাড়গোড় নিয়ে ব্যস্ত, গড়াচ্ছে সেগুলো, খেলছে, ডিগবাজি দিচ্ছে।

আকাশের উঁচু থেকে ভেসে এল একটা সুদূর বিকট চিৎকার। কী ব্যাপার প্রথমটা বোঝা মুশকিল। উলটিয়ে রাখা এক কালো পিরামিডের আকারে সজ্জিত হয়ে আশ্চর্য কাণ্ড করছে এক ঝাঁক দাঁড়কাক। অবিরাম নড়ছে তারা আর প্রতি সেকেন্ডে নিচেকার কাকটা উড়ে গিয়ে পিরামিডের একেবারে ওপর সারিতে ঠাঁই নিচ্ছে। অবাক হয়ে আমরা মরুভূমির এই দৃশ্য দেখছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল কাকগুলো শত্রুর পেছন দিয়েছে। সত্যিকারের এক আকাশ-যুদ্ধ চলছে আমাদের সামনে। প্রকাণ্ড এক বাজপাখিকে তাড়া করেছে ওরা। বৃহৎটা তাদের এমনভাবে গড়া যে কীলকাকারে তারা এসে পড়ছে শত্রুর ওপর, আর শত্রুর সবচেয়ে কাছাকাছি যে কাকটা সে ঠোকর দিচ্ছে তার ওপর। ঠোকর দিতে পারুক অথবা ফসকাক, লড়াই ছেড়ে দিয়ে সে ঝাঁকটার বাইরে গিয়ে, ওপরে উড়ে গিয়ে ফের ঝাঁকে যোগ দেবে এবং অপেক্ষা করবে আবার কখন তার ঠোকরাবার পালা আসবে। বাজপাখিটা ডানা দিয়ে মাথা ঢেকে দূরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে, বোঝাই যায় কাকের ঝাঁকটাকে সে নিজের পেছন পেছন টেনে আনতে চায়, তবে ঠোকর সে এড়াতে পারছে না। কেবল থেকে থেকে সে চোখ থেকে ডানা সরিয়ে কোন দিকে উড়বে ঠিক করছে। কাকের ডাক আর ডানার শব্দে গোটা জায়গাটা মূর্খরিত। মনে হচ্ছে বাজটা কাকের ঝাঁককে টেনে নিয়ে যেতে চায় নদীর ওপারে।

কিন্তু টিপি় ওপাশ থেকে ‘দাঁড়া আসছি!’ গোছের একটা হুস্ব তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে নদীতেই উড়ে এল বাজপাখির মাদীটা। ঝাঁকে হামলা করলে না সে, শুধু সরে গিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ঝাঁকটার খানিকটা ওপরে উঠে যাওয়ার পর সে ফের একটা দমকা ডাক ছেড়ে তিৰ্ষক গতিতে ছোঁ মারল লম্বাটে কালো ত্রিভুজটার শেষ প্রান্তে। দু’ভাগ হয়ে গেল ঝাঁকটা। আর ও ছোঁ মারতেই নিচেকার বাজটাও ছাড়া পেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলে এবং সেখান থেকে কাক-রূপী বর্গিদলের দ্বিতীয়ার্ধটাকে বিভক্ত করে দিলে, ওর মধ্যে ফের ঝাঁক বাঁধার সময় পায় নি কাকেরা।

এবার শুরু হল কাকেদের মার খাওয়ার পালা। বাতাস ভরে উঠল রোঁয়ায় আর কালো কালো পালকে। এই কৃষ্ণ-ধূসর মেঘের মধ্যে দুটো পাটকিলে ছোরার মতো ঘা দিয়ে চলেছে বাজদুটো, মারছে কাকদের, ব্যুহ ভেঙে গিয়ে এখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তারা, এমন আতর্নাদ করছে যেন সত্যিই কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে তাদের।

ঝাঁকের জায়গায় এখন রইল কেবল ছোটো ছোটো জোট, চেষ্টা করছে পালিয়ে বাঁচতে। কখনো ওপর থেকে কখনো নিচে থেকে তাদের ওপর ছোঁ মারছে বাজদুটো, আর ওই কালো কুণ্ডলীগল্লো ফের ভেঙে যাচ্ছে, ফের চিৎকার করছে, বাতাস ভরে উঠছে ছোটো ছোটো কালো পালকে, উড়ে এসে তা পড়ছে তপ্ত বালিতে।

নোকো ভেড়ালাম তীরে, উঠলাম খাড়া বালুময় পাড়ে। সামনে আমাদের বাসন্তী মরুভূমি, জীবনে তা এখন ভরপূর, খসখসিয়ে উঠছে ঝোপ-ঝাড়, সবুজ হয়ে উঠেছে ঘাস, ফুটেছে টিউলিপ আর ফরগেট-মি-নট। আমাদের কাছেই লম্বা লম্বা বেগুনী আভার কান নামিয়ে, চোখ বড়ো বড়ো করে পাড়টা দিয়ে তেরচাভাবে ছুটে গেল খরগোস। তার পেছনেই লাফাতে লাফাতে আরেকটা। ছুটছে গিরগিটি, ক্রমাগত একদিক পানে কোথায় যেন যাচ্ছে কাঁছিমগল্লো;

সংখ্যায় তারা অনেক; রহস্যময় নক্সার ছাপ-মারা তাদের কালো কালো খোলায় মরুভূমি ভরা।

এইসব ফুল আর ঘাস জ্বলে পুড়ে যাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। কিন্তু এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি পাড়ের ওপর, সামনে আমাদের মরুভূমির অনির্বচনীয় প্রসারতা আর মাধুর্য, মণ্ডিত যা কবিতায়, যাষাবরদের মন তা এমনভাবে টানে যা কোনো শ্যাম বনভূমি বা ক্ষেত ও কুঞ্জে ছাওয়া উপত্যকার সাধ্য হয় না।

আর নিচে চিঁতিয়ে আছে আম-দরিয়া, টগ্‌বগ্‌ করছে তার বাদামী ঢেউ, যেন জীবন্ত, রোদ্‌দুরের তীর বিঁধছে তার বুকো। আমার বন্ধুরা আর পারে না, ঢালু থেকে ছুটে আসে নদীতে, বালির রাজ্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাবমান জলের রাজ্যে, ডুব দেয়, ফের ঝাঁপায় হলদেটে স্রোতে, মাছের মতো প্রাণ ভরে উপভোগ করে জলের শীতলতা আর মাথার ওপরকার মধ্য দিনের তাপ...

৫

রাতে আমরা সাধারণত নৌকো ভিড়িয়ে রাত কাটাতাম তীরে। আর যখন দেখা দিল চাঁদিনী রাত, তখন আমাদের নৌকায় বসে গেল রীতিমতো বিতর্ক সভা। একদল অনিবার্যই চাইত শক্ত মাটির ওপর ঘুমবে, অন্যদলের পছন্দ নৌকো। তর্ক চলল অনেকক্ষণ। ভেসেই চলল নৌকো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে আমাদের তুর্কমেন বন্ধুরা কখন এই লম্বা বিতর্কটা থামবে, দাঁড় বাওয়া আর লগি ঠেলার বিরাম নেই তাদের, আর আমাদের দারগা-ক্যাপটেন আমাদের উদ্দাম আলোচনায় এতটুকু বাধা না দিয়ে নীরবে ঘুরিয়ে যেতে থাকল তার ভারি হাল।

শেষ পর্বস্ত যারা নদীতে ঘুমতে চেয়েছিল তাদেরই জয় হল। নিজেদের স্বপক্ষে তারা সবচেয়ে ওজনদার যুক্তিটা হাজির করলে:

জলের ওপর দিবি্য নির্বিঘ্ন ঘুম হবে তাই নয়, সারা রাত ভেসেও যাওয়া যাবে। এক রাতের মধ্যে কত কিলোমিটার পাড়ি দেব এবং চারজোঁ-এর পথটা কমবে কতটা!

মোট কথা নৌকো না ভিড়িয়ে সারা রাত চালাবারই রায় হল। দারগা-ক্যাপটেন আমাদের সিদ্ধান্ত জেনে তার মাঝি-মাল্লাদের কী যেন বললে এবং অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটল। তুর্কমেনরা তাদের দাঁড়-লগি তুলে গুঁছিয়ে রাখল, তারপর কুকুর-কুন্ডলী হয়ে পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল, সারাটা দিন দাঁড়-লগি ঠেলা লোকেরা যেভাবে ঘুমতে পারে। আমাদের দারগা-ক্যাপটেনও অনুসরণ করলে তাদের দৃষ্টান্ত, শুধু জায়গাটা বাছলে আমাদের তালি-মারা, ন্যাতা-ন্যাতা পাল খাটাবার মাশুলটার কাছে এবং পূরনো মেঘচর্মের ওভারকোটটা ভালো করে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমরা, বদ্বতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। নৌকোর সঙ্গে হালটা শক্ত করে বাঁধা, কেউ তা চালাচ্ছে না, কালো গলুইয়ে জল কেটে মৃদু কল্লোল তুলে নৌকো ভেসে চলল স্রোতে।

চাঁদ উঠে এল তার মেঘের টিলায়, অমনি চতুর্দিকটা জ্বলে উঠল সবুজ আলোয়। মনে হল যেন পাণ্ডু-মরকত দাহ দিয়ে নদীর জলকে প্রচণ্ড আহিত করছে জ্যোৎস্না, নীলাভ ফুলকির ছটা তুলে সে জ্যোৎস্না বৈদ্যুর্ঘর্ষণের দীপ্তধারায় এমনভাবে ঝরে পড়িছিল যে জলের দিকে চাইলে চোখ টাটিয়ে উঠছিল, আরো কষ্ট হচ্ছিল আতপ্ত বিশাল চাঁদের দিকে চাইতে, আমাদের নৌকাটাকে তা যেন টেনে ধরে রেখেছে।

গলন্ত মরকতের আগুন জ্বলা গাড় স্রোতে খরবেগে ভেসে চলল নৌকো। যাচ্ছিল তা নদীর মাঝখান দিয়ে, দুই তীর রামধনু রঙা কুহেলীতে ঢাকা। চতুর্দিকে অসাধারণ একটা স্তব্ধতা। কোথেকে

যেন ভেসে আসছিল একটা গাঢ় মিঠে-মিঠে গন্ধ, যেন কাছেই জিঁজ্ঞাসা ফুল ফুটেছে কোথাও।

তর্কাতর্কিটার পর এই নিশ্চিন্ত রাতের স্তব্ধতাটা ভাঙতে চাইছিল না কেউ। সবাই নৌকোটার ছাড়িয়ে য়তসই জায়গা করে নিয়েছিল। কেউ কেউ আমাদের মাঝি-মাল্লাদের পদাংক অনুসরণ করলে।

ঘুম এল না আমার। কনুইয়ে ভর দিয়ে ডেকের ওপর বসে রইলাম, দেখতে লাগলাম কী ভাবে নিচে ঝলকে উঠছে সবুজ আগুন, ফুটন্ত জিঁজ্ঞাসা ফুলের শ্বাসরোধী নিঃশ্বাসে কী ভাবে মাতাল হয়ে উঠছে আমার মস্তিষ্ক, তার দ্রিস্যা চলছে দমকে দমকে, ইচ্ছে হয় প্রবেশ করি এ রাতের কোণে কোণে, তার প্রতিটি সঞ্জলনে, সাধ হয় দেখব প্রতিটি ধ্বনির জন্মগ্রহণ, লক্ষ করব আলোর সবকিছু বদল, গালিচার মতো ঘন, তুলতুলে স্তব্ধতায় সমস্ত রঙের উত্তরণ।

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের নৌকোটা, হঠাৎ যেন কেউ হাল ঘুরিয়ে তার গতি বদলে দিলে, চলতে লাগল তা সটান ডান দিকে। যাচ্ছিল বেশ স্থিরভাবে, শব্দ না করে। নদীকে আড়াআড়ি কেটে রামধনু রঙা মিহি কুয়াশার ভেতর দিয়ে তা চলল সোজা ডাঙার দিকে, কালো ফালিটা দেখা গেল ও বেড়ে উঠতে শুরুর করল।

সামনে তার জেগে উঠল ‘তুগাই’ বনের বাধা। একাকার কালো উঁচু উঁচু হোগলার ওপরে ঝলমলে শাদা শাদা ফুলকি ছড়ানো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তুগাই পপলার আর অ্যাশগাছের চুড়ো, দর্ভেদ্য ঝোপগুলোয় জড়িয়ে যাওয়া অন্ধকার ভেদ করে কিছু চোখে পড়ছিল না। তীরের কাছে জলটা কালো, হোগলার ছায়া পড়ল আমাদের নৌকায়, সোজা সেটা তীরের দিকেই চলেছে। মনে হল সেটা তুগাই বনের মাঝখানে গিয়ে থামবে এবং সেখানেই

দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ঘটানু করে গলদুইটা গিয়ে ধাক্কা খেল উঁচু পাড়ে, তারপর পেছিয়ে এসে নৌকোটা হঠাৎ গতি বদলে চলতে লাগল নদীর মাঝখানটা লক্ষ্য করে। কিন্তু মাঝখানে গিয়ে সামনের দিকে না এগিয়ে, আগে যেমন নদীকে আড়াআড়ি কেটে ডান দিকে গিয়েছিল এবার ঠিক তেমনি সর্দৃষ্টিভাবে চলতে লাগল বাঁ তীরের দিকে।

তাকে চালাচ্ছিল স্রোত, দারগা-ক্যাপটেনের দায়িত্বটা সেই নিয়েছে। এই ভেসে যাওয়ার মধ্যে বন্য মৃদুস্তর আদিম দিনের কী একটা যেন ছিল। জীবন্ত একটা প্রাণীর মতো আমাদের নৌকোটা এগুতে লাগল তুগাই ঝোপের দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে ঢুকল হোগলা বনের মধ্যে, যেন সেও ঐসব জীবন্ত প্রাণীগুলোরই একজন, যাদের ঘুম নেই, সে রাতে যারা খচমচ করছিল হোগলা ঝোপের মধ্যে, ঝাউ আর চি গাছের কালো ছায়ায় যাদের হালকা নিঃশ্বাস আমাদের কানে আসছিল।

কোথায় যেন ঘুমের মধ্যে ডানা ঝাপটাচ্ছিল পাখি; কখনো কখনো মৃদু শিস ভেসে আসছিল নদীর ওপর দিয়ে; কখনো কখনো শুনছিলাম হোগলা বন ভেঙে যাওয়া কোনো বলিষ্ঠ জানোয়ারের ভারী পদশব্দ।

এবং আগের মতোই বাঁ তীরে ধাক্কা খেয়ে আমাদের নৌকোটা যাত্রা শুরু করলে ডান দিকে। স্রোত তাকে পেছনেও ঠেললে না, সামনের দিকেও যেতে দিলে না।

চোখ বড়ো বড়ো করে নতুন আরেকটা বনের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, কীসব নড়াচড়া চলছিল সেখানে, শোনা যাচ্ছিল খসখস ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ। মৃদু সড়সড়ানি তুলে আমাদের নৌকোর গলদুই হোগলা সারিয়ে দিয়ে তীরে ঠেকল জল খেতে আসা বন-শুরোরদের একটা বড়ো পালের মাঝখানে। ঝাপসা জ্যেৎস্নায়, ঝোপগুলোর ডোরাকাটা আধো-আঁধিয়ারে দেখা যাচ্ছিল ভেজা

খরখরে পিঠ, শোনা যাচ্ছিল ঘেঁষাঘেঁষি, অজস্র জন্তুর চাপা ফোঁসফোঁস, ঘোঁৎঘোঁৎ, নরম পাঁকে দেবে যাওয়া ভারী ভারী পায়ের প্যাচ-প্যাচ শব্দ, প্রকাণ্ড শাদা ফুলকির মতো ঝলক দিচ্ছিল দাঁত।

বন-শুয়োরগুলোর মাঝখানে আমাদের নৌকাটা এসে পড়লেও ওদের কোনো ভাবান্তর হল না। ঘেঁষাঘেঁষি করে তৃষিতের মতো জল খেয়েই চলল ওরা। হোগলাগুলোর মাঝখানে এক পেট জলে দাঁড়িয়ে তারা মনের সুখে পিপাসা মেটাতে লাগল। আমাদের নৌকাটা ওদের কাছে মনে হল কোনো নিরীহ, অচেনা জীব, তার গন্ধে ওরা উত্থিত বোধ করছিল না। ভেজা কাঠের গন্ধ তার, আর ওদের চারপাশটাও ওই একইরকম গন্ধে ভরপুর।

হাত বাড়িয়ে লাঠি দিয়ে আমি সবচেয়ে কাছের জন্তুটাকে ছুঁতে পারতাম, মাথা উঁচু করে ওটা আমাদের নৌকোর গন্ধ শুঁকছিল।

পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফের পিছিয়ে এল নৌকা, ঝোপ-ঝাড়গুলো থেকে সরে যেতে লাগল তা, অচিরেই অন্ধকার তুগাই ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল বরাহদল, যেন সেই সবুজ রাতের নানা সুখস্বপ্নের মতো ওরাও একটা স্বপ্ন।

এইভাবেই জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলিতে মহানদীর প্রবল মর্জিতে আমরা ভেসে বেড়লাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সে নদীও যেন তন্দ্রাতুর, যেন একটা মজার খেলনা পেয়ে আধো-ঘুমন্ত হাতে সে থেকে থেকে ঠেলা দিচ্ছে আমাদের নৌকাটায়।

কিন্তু হঠাৎ আমাদের নৌকাটা মাঝখানে এসে আগের মতো আর আড়াআড়ি পাড়ি না দিয়ে ছুটতে লাগল সোজা, আর সেই মুহূর্তেই আচম্ভিত একটা গুরুগুরু গর্জনে কেঁপে উঠল সবকিছু, ক্রমশ চতুর্দিকই ভরে উঠল সেই শব্দে, মনে হল বৃষ্টি কোনো অগ্নিগিরির জ্বালামুখের দিকে কাছিয়ে আসছি। এ যেন আরব্যোপন্যাসের কাহিনী, মৃদুসারির গিয়ে পড়েছে জিনের ডেরায়। শব্দটা ক্রমেই এমন মাত্রায় বেড়ে উঠল যে চিৎকার করে

ছাড়া কথা বলা যাচ্ছিল না। তাতে জেগে উঠল সবাই, এমন কি আমাদের নিভাঁক মাঝি-মাল্লারাও। নদীর দিকে চেয়ে, আওয়াজটা খানিকটা কান পেতে শুনে তারা দিবি পাশ ফিরে শুল। আমরা কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না।

নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম এই বুঝি নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মতো কিছু একটা দেখা দেবে, আর ভয়াবহ খাদের অতল গহবরে গিয়ে পড়ব আমরা।

এবার সবকিছুই গর্জন করতে লাগল আমাদের চারপাশে। গর্জন করছে বাতাস, তালা ধরিয়ে দিচ্ছে কানে; গর্জন করছে নদীতীর, তার সুদূর কমলা রঙের কুয়াসা থেকে সে গর্জন পাঠাচ্ছে এখানে: মনে হল যেন গর্জনটা আসছে একেবারে নদীর তল থেকে।

আমাদের নৌকো আর সোজা যাচ্ছিল না। একপাশে সরে গেল সেটা, নাচতে লাগল এক অদৃশ্য ঘূর্ণিপাকে; তার পিছন-গলুই ঘুরে গেল সামনের দিকে, এলোপাথাড়ি ঘুরতে লাগল; হঠাৎ যেন এক জলবাসী ঘোড়ার মতো তা খাড়া হয়ে উঠল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে, ফের নেমে এল। তার প্রতিটি ঘুরনে কী যেন ভাঙচুর ঘটছিল জলের গভীরে, ভাঙা ভাঙা ভয়াবহ যে গর্জনটা এসে পেঁছাচ্ছিল আমাদের কাছে, যেন সেই গর্জন তুলে বিরাট বিরাট বাহিনী আসছে আক্রমণে।

আমরা ছিলাম নদীর সবচেয়ে তুক-করা জায়গাটায়। ওপরে ফুটফুট করছে নিশীথিনীর মধুর লাবণ্য, সবুজ আর নীল কুয়াশায় পাক খাওয়া ঈষৎ লালচে মেঘ; তেমনি শান্তভাবে জ্বলজ্বল করছে চাঁদ, অজানা সৈকত থেকে ভেসে আসা তেমনি চনমনে আর বিধুর কীসব গন্ধ।

ফেটে ফেটে যাওয়া বুদ্ধদে নদীর ওপরটা সব টগ্‌বগ্‌ করছে, চারিপাশে উঠছে বড়ো বড়ো ঢেউ, কিন্তু শব্দ নেই তাতে, অথচ

বাতাস এমন আওয়াজে আর গর্জনে বিদীর্ণ যে ক্রমশ একটা বিমর্ষতা পেয়ে বসল আমাদের। ঘর্নিপাকে ঘুরপাক খেয়ে চলল আমাদের নৌকো, মনে হল যেন তার আর শেষ নেই। একটু একটু করে আমরা টের পেলাম যে আমাদের জলের তলে সত্যি করেই কী সব টিপি টিপি ভেঙে পড়ছে আর নৌকার এই হাল হচ্ছে নদীগর্ভের ওইসব বালুময় দূর্বিপাক থেকে।

নিঃশ্বাস চেপে আমরা মৃদু বিস্ময়ে বসে বসে দেখতে লাগলাম উন্মত্ত জলের ফুঁসন্ত পাক। কত বার যে আমাদের নৌকো নিজের চারপাশে ঘুরপাক খেল, কত বার দিগ্বিদিকে নিক্ষিপ্ত হল, উঁচু হয়ে উঠল গলুইটা তা গুণে রাখা অসম্ভব। সামনে কোনো চড়া পড়লে নৌকো আমাদের টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

কিন্তু যেমন হঠাৎ করে এই গর্জনমুখরিত জায়গাটায় এসে পৌঁছেছিলাম তেমনি করেই তা শেষ হয়ে গেল, সামনের শান্ত কলস্বনা জলের ওপর দেখা দিল চাঁদের ভাঙা ভাঙা ছায়ার ফালি। পেছনে শান্ত হয়ে এল দানবিক গর্জনটা, শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। ফের আমাদের চারপাশে প্রসারিত মৌন, মনে হল তা এই সবুজ গুমোট রাতটার মতোই, ফের কাঁছিয়ে আসা হোগলাগদুলোর ওপরে বিচিত্র-পল্লব পপলারের সরু চুড়োয় মাথা দোলানো ওই তুগাই বনটার মতোই ভারি আপন আর অপরূপ।

আমাদের নৌকোটর গলুইয়ের দিকে চাইলাম। দোঁখি কালোমতো কী একটা জিনিস সেখানে। ইস্পাতের ঝলক দেওয়া কৃষ্ণ-ধূসর ডানা গুলুটিয়ে স্তূপের একটা প্রকাণ্ড ঈগল বসে বসে ঘুমচ্ছে গলুইয়ের ওপর, বিশাল তার কাঁধ। উড়তে উড়তে হয়রান হয়ে পড়ে সে, ঠিক করে জিঁরিয়ে নেবে। নদীকে আর আমাদের শান্ত, কালচে নৌকোটাকে তার অবিশ্বাস হয় নি। এও আমাদের সঙ্গে একই পথের নৈশ সহযাত্রী।

আর ভেসে চললাম আমরা নদীর জীবন্ত, হৃদয় শক্তির টানে,
চললাম নীলাভ বাসন্তী ঝিলিমিলিতে, দিবসের স্নেহে, মনে হল
সেখানেও নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে ঠিক এখানকার, এই সবুজ মন্দির
জগতটার মতোই অবাধে, যেখানে আমরা অবিরাম পাচ্ছি তার
বর্ণ গন্ধ বিভাবের নব নব আশীর্বাদ, শেষ নেই তার রূপকথাসুলভ
ঐশ্বর্যের, শেষ নেই তার বন্ধুবৎসল অপরাধ উপহারের...

ভেসে চললাম আমরা, ভেসেই চললাম, ইচ্ছে হচ্ছিল যে যেমন
পারি গান ধরি গলা ছেড়ে। কিন্তু যত ভালো করে যত গানই আমরা
গাইতাম না কেন, সেরা গান ছিল স্বয়ং আমদ-দরিয়া। আহ, আমদ-
দরিয়া, আমদ-দরিয়া, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের মোহমায়া...

ফের যাওয়া যাবে আমদ-দরিয়ার তীরে, স্নেহাম সন্মতো একটা
নৌকো নেব, বসব তাতে ভালো একটা দল পাকিয়ে, তারপর বসন্তের
ভরা নদী বেয়ে চলে যাব সবুজ রাগিতে...

যাব দোস্ত, যাব!

সিমন বলশেভিক



লোকের কাছ থেকে কত ঘটনা, কত বড়ো বড়ো ব্যাপারের কথা শুনছি। তবে ঐ যে, নায়ক কাকে বলে সেটা বুঝি না। তা আমিও কিছুর শোনাই।

জাতে আমি ওসেতিন। দেশের নাম ওসেতিয়া। একদিন পাড়ি দিলে — পাহাড়, দু'দিন পাড়ি দিলে, হপ্তা পাড়ি দিলে, চারিদিকে কেবল পাথরে পাহাড়। তার ওপর বনে পাতা গজাক, বরফ পড়ে থাকুক, তুষারপাত হোক, ছোটো বড়ো কত রকমের নদী পাগলার মতো খলখলিয়ে বয়ে যাক, মানুষের বাক্যটি কখনো শোনা যাবে না। নেমন্তন্ন আছে, চলো পাহাড় ডিঙিয়ে, বাজার করতে হবে, তাও পাহাড় ডিঙিয়ে, সংকার করতে হবে পাহাড় ডিঙিয়ে, নাচের আসর, সেও পাহাড়ের ওপারে। ভারি কষ্টের জীবন ওসেতিয়ায়।

আর চাষীদের জমি ছিল কী, বাপ রে! একটা আলখাল্লা ফেললে, বাস, ক্ষেত আর দেখা যাবে না, সব আলখাল্লার তলে। আর সে ক্ষেতও একেবারে আকাশের কাছে। চারিদিকে কেবল হা-অন্ন। পাথরের ডেরা—ঠাণ্ডা কনকনে। মাঝখানটিতে ধূনি, ওতেই রান্না, গা-গরম করা সব। টেবিল কোথায়, তেপায়া — এশিয়ার লোকেদের কাছে তাই বিলাস, উপায় কী, স্নেফ গোয়াল।

তা আমি পাহাড়ী। বয়স কম, লেখাপড়া জানি না। অনেক ভাবতাম, কী ভাবে বাঁচা উচিত। ইনকিলাব শুরুর হল, গৃহযুদ্ধ শুরুর হল, আমিও বন্দুক আর ঘোড়া নিয়ে চললাম লোকেদের জন্যে লড়তে। সে ভারি কঠিন লড়াই। প্রতিটি পাহাড়ে, স্তেপে আপোসওয়ালা, উগ্রজাতিবাদী, শ্বেতরক্ষীদের ঘাঁটি, ভ্লাদিকাবভকাজ দখল করলে জেনারেল শ্চুকরো। ওসেতিয়া শাসনের জন্যে বসালে

বেতা খাবায়েভকে। ভারি হারামজাদা লোক এই বেতা খাবায়েভ।
গাঁকে গাঁ জ্বালিয়ে দিত, বিচারি চাপা দিয়ে শ্লুরের পোড়া করে
পোড়াত, স্লুল্লুক-সন্ধান নিত, আনন্দে থাকত। আর আমরা তখন
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, ঘুরছি নেকড়ের মতো হন্যে হয়ে,
শাদাদের তটস্থ করে রাখছি। শীত এল, প্রচণ্ড বরফ পড়ল, পথ
ঢেকে গেল, বন ঢেকে গেল, ঘরবাড়ি ঢেকে গেল, ভারি বিছাছিরি
ব্যাপার, যোগাযোগ করা যায় না, ঘোরাও বিপদের কথা। একটা
কুটো পড়লেই বাস, বরফের ধস নামে, এগুনো যায় না, ঘোড়া থেমে
যায়, অথচ লড়তে তো হবে। বেতা খাবায়েভ ওদিকে হাত তালি
দেয়, কনিয়াক খায়, আনন্দ করে: পাহাড়েই টেংসে যাবে
বলশেভিকরা, বসন্ত পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে না।

এক সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি পারঘাটের কাছে। খবর
আসবে। ওদিকে সঙ্গে নেমেছে, পাহাড় থেকে ঠান্ডা ব্যাপট দিলে,
কুয়াসা নামবেই নামবে, পাক খাবে তুষারকণা। নদী কিন্তু কিছুতেই
জমে নি; টগ্‌বগ্‌ করছে যেন জল ফুটছে কেটলিতে। ভুড়ভুড়ি
তুলে জল কেবলি আগুপিছ করছে পাথরগুলোর মধ্যে। কী যে
তার ইচ্ছে কে জানে, খামোকা দাপাদাপি করছে একই জায়গায়।

অপেক্ষা করছি ওপার থেকে লোক আসবে, তাকিয়ে আছি
পাথরগুলোর দিকে। অবাক লাগে কী তাকত এই জলের, উল্টে
ফেলছে বড়ো বড়ো পাথর, ঘা মারছে। ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে কাঠ-
পাথর, ফাটিয়ে দিচ্ছে, ককিয়ে উঠছে খাদ। ভারি মন খারাপ হয়ে
গেল আমার। ভাবলাম, বসন্ত পর্যন্ত টিকব না, বেতা খাবায়েভই
আনন্দ করবে — টেংসে যাব।

দেখি একটা কাঠ ভাসছে, কিছুতেই ডুবতে চায় না, একেবারে
নিজের পথে চলেছে, ছুটে যাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে, এদিক-
ওদিক চেয়ে ডুব দিচ্ছে পাথরগুলোর মধ্যে, ফের ভেসে উঠছে, নদী
তার মাথা ধরে টানছে, পা ধরে টানছে, ডোবাতে আর পারছে না।

বেঁচেই আছে কাঠটা, নিজের পথেই চলেছে। ভাবলাম, ‘হা রে সিমন — নাম আমার সিমন — ওই কাঠটার মতো ভাসতে শেখ, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার মতো কলজে রাখ, কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামাস না। কী তুই বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাল্লুকের মতো থাবা চাটবি, এখন যে লড়াই!’ কথাটা মনে হতেই গরম লাগল। ভাবতে লাগলাম ওপার থেকে কেন এখনো কমরেডরা আসছে না। দেখি, খাদটা এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, ওপারে জলের দিকে নামছে ছ’জন লোক।

নেমে তাকিয়ে দেখছে জল। বুদ্ধলাম, পেরবার পথটা ঠিক জানে না, নয়ত ঘোড়ার ওপর তেমন ভরসা নেই। হাঁপিয়ে গেছে ঘোড়াগুলো, জল তো কনকনে ঠাণ্ডা, জলে নামতে ভয় পাচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম: কে এরা? ভাবলাম: যেমন ক’রে পারে পার হোক। হাঁক দেব না। যদি শত্রু হয়, ডুবে মরুক। যদি বন্ধু হয় হাঁক দিতে হবে, জানানি দিতে হবে।

জলে নামল ঘোড়াগুলো, জলও খেলা শুরুর করলে তাদের নিয়ে। ঠিক পথই ওরা ধরেছিল, তবে সবাই নয়। কয়েকজন বেশ আসছে, দু’জন পিছিয়ে পড়েছে, একজনের অবস্থা কাহিল — ভেসে আসছে সে এদিকে নয়, পাথরগুলোর দিকে। মারা পড়বে ঘোড়াটা, সামলাতে পারবে না। ভাপ উঠছে ঘোড়ার গা থেকে, সওয়াররা কিন্তু কোনোই সঙ্কেত দিচ্ছে না। বন্দুক নিয়ে তাক করলাম প্রথমটার দিকে, মনে হল যেন তার গরম কুতীর ওপর অফিসারের কাঁধপিটি আছে। আর আমার কমরেড বন্দুক চেপে ধরে বললে:

‘সিমন, এটা দেবলা নয়ত, ওই যে পাশেরটা, ঘোড়া যার কাহিল!’

ভালো করে চেয়ে দেখলাম, হ্যাঁ দেবলাই।

বললাম, ‘আমাদেরই লোক তাহলে। হাঁক দে উয়াসিল, বল আমরা।’

‘দেবলা নাকি?’ হাঁক দিল সে।

আমিও হাঁক দিলাম:

‘দেবলা, তুমি নাকি?’

ও কিন্তু ঘোড়াটা আর চালাতে পারছে না, যদিও তীরের কাছেই এসে পড়েছে, স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ঘোড়াটা। হাঁক শব্দে ফিরে তাকিয়ে সেও চিৎকার করলে:

‘সিমন, উয়াসিল, তোমরা নাকি?’

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, ঘোড়ায় চেপে আমরা হাঁক দিলাম:

‘আমরাই, দেবলা! আমরা সিমন আর উয়াসিল!’

পাথর বেয়ে সওয়ারীরা উঠে এল নদী থেকে, দেবলা কিন্তু তার ঘোড়ার সঙ্গে হুঁমড়ি খেয়ে এই পড়ল বলে। শব্দ এক মিনিট বাকি। ঘোড়া সমেত লাফিয়ে নামলাম জলে, আমি আর জোয়ান মতো কে আরেকটা লোক। জোয়ানটা জল থেকে উঠতে না উঠতেই ফের আবার জলে। নদীর গর্জনে কানে একেবারে তালা ধরে যায়, নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। দূই দিক থেকে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলাম আমরা, ও কিন্তু টলছে, এই বুঝি পড়ে। আমাদের ঘোড়া দুটোর মাঝখানে ওকে চেপে ধরে প্রাণপণে টেনে তুললাম তীরে, দেবলা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে কেবল বলে: ‘মা-খাজার, মা-খাজার!’ তার মানে হয় ভগবান, গেলাম, গেলাম।

পাহাড়ের ওপরকার গাঁয়ে গেলাম গরম হয়ে নিতে, বসলাম আগুন ঘিরে। চেয়ে দেখি, কে এই লোকটা আমার সঙ্গে সঙ্গে যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ভয় পায় নি। জোয়ান, দাড়ি নেই, মোচ নেই, ভারি ফুতিবাজ, জ্বলজ্বলে চোখ, হাসে, বলে:

‘চেনো না তো সিমন? আমি ঙসাগলভ, গেওর্গি বলে ডেকো।’

বললাম, ‘তা বেশ, এখন খানা-পিনা করো। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব ঠিক কাজ করেছ। এবার বলো তো, লোকটা তুমি কে?’

বলে, ‘আমি কেরমেনিস্ট, আজাদির জন্যে লড়াই, ইনকিলাবী।’
বলে, ‘জন্ম আমার খৃস্টানস্কয়ে গাঁয়ে।’

এই সময় এল দেবলা, জীবন বাঁচানোর জন্যে অনেক কথা
বললে, বড়ো বড়ো ভালো ভালো সব কথা, হাতে চাপ দিলে।
আমাকে দেখিয়ে গেওর্গিকে বলে:

‘এ হল সিম্ন, দিগরী, আমাদের লোক।’

গেওর্গি বলে, ‘বেশ তো, বলশেভিক ভাই। একটু জিরিয়ে নিয়ে
ফের কাজে নামব।’

সেই দিন থেকে ঔসাগলভকে চেয়ে দেখি। কে এই লোকটা।
আমি জোয়ান, সেও জোয়ান, কেমন একটা আগদুন আছে ওর
ভেতর, আমার নেই। সত্যি কথা, শিক্ষিত লোক, আর আমার তখন
লেখাপড়া বিশেষ নেই। চোখ ওর কেমন খোলাখুলি চেয়ে দেখে,
আর আমি তাকাই বাজ-পাখির মতো চোখ কুঁচকে। তবে মনে হয়
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর কঠিন হয়েছিল আমার চেয়ে বেশি।
পাহাড়ে অভ্যেস তো ছিল না। শহুরে লোক। পাহাড়ের যুগ্ম্য নয়,
তবে কথা বলত একেবারে জ্ঞানীগুণীর মতো, আর ভাবনা
রূরার ক্ষমতা আমার তখন একেবারেই ছিল না। স্ট্রেফ
চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছুঁটাতাম, কোনো দিকে দৃকপাত
করতাম না।

একবার শাদাদের জন্যে গুঁৎ পেতে আছি। এল এক বড়ো,
এদিক-ওদিক চেয়ে সোজা ঔসাগলভের কাছে। ধরতে পেরেছে যে
ওই কর্তা। বলে:

‘লড়াবি, শাদাদের সঙ্গে লড়াবি?’

ঔসাগলভ বলে, ‘হ্যাঁ লড়াব, কিন্তু তুমি কী করতে এসেছ?’

আর বড়ো তো একেবারে থুথুড়ে, শতখানেক বছর বয়স,
কাঁপছে।

‘আমিও লড়ব, বন্দুক দে, গুলি করব।’

ৎসাগলভ বলে, ‘যাও, ঘুমাও গে।’ বলে, ‘শোনো দাদু ঘুমাতে যাও, তুমি আবার কী লড়বে।’

দাদু কিন্তু এসে তার হাত ধরলে, থরথরিয়ে কাঁপছে যেন আগুন।

‘ঘুমতে যাব না, ঘুমতে চাই না। তাকোয়েভও আমায় ঘুমতে পাঠিয়েছিল। তখনো আমি লড়েছি, তাকোয়েভও আমায় হাতিয়ার দেয় নি, তবুও আমি লড়েছি।’

‘লড়লে কী করে?’

‘চুড়োয় উঠে পাথর ছুড়ে মেরেছি ওদের মাথায়। এই করেই লড়েছি।’

ৎসাগলভ তখন দাদুর হাত ধরে বললে:

‘যাও দাদু, ঘুমাও গে। আমরা লড়ে তোমায় বড়ো কালটা বাঁচিয়ে রাখব। শান্তিতে মরবে। মরার আগে এখনো শাদা গমের মণ্ড থাকে অনেক।’

মাথা নাড়লে বড়ো, বলে:

‘বন্দুক দিবি না? মণ্ড চাই না, খেতে চাই না শাদা মণ্ড। পাথর ছুড়ব ওদের দিকে। আমি বলশেভিক, আর আমায় তুই ভাগিয়ে দিচ্ছিস। এর পর তুই আমাদের লোক নোস, আমাদের লোক নোস!’

হেসে উঠল তৎসাগলভ, জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে। আর এই ঘটনাটার কথা যে বলছি তার কারণ লোকে তখন ইচ্ছে করে কত কী রটাত বলশেভিকদের নামে। আরেকবার এক বড়ো এসেছিল আমার কাছে একেবারে থুথুড়ে, লাঠি না ধরে দাঁড়াতে পারে না, বলে:

‘সিমন বলশেভিক এখানে থাকে কোথায়? আমায় নিয়ে চল তার কাছে।’

বললাম, ‘আমিই দাদু সিমন। নাম লেখাবে আমাদের পার্টিতে ?
সঙ্গে সঙ্গেই জোয়ান হয়ে যাবে।’

বুড়ো কিন্তু সরে গেল আমার কাছ থেকে, হাত ঝাঁকালে, লাঠি
দোলালে। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তারপর বলে:

‘টুপি খোল তো, টুপি খোল!’

টুপি খুললাম, বুড়ো আমার মাথায় হাত বুলালে, চুল দেখলে,
তারপর চটে উঠল। বলে:

‘কেন মিছে কথা বলছি। লজ্জা হওয়া উচিত তোর জোয়ান
ছেলে, বুড়োর সঙ্গে ঠাট্টা। তুই আবার কোথাকার বলশেভিক।’

বললাম, ‘সাঁচ্চা বলশেভিক দাদু, পা থেকে মাথা পর্যন্ত
বলশেভিক, ঘোড়া আছে আমার, বলশেভিকী হাতিয়ারও আছে।’

‘কিন্তু শিঙ কই তোর?’ বলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আমায়।

‘শিঙ কিসের দাদু? শিঙ হয় গরুর, ষাঁড়ের, আমরা যে মানুষ।’

‘কিন্তু আমি যে শুনছি সমস্ত বলশেভিকের শিঙ আছে,
মানুষের মতো নয়; আর তুই তো যেন মানুষের মতো, শিঙও
নেই।’

দ্যাখো কেমন ছিল আমাদের বুড়োরা, কিন্তু বুড়োও ছিল
নানানরকমের, জোয়ানরাও নানানরকমের। তবে ঔসাগলভকে দেখে
আমি ভারি অবাক হয়ে যেতাম। নদীর কাছে পাথুরে কুঁড়েয় বসে
আছি, আর নদীর তখন কী দাপট, কথা বলে বোঝানো যাবে না।
কথা বলতে পারছি না, শুনতে পারছি না। নদীর আওয়াজে চাপা
পড়ে যাচ্ছে গলা। ঔসাগলভকে বললাম:

‘মাথাওয়ালা লোক তুমি গেওর্গি, আচ্চা বলো তো, নদী এত
জোর পাচ্ছে কী থেকে? কী শক্তি, গেওর্গি! দ্যাখো, সাঁকো ভেঙে
ফেলছে। সবাইকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, গাড়ি ডুবে যাচ্ছে, ঘোড়া ডুবে
যাচ্ছে, জোব্বা, ছোরা সব ডুবে যাচ্ছে, মেয়েরা ডুবে যাচ্ছে। এমন
কেন বলো তো, খামোঁকা এই শক্তি খরচ হয়ে যাচ্ছে, দিন রাত,

এমন কি বরফও তা ধরে রাখতে পারছে না, নদী ছুটছে বরফ ভেঙেই।’

আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে:

‘নদীর শক্তি, সিম্ন, লাগে মানুষের কাজে।’

‘কী যে বলো তুমি গেওর্গি? নদী লাগে কেবল খারাপ লোকের কাজে। কোনো ডাকাত কি শাদারা লোক খুন করে ফেলে দ্যায় নদীতে, আর ওই যে রুশী কমরেডরা যা বলে, সব চিহ্ন তখন সাত হাত জলের তলে। আর বৃষ্টি পড়ে বা বরফ গলে যখন তার শক্তি বাড়বে, তখন ছুটবে একেবারে পাথর ভেদ করে, ভাসিয়ে দেবে কুঁড়ে, ডুবিয়ে দেবে মানুষ, গরু-বাছুর। ঠিক কথাটি তুমি বললে না গেওর্গি।’

আমার দিকে চেয়ে সে ফের বললে:

‘বাঁধ দিয়ে যদি এই জল ধরে রেখে বিশেষ এক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চালানো যায়, তাহলে গোটা ওসেতিয়া আলো করে দেওয়া যায় বিজলী দিয়ে। ততদিন পর্যন্ত আমি বাঁচব না সিম্ন, দেখে যাব না, তবে আমার কথাটা শুনবে রাখ, মিছে বলছি না। বুনো ঘোড়ার মতো এই নদীটাকে কেমন বশ করা হবে তা তুমি দেখে যাবি। ঘোড়ার মতোই তা কাজ করবে মানুষের।’

চুপ করে গেলাম আমরা, আর আমার ভয় হল। এমন জলের সঙ্গে লড়তে যাবে কে, যখন ঘোড়া মোষও সবচেয়ে অগভীর জায়গাগুলো পার হতে পারে না, আর গভীর জায়গাগুলো তো স্রেফ কবরখানা, উঁকি দিতেও ইচ্ছে করে না।

আরেকবার হাসল গেওর্গি।

‘তুমি নিজেই লড়বি, সিম্ন। তবে ঠিক এইটার সঙ্গেই নয়, অন্য নদীর সঙ্গে খাটতে হবে। তুমিও খাটবি প্রাণপণে।’

জলের দিকে চাইতেই মাথা আমার ঘুরে উঠল। মন থেকেই বললাম:

‘শাদাদের সঙ্গে আমি লড়ে যাব শেষ পর্যন্ত, তবে জলকে ডরাই।’

শুনে সবাই হেসে উঠল, সবার আগে গেওর্গি, বললে:

‘কী হবে জানো না। দুই ওসেতিয়া, এটা আর পর্বতের ওপাশটা এক হয়ে যাবে। শীতকালে খৃস্টিয়ানস্কয়ে থেকে ঔস্খিনভালি বেড়াতে যাবি, সিমন, টানেলের ভেতর দিয়ে সড়ক ধরে।’

বললাম, ‘ওসব রাখো গেওর্গি, আষাঢ়ে গম্প ফাঁদার সময় নেই এখন। বই অবিশ্যি লেখা যায় ঢের, কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই সব বইয়ের কথা বলে শেষ করা যায় না।’

গেওর্গি বললে, ‘দাঁড়া দাঁড়া, রাগ করিস না। জানিস তো, পাহাড়ের ওদিককার ওসেতিনদের কণ্টেস্কেট অন্ত জোটে কেবল মাস পাঁচেকের জন্যে। তারপর বসে বসে চেয়ে থাকে আগুনের দিকে, অথচ সে আগুনে সেকবার কিছু নেই। চারদিকে দুর্ভিক্ষ শীত, হাঁটা পথে নিজেদের ঘাড়ে করে শস্য আনতে হয়। আর কী দাম দিয়ে! পথে মারা পড়ে লোক, মারা পড়ে ঘোড়া। এটা তোমার পুঁথি না সিমন, সত্যি কথা, যেকোনো লোকই বলবে সত্যি। বলশেভিকরা আষাঢ়ে গম্পের ব্যাপারী নয়। ওসেতিয়াকে আমরা দিতে চাই আজাদি আর রুটি, নেহাৎ আজাদি আর রুটির কথা লেখা একটা কাগজ নয়। তুইও সিমন জীবনের পরোয়া না করে কেবল কাগজের জন্যে লড়িছিস না, তাই না?’

আমি চুপ করে রইলাম, ভাবলাম, ‘উঁহু, এমন প্রচণ্ড নদীর সঙ্গে লড়িছ তেমন দিন কখনো আসবে না। কী করে লড়তে হয় তাই জানি না, পারি কেবল গুলি করতে আর জলে গুলি করে লাভ কী!’

আমাদের কাছ থেকে ওসাগলভ চলে গেল অন্য জায়গায়, আমি কিন্তু কেবলি তার কথা ভাবি। খুবই সামান্য লোক আমি, স্নেফ

একটা ঢেলা, আর চারিপাশে সব বড়ো বড়ো পাহাড়, সূর্যই দেখা যায় না, তার ওপর শীত। তবে জানো, সেই যে বলে মন খারাপ করি নি আমি। ঝগলভের কথা ভেবে আনন্দ হত, অত অল্প বয়স, অথচ বুদ্ধি কী। আর দুঃখ হত এই জন্যে যে অমন করে বললে, ‘তুই দেখে যাবি, বেঁচে থাকবি, আমি দেখব না, অতদিন টিকব না।’ কেন একথা বললে ও? কমরেডদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ধরনের আলাপে তাদের অবাক লেগেছিল, আমায় কেউ কিছুর বলতে পারলে না। এইভাবেই দিন যাক্সিছিল আমাদের, দিন রাত লড়ি, নেকড়ের মতো নজর রাখি শাদাদের ওপর। যেখানটা তাদের কমজোরী সঙ্গে সঙ্গেই কামড় বসাই সেখানে, বুরুক যে বসন্ত নাগাদ আমরা টেংসে যাব না, এখনো বেঁচে আছি, দাঁতও আমাদের ঠিক আছে।

একটা চরকে, জোতদারকে ধরেছিলাম আমরা। জিজ্ঞেস করি:

‘তা কেমন আছে বেতা খাবয়েভ? শীত করছে না তো, ঘুম হচ্ছে ভালো, কোনো দুশ্চিন্তা নেই?’

চর বলে:

‘ধন্যবাদ, ভালোই ঘুম হচ্ছে। তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখছে স্বপ্নে। বেশ গরমেই আছে বইকি। শীতে ঠকঠকে করে টেংসে যাবি কেবল তুই-ই।’

আমি বলি, ‘টেংসে যাবি তুই-ই আগে। আমরা দিবি আরামে আছি, বলতে কি বেশ গরমেই।’

বলে, ‘আরামে তেমন নয় মাখাজার। তোর কাছে আমার যা হাল, তোদের অনেকের হাল তার চেয়েও খারাপ।’

বললাম, ‘কার হাল? মরবার আগে বলে শান্তিতে মর।’

বলে, ‘শান্তিতেই মরব, কেননা তোদের ঝগলভ আর আরো কয়েক জনও আমার সঙ্গেই মরবে।’

কথাগুলো শুনেই কী বলব, মনে হল যেন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ধস নেমে গোটা পাহাড় কাঁপছে, ধোঁয়া আর আগুন উঠছে, যেখানে গাছ ছিল — শূন্য, পাথর ছিল — শূন্য।

চরটা বললে যে ঔসাগলভকে ধরিয়ে দিয়েছে প্রতিবিপ্লবী ওসেতিনরা, তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এমন দূরের এক পাহাড়ে যে সেখান থেকে শাদাদের কাছেও পৌঁছনো যাবে না, বলশেভিকরাও বহু দূরে।

ভয়ানক ইচ্ছে হল, তক্ষুনি আমার এক বন্ধুকে গিয়ে বলি, ‘চল যাই, সত্যি হোক, মিথ্যে হোক জেনে আসি।’ সেও বললে, ‘চল যাই।’ গেলাম আমরা এমনি এক দূরের এলাকায়, যেখানে আমি এসেছি বটে তবে এত কম যে কেউ আমায় চিনত না। রাস্তার জন্যে যা দরকার সব নিয়ে রওনা দিলাম। জানো তো, আমাদের ওসেতিয়া দেশটা এতই বড়ো আর পাথুরে যে, সে পাহাড়গুলো দেখলে তুমি কেঁদে ফেলতে, বলতে, কেন এখানে এলাম। আর চোখের জল তোমার চোখের রোঁয়ার ওপরেই জমে যেত, শীত যে। চললাম আমরা ফুর্তি করে, মন ভুলিয়ে রাখার জন্যে, নিজেরা কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাঁপিছি, যেন পরবের সময়কার বেহালার তার, তবে আনন্দের পরব নয়, যেন অন্ত্যেষ্ট যাত্রা।

আর পাহাড় কী — ঘরসংসার, ইনকিলাব সব ভুলিয়ে দেবে — লোহার মতো কালো, লোহার মতো ভারি, ইস্ত্রির মতো পালিশ করা, বরফ দাঁড়াতে পারে না। লোকগুলোও ভারি খারাপ, অন্য জায়গার চেয়ে বেশি খারাপ। বলে:

‘কোথায় যাচ্ছে?’

আমরা বলি:

‘বিয়ের নেমন্ত্নে যাচ্ছি।’

‘সঙ্গে মদ নেই কেন তাহলে?’

‘বিয়ের নেমন্ত্নে মদ আবার সঙ্গে নিয়ে যায় কে?’

‘দেখো বাপু, সে বিয়ের ভোজে আবার হাতিয়ার ধরতে না হয়।’

আমরা চুপ করে শব্দে যাই। কেউ কেউ আবার শব্দধোয়, আমরা কি শিকারী?

বলি, ‘হ্যাঁ, আমরা শিকারী।’

‘তাহলে মনে রেখো বাপু, ওই প্রবাদটি ভুলো না: ভালুক শিকারে যাবে গান গেয়ে, কিন্তু বন-শব্দ্যের শিকারে পদ্রুত ডেকো। পদ্রুতের দরকার নেই তোমাদের?’

চুপচাপ এগিয়ে চললাম আমরা।

চরটা যে জায়গার কথা বলেছিল, এলাম সেখানে। চেনা একজনের বাড়িতে ঠাই নিলাম। সে বললে:

‘কথাটা সত্যি। ঔসাগলভ আর অন্যান্যদের দেখা পাওয়া যেতে পারে, তবে ভেবে দেখতে হবে।’

তাই ভাবতে লাগলাম আমরা। আমার চেনা লোকটা বললে:

‘চলো যাই, সবাই মিলে চড়ুইভাতি করি, শিকারের কথা বলব, কী দুর্দিন পড়েছে সে কথা বলব, বলশেভিকদের নিন্দে করব। সেখানে কুঁড়ের পেছনে আছে পাহাড়ে ওঠার পথ, গুহা আছে সেখানে, বরুজের কাছে এই গুহাতে কয়েদ রেখেছে ওদের... টাকা দিয়ে কি ওদের হাত করা যাবে না।’

টাকা ছিল আমাদের, চললাম। ওই এলাকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ হল — একেবারে হাড় বজ্জাত; এই বেইমানগুলোর ওপর রাগে হাত আমার কাঁপছিল। চোখ টিপলাম কমরেডকে, আরক কিনলাম আমরা, বসলাম আগুনের কাছে, খেলাম খাবারদোজন, পনীরের পুর দেওয়া পিঠে, জিক্সাও খাওয়া হল — ঘিয়ে ছাড়া পনীরের কুচি, দুর্দিন পড়েছে বলে খুব গালিগালাজ করি, আলাপ চালাই শিকার নিয়ে আর চোখ টিপি কমরেডকে।

তারপর গান ধরা গেল, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি চাপা গলায়, আর মাতাল হয়ে ওরা বড়াই শব্দ করলে, বললে হোমরাচোমরা সব লোক বেচবে, বড়ো লোক হয়ে যাবে বসন্ত নাগাদ।

আমিও মাতালের মতো বললাম, একবার দেখতে দিলে কিনতে আমি খুব রাজী। ওরা বললে, পরের দিন দেখতে দেবে।

পরের দিন সকাল থেকে ওরা গিলতে লাগল আমাদের আরক, আমি মাতালের ভান করে চলে গেলাম কুঁড়েটার পেছনে, কমরেডকে রেখে গেলাম ওদের কাছে যাতে আমি না থাকলেও ওদের কোনো সন্দেহ না হয়। ওদেরই একজনকে সঙ্গে নিলাম, টলছিল ব্যাটা, আমি ধরে ছিলাম ওকে, আরেকটু হলেই টুপিটি চিপে মেরে ফেলতাম, তার বদলে ফেলে দিলাম বরফের গাদায়, ঢুকলাম গদাহাটা যেখানে সেই বদরুজে।

দাঁড়িয়ে দেখি, শব্দে আছে ওরা খড়ের বিছানায়, ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক, নড়ন চড়ন নেই, কাশছে সবাই, গলা ঘড়্ঘড়্ করছে, একেবারে কাঁহিল, কথা বলছে না। ভাবছে, আমি ওই ডাকাতদেরই কেউ। আমি কাছে গেলাম, কিন্তু চেয়ে আর দেখতে পারি না, কান্না আমার বদলে কিনা গলা পর্যন্ত এসেই ফিরে গেল — ওখানে তো আমি কাঁদতে পারি না। দেখলাম, ঝগলভ ঘুমুচ্ছে, অসুস্থ। কাঁধে ওর ধাক্কা দিলাম, হুঁশ হতে উঠে বসে টলতে লাগল। মনে পড়ল, কত কী সে বলত আমায়, কেমন চাঙ্গা আর ফুর্তিবাজ ছিল, আর এখন মুখখানা একেবারে যেন দেয়াল, কিছুতেই তাকে ভুলতে পারব না। দাঁড়িয়ে আছি, জিব আমার মাতালের মতো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কথা আর জোগাচ্ছে না। আমার দিকে সে এমনভাবে তাকাল যেন মরতে বসেছে। বললে, ‘আবার ভুল বকছি। সিমন কথা বলছে আমার সঙ্গে। এখানে সিমন আসবে কোথা থেকে?’

আমি তখন ওর হাত চেপে ধরে বলি, ‘এটা স্বপ্ন নয় হে, মদৎ।’ কিন্তু তারপরে যে কী বলব ভেবে পাই না। সাহায্য করবই বা কী করে? আর ওর কমরেডরা সব পড়ে আছে যেন মরা, নাক ডাকাচ্ছে। আর বুরুজটায় ঠাণ্ডা কী — ভেড়া পর্যন্ত জমে যাবে, ষাঁড় পর্যন্ত জমে যাবে। কী যে করা দরকার ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় ঢুকল সেই মাতালটা যাকে আমি বরফের স্তুপে ফেলে দিয়েছিলাম, বলে:

‘মরণ ব্যাধিতে ধরেছে ওদের, টেংসে যাবে। বেঁচে থাকতে থাকতেই টাকাটা ফ্যালো!’

ওখানে পড়ে ছিল একটা চেউরি — গম মাড়াইয়ের জন্যে খোঁচা খোঁচা পাথর বসানো একটা তন্তা। ইচ্ছে হচ্ছিল ওই তন্তায় ওর মাথাটা ভাঙি, আবার ইচ্ছে হচ্ছিল টাকা দিয়ে দিই, লোকটা কিন্তু কথা থামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমিও চললাম, চললাম কী, একেবারে মড়ার মতো। যখন জায়গাটায় ফিরলাম সবাই জিজ্ঞেস করলে কী হয়েছে আমার। বললাম:

‘অনেক গিলেছি, গা ঘোলাচ্ছে।’

চলে গেলাম কমরেডের সঙ্গে। বললাম:

‘কী করা যায় তাহলে?’

সে বললে কথা চালিয়েছিল, কিন্তু কয়েদীদের বেচবে না, রাজী হচ্ছে না। আমি আরো এক রাত কাটাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সেই চেনা লোকটা এসে বললে:

‘এক্ষুনি চলে যা সিমন, নইলে নিজেই ওই বুরুজে পৌঁছবি। আরক সব খতম, নেশা ওদের কাটতে শুরুর করেছে, জান যেতে পারে তোর।’

চলে গেলাম আমরা, যেন কবর দিয়ে ফিরছি — যাওয়াও চলে না, আবার না গেলেও চলে না। রাগে ঘেমে উঠলাম আমি, ঠাণ্ডাও লাগে না। ভাবছি কী করা যায়, দেখি কলকল করছে

ছোট্ট একটা নদী, দেখি একটু একটু বরফ গলতে শুরু করেছে; আকাশে তাকাই — আকাশও হাঁসি-হাঁসি, বসন্তের আর দেরি নেই। মনে হল বেতা খাবায়েভের কথা: ‘বসন্ত নাগাদ বলশেভিকরা টেঁসে যাবে।’ ওকে শাপ-শাপান্ত করে ঘোড়া হাঁকলাম, ততক্ষণে বন্ধু গেছি কোথায় যেতে হবে, কী করব। এলাম আমার বন্ধু গান্টিয়েভের কাছে, আমার প্রাণের দোস্তু। আমার গুরু-গস্তীর মুখ দেখে গান্টিয়েভ মেয়েদের বেরিয়ে যেতে বললে। তখন আমাদের এখানে মেয়েদের পরামর্শে ডাকার চল ছিল না, নেহাৎ এই আজকালই তারা ঠাই পাচ্ছে, তখন তারা আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের মধ্যে অনেক খাশা লোক থাকলেও মেয়েদের তখন বিশ্বাস করা হত না।

গান্টিয়েভ বলে:

‘কী হয়েছে তোর? দেখছি অনেক পথ পাড়ি দিয়েছিস, কী এনেছিস?’

আমি চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। তাকিয়ে রইলাম এতক্ষণ ধরে যে সেও শূন্য:

‘চেয়ে চেয়ে কী দেখাছিস?’

বললাম, ‘লোকে মারা পড়ছে গান্টিয়েভ, খুব বড়ো দরের সব লোক। মদৎ দিতে হয় তাদের। নাকি অমনি মরবে?’

এমনভাবে ও চাইলে যেন নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। বললে:

‘মদৎ দিতে হবে বৈকি।’

‘তাহলে বল তো আমায় কে এই ঙসাগলভ?’

আমার চোখের দিকে চাইলে গান্টিয়েভ, দেখলে চোখ আমার কঠিন।

‘তুই বলশেভিক?’

‘হ্যাঁ, আমি বলশেভিক।’

‘ৎসাগলভও তেমনি বলশেভিক।’

‘কী ও করেছে তাই জানতে চাই। দেখতে পাচ্ছি ও খুব বড়ো দরের লোক।’

‘পাদ্রীর ঘরে ওর জন্ম, কিন্তু ভগবান আর আলখাল্লা ত্যাগ করে পাদ্রী হয়ে যায় কেরমেনিস্ট আর ছেলে সারা ওসেতিয়া ঘুরে ঘুরে বলশেভিকদের জন্যে ভোট জোগাড় করে। অনেক ভোট জোগাড় করেছিল সে।’

‘তারপর কী করল?’ জিজ্ঞেস করলাম এমনভাবে যেন ওর কথাটা কানেই তুলি নি। আসলে আমার ইচ্ছে হিচ্ছিল আগাগোড়া সবটা জানি, তাই কনেকে দেওয়া যৌতুক সম্পর্কে লোকে যেভাবে কথা বলে, আমিও বলছিলাম সেই সুরে।

‘তারপর সে যায় তিফ্লিসে, আর কমরেড শাউমিয়ান, জরুরী কমিশার — কমিশার কী তুই জানিস?’

মাথা নাড়লাম আমি।

‘তাকে বৈপ্লবিক সামরিক সোভিয়েতের সভাপতি করে দেয়। বৈপ্লবিক সামরিক সোভিয়েতের সভাপতি কী তুই জানিস?’

মাথা নাড়লাম আমি।

‘ওর ওপর ভার ছিল তুরস্ক ফ্রন্ট শেষ করে মেহনতীদের যে যার বাড়ি পাঠানো।’

‘আর সেও তাদের পাঠাল, সব করল?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।

এবার গান্ধিয়েভ মাথা নেড়ে বলে গেল:

‘তারপর শাউমিয়ান তাকে বাকুতে নিয়ে যায়, একসঙ্গেই কাজ করতে থাকে।’

সে আরো বললে:

‘আর তুই জানিস, দেবলা কেসায়েভ, আন্দ্রেই গান্ধিয়েভ আর কলিয়া কেসায়েভ মারা যাবার পর তৎসাগলভ হয় ওসেতিয়ার

ইনকিলাবী লড়াই পরিষদের সভাপতি। ভারি মাথাওয়ালা লোক,
ভোরের তুষারকণার মতো জ্বলজ্বলে।’

এই সময় আমি একবার দাঁড়িয়ে উঠে আবার বসে
পড়লাম — তাতে ফাঁস হয়ে গেল আমার উত্তেজনা।
গান্ধিয়েভ বললে:

‘তুই ভেবেছিস আমরা কিছুই জানি না। অমন করে যে লড়েছে,
লড়াইয়ের জন্যে সবকিছু কোরবানি করেছে, তুই ভেবেছিস সে
কমরেডকে আমরা ভুলে গেছি? তা যদি ভাবিস তাহলে তুই
খারাপ বলশেভিক। ঠিক করে বল তো, তুই এই কথা জানাতে
এসেছিস যে ওসেতিনরা, ওসেতিনদের মধ্যকার সবচেয়ে অজ্ঞান
লোকেরা ওকে ধরিয়ে দিয়েছে, এখন তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে
ব্দরুজে, ঠান্ডার মধ্যে, গুদায়?’

আমার আর সহ্য হল না। চেঁচিয়ে বললাম:

‘অসুখ করেছে ওর, কথা বলছে যেন পরপার থেকে।’

‘তুই হয়রান হয়ে গেছিস সিমন,’ আমায় বললে গান্ধিয়েভ,
‘জোব্বাটা নিয়ে একটা গরম জায়গা দেখে শূয়ে পড়। টাইফাস
হয়েছে গেওর্গির, ভুল বকছে, চিনতে পারে নি তোকে?’

আবার বললাম গলা চাড়িয়ে, ‘ওটা একটা কথা নাকি? চিনতে
পারল কি পারল না সেটা কোনো কথা নয়। ওকে ওখান থেকে
সরিয়ে আনা দরকার। শিরায় যাতে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে, তেমন
একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি তোর সঙ্গে। কেন এসব
শুধাচ্ছি? ওর মা-বাপের কথা জানতে চাই বলে? ভারি আমার
দায় পড়েছে ওর মা-বাপকে নিয়ে। কেন আমায় জ্বালাচ্ছিস। শেষ
পর্যন্ত সব বল।’

গান্ধিয়েভ বললে:

‘ৎসাগলভ কে তুই সব জানতিস না, তাই বললাম, এখন
জানলি।’

‘শোন,’ ফের চ্যাঁচালাম আমি (নিজেরই আমার তখন যেন অসুখ করেছে, যেন প্রলাপ বকাঁছি), ‘ওর ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে না, দেখে যাবে না কেমন করে মানুষের কাজ করে দিচ্ছে নদী, তাই ও যাতে বেঁচে থাকে, দেখে যায়, সেটা আমাদের করতে হবে। এই হল আমার কথা।’

গাস্তিয়েভ বললে, ‘দাঁড়া, দাঁড়া সিমন। ওসেতিনরা ওর জন্যে দশ হাজার রুবল চাইছে, সেটা আমরা ওদের দেব। ওরা তাকে এনে দেবে। কমরেড হুসিনা, কমরেড উর্তায়েভ, আর মিশা কেলাগভ যাবে ওকে আর অন্যান্য কমরেডদের আনতে। এই হল আসল ব্যাপার, তুই এবার সব জানলি।’

বললাম, ‘গাস্তিয়েভ, অনেক টাকা চাইছে ওর জন্যে, মোটা টাকা, সেটা ওর যোগ্য, মাখাজার! কিন্তু ও টাকা বলশেভিকদেরও দরকার। আমি লোক জোটছি, ওরা যখন টাকা নিয়ে ফিরবে, ওদের রক্ত খাব আমি, শেষ কর্‌ডিটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে ফেরত দেব তোকে।’

গাস্তিয়েভের চিৎকারে কান না দিয়ে ছুটে বেরুলাম ঘর থেকে, আমার পেছন ধাওয়া করলে লোকে, কিন্তু পার্টির শৃঙ্খলা সব ভুলে গেলাম আমি, চললাম একাই, কেননা ওই মানুষটিকে আমি ভালোবেসেছিলাম। চললাম লোক জুড়িয়ে বাহিনী গড়তে — হামলা করে টাকা ছিনিয়ে নেব। চললাম, লোকেও আমার ডাকে সাড়া দিলে, বন্দুক নিয়ে একা চলছি ঘোড়ায় চেপে, কাউকে ভয়-ডর নেই। রওনা দিয়েছি সন্ধ্যায়, তখন মার্চ মাস পড়ে গেছে। সন্ধ্যায় চলছি, দু’পাশে বেগুনী মেঘের মতো পাহাড়ের সারি, চোখ ভরে তাই দেখছি, খেয়াল করি নি সরল পথ বেয়ে লোক উঠছে ওপর পানে। হঠাৎ থেমে গেল আমার ঘোড়া, হাঁক শোনা গেল ওপর থেকে। দেখেই চিনতে পারলাম যে হাঁক পাড়ছে ঐসৎসা, ও ছিল আমাদের কোলিক শত্রু, কিন্তু ওর কথা আমার মনেই

ছিল না, বলশেভিক হবার পর থেকে ওর কেশস্পর্শও করতাম না।
কিন্তু নিজেই সে ওপর থেকে হাঁকলে:

‘মরবার জন্যে তৈরি আছিস সিমন?’

আমি তখন ওকে অপমান করে যা মুখে এল গাল পাড়তে
লাগলাম, বন্দুক খসলাম না। ও চ্যাঁচালে:

‘তিন বছর আগে তোরা আমাদের কুলের দ্ব’জনকে ঘায়েল
করেছিস, আমি তোকে দ্ব’জনের বদলা ধরিছি। মরবার জন্যে তৈরি
আছিস সিমন?’

হেঁকে বললাম, ‘ৎসিৎসা, ওসেতিয়ার যখন দরকার প্রতিটি
মানুষ, তখন আমার মারলে তুই বোকামি করবি। ভেবে দ্যাখ
খুনের বদলা নেবার কথা লোকে কেমন ভুলে গেছে! শাদাদের
সঙ্গে কী ভাবে একসঙ্গে লড়েছে আর মরেছে তাকোয়েভ আর
উরুইমাগভ, অথচ ওরা ছিল জাত শত্রু, একসঙ্গে কেমন লড়েছে
গালিয়েভ আর দ্জারোগভ — তারাও ছিল জাত শত্রু।’

ও কিন্তু গালাগালি দেয়, কেবল নিজের কথাটাই বলে:

‘তোরা আমাদের দ্ব’জন বেশি ঘায়েল করেছিস! দ্ব’জন বেশি
ঘায়েল করেছিস।’

তখন আমার মাথায় চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠে
চ্যাঁচলাম:

‘নে, খুন কর জলদি, হাঁদা কোথাকার।’

গুলি করলে ও, লাগল আমার কাঁধে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে
মুখ ছেঁচে গেল, দাঁত ভাঙল। উঠে দাঁড়িয়ে বরফ চাপালাম ঘাড়ে,
মুখ সাফ করলাম। ঘোড়ায় উঠলাম, বেতা খাবায়েভ আর তার
যত রাজ্যের নফরদের শাপ দিতে দিতে চললাম বহু কণ্ঠে। এই
দ্ব’র্ষটনার জন্যে দশ হাজার টাকাটা আর লুট করা গেল না।
ৎসাগলভ আর তার সঙ্গীদের ফিয়াগদন নদীর পাড়ে এনে পেঁাছে
দেয় ওসেতিনরা, আর নোংরা হাতে টাকাটি নিয়ে চলে যায়। নিজে

ওদিকে আমি বিছানায় গড়াই আর কোঁকাই, কেননা কাঁধের ঘাটা পচে গিয়ে টাটাত। জিজ্ঞেস করতাম, হাতটা আমার থাকবে কি থাকবে না। লোকে বলত, থাকবে। শ্বুনে ঘূর্মিয়ে পড়তাম, আর ঘূর্ম ভাঙলে ভারি আফসোস হত, কেন ংসগলভকে গুলি করলাম না, ঘায়েল করলাম না ওদের কুলের তিন নম্বরকেও।

যখন সেরে উঠলাম তখন দিব্যি গরম, সূর্য একেবারে চুল্লির মতো। হেঁটে বেড়াতাম, হাত নাড়াতাম; নাড়াতে পাচ্ছি দেখে আনন্দ হত। এই সময় শোনা গেল বেতা খাবায়েভ শাদাদের ডেকে পাঠিয়েছে, তারা খৃস্টিয়ানস্কয়েতে আসছে হামলা করতে, তাই পাহাড়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিতে হবে। ঘোড়া নিলাম, একটা হাত বেশ চালাতে পারছি, অন্যটা নয়। ঘোড়ায় চেপে চলে গেলাম পাহাড়ে নয়, খৃস্টিয়ানস্কয়েতে, কেননা ংসগলভ সেখানে বিছানা নিয়েছে, চেয়েছিলাম তাকে সরিয়ে আনব, কিন্তু হয়ে উঠল না।

একটা লোক, ছোকরা, আমি চিনি না, পেছন থেকে এসে আমার সঙ্গ ধরে বললে:

‘চল খৃস্টিয়ানস্কয়েতে যাই পায়ে হেঁটে। কসাকরা আসছে, আমরা ঘোড়ায় চেপে থাকলে ঘোড়া কেড়ে নেবে, আমাদের মারবে।’

বললাম, ঘোড়া লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা আমি জানি। পাশাপাশি লুকিয়ে রেখে আমরা রওনা দেব, কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু ঘেরাও হয়ে গেছে, জেনারেল ভাদবলস্কি যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে, আট হাজার কসাক এসে একশ’টা কামান বসালে, বাঁকা হাসি হাসলে জেনারেল, প্রতিনিধিদল ডেকে পাঠালে, চোটপাট করলে তাদের ওপর, হুকুম দিলে সমস্ত লোকেদের বাড়ি থেকে বার করে আনতে, আর খুব মদুর্চকি মদুর্চকি হাসলে। তখন আমি কলেজের ছাত্রটাকে বললাম (সে বলেছিল সে কলেজে পড়ে) যে সে ঘোড়া দুটো পাহারা দিক, আমি গাঁয়ে যাব ংসগলভের খোঁজে। ছাত্রটা

কবুল করলে যে গাঁ থেকে ঔসাগলভকে বার করে আনার হুকুম আছে তার ওপর, সেই চেষ্টা করে দেখবে, আমি বরং ঘোড়া পাহারা দিই। আমি পাহারা দিতে লাগলাম, আর বন্ধুর মতো এখন আমার এমন করছে যেন নদী পেরুছি, ঘোড়া পড়ে গিয়ে তলিয়ে গেছে, আমিও ডুবাছি তার সঙ্গে। গুলির শব্দ শুনছিলাম, জখম কাঁধটা আমার টাটিয়ে উঠল, হাতটা এমন অসাড় হয়ে গেল যে বন্ধুতে পারছিলাম না কী করি। ছাত্রের ভরসায় না থেকে আমি ঘোড়া রেখে নিজেই চলে গেলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকে। কোনোক্রমে কসাকদের হাত এড়িয়ে ফিরে এলাম ঘোড়ার কাছে। দোঁখি ছাত্রটা ঘাসের ওপর পড়ে পড়ে কাঁদছে। আমি তুলে ধরলাম ওকে, কিন্তু পায়ের ওপর তেমন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না, কোনো কথাই বলতে পারছিল না আতঙ্কে। তখন ওকে খাড়া করে দাঁড় করলাম, সমস্ত যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল। ছেঁকে ধরলাম ওকে, কাঁদতে কাঁদতে সে বললে:

‘চালাঘরে লুকিয়েছিল ঔসাগলভ, বেইমানরা তা কসাকদের দোঁখিয়ে দেয়। কসাকরা গুলি করে চালাঘরে, ঝাঁঝরা করে দেয়, কিন্তু ঔসাগলভের গায়ে লাগে না, কেননা মেঝেয় শুয়ে ছিল সে। গুলিতে চালাঘর যখন ঝাঁঝরা হয়ে গেল, তখন ঔসাগলভ ওঠে চালার ওপরে, কসাকদের দেখতে পায়। গুলি করা থামায় ওরা, ঔসাগলভ চাল থেকে নেমে এসে দাঁড়ায় তাদের সামনে। তার বয়স তখন একদশ বছর ন’মাস, কসাকদের বিশ্বাস ছিল বলশেভিকরা হল শিঙওয়ালা দানো, ওর কথাই শুনতে চাইছিল না। কিন্তু সে বললে:

‘হ্যাঁ, আমি বলশেভিক, আমি গেওর্গি ঔসাগলভ। আমি মৃত্ত ওসেতিন। হাতিয়ার বাগিয়ে কেন তোমরা যাচ্ছ মেহনতীদের বিরুদ্ধে? আমি নিজে দিন কাটিয়েছি নবাবের মতো মর্গি খেয়ে, ননী খেয়ে বেড়ে উঠেছি, এখন প্রাণ দিচ্ছি জনগণের সাম্যের

জন্যে, তোমরা মেহনতী কসাক, তোমাদের জন্যেও। অন্ধ তোমরা, কেন তোমরা লড়ছ? তোমাদের অন্ধ করে রেখেছে পরগাছারা, পুঁজিপতিরা, শাদা কাঁধপাটি লাগানো তোমাদের অফিসাররা। তারা চায় তোমাদের খাটাতে, তোমাদের ষাঁড় করে, ঘোড়া করে তুলতে, গোলাম বানাতে!’

তখন গুলি করে কসাকরা। ঔসাগলভ কিন্তু পড়ে যায় নি, বলে:

‘আমার রক্তে, অন্যান্য যোদ্ধার রক্তে গড়ে উঠবে কমিউনিজম, তোমরা চাও আর না চাও!’ — তারপর শান্তভাবে মারা গেছে।

ছাত্রটি কেবলি কাঁদতে লাগল। বললাম:

‘চল, দু’জনে মিলে মার লাগাই ওদের, যত কটাকে পারি খতম করি।’

শীতকালের মতো শাদা হয়ে উঠেছিল সে, কাঁপছিল। খাপ থেকে বন্দুক বার করলাম, অর্মানি হতভাগা হাতখানা আমার আছড়ে পড়ল চাবুকের মতো, এমন যন্ত্রণা করতে লাগল যে জিব কামড়াতে লাগলাম, তারপর বেতা খাবায়েভ আর সমস্ত প্রতিবিপ্লবের শাপাস্ত করতে করতে চলে গেলাম। বেদনা ছিল সারা রাত, তার পরের দিন, তার পরের দিনও।

তারপর ঔসাগলভকে আমরা কবর দিয়েছিলাম খৃস্টিয়ানস্কয়ে গ্রামেই, স্মৃতিস্তম্ভ তোলা হয়। ও যেসব কথা বলত, তা আমার বেশ মনে আছে। আর নদী সম্পর্কে যা বলেছিল, সেটাই মনে পড়ে বেশি করে। বুনো পাহাড়ী আমি, আর কেউ আমায় কখনো বলে নি যে নদী থেকে আলো জ্বলতে পারে। উদ্ভট সব ভাবনায় আমার ঘুম গেল, মনে হল বৃষ্টি পাগলা হয়ে যাব, ঝাঁপিয়ে পড়ব নদীতে।

তারপর খতম হল শাদারা, ভালো হয়ে গেল হাতখানা, কাঁধটাও জায়গামতোই ফিরল। একদিন এক পরব হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর

ঘোড়া ছুটাচ্ছে লোকে, অনেক খাওয়া-দাওয়া, বক্তৃতা হল, গান গাইলে, কোরাস দলে নাচলে, চেপেন নাচ, সিমগা নাচ, কাস্‌গনকাভ্‌দ্ নাচ — সবই হচ্ছে, কেননা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বহু দিন, নির্মাণ কাজ শুরুর হয়েছে।

দেবলা আমায় বলে:

‘শুর্নেছিস সিমন, জেম-আভচালের কাছে কুরা নদীতে বিদ্যুৎ-স্টেশন গড়া হচ্ছে, তাতে আধখানা ককেশাস আলো হয়ে যাবে। বাতি জ্বলবে একেবারে কোবি আর তিফ্লিস পর্যন্ত।’

বললে, কি ভাবে বহুদিন থেকে কুরা নদীতে কাজ হচ্ছে, লোকে লড়ছে নদীর সঙ্গে, ঙসাগলভের মতো সুন্দর করে বর্ণনা দিলে, কিন্তু এমন ভাষায় যে আমার সমস্ত প্রাণটা গান গেয়ে উঠল, পাগলার মতো শুরুর করে দিলাম চেপেন নাচ, সিমগা নাচ, কাস্‌গনকাভ্‌দ্ নাচ, আর কেবলি বলতে লাগলাম:

‘শাদাদের হারিয়েছি, এবার লড়তে যাব নদীর সঙ্গে, শাদাদের খতম, এবার নদীর সঙ্গে।’

জিনিসপত্র গোছগাছ করে আমিও চললাম জেম-আভচাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। খাটতে লাগলাম সেখানে গতর-খাটা কুলি হিশেবে, কেননা জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছু তো দেখি নি, আর কোনো বিদ্যেও নেই। আর ঐ কুরা নদীতে যা আমি দেখলাম তা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখা যাবে না, কোনো কিতাবেও লেখা নেই। তাই তোমাদের একটু বলি কী দেখলাম।

দুই নদী সেখানে এক জায়গায় মিলেছে, একটার জল একেবারে ফিরোজার মতো কী নীল, নাম তার আরাগভা, অন্যটায় হলদেটে জল, যেন বাসন মাজা। দ্বিতীয় নদীটায় — কুরায় — গড়া হচ্ছে মস্তো বাঁধ, একটা বাঁধের পর দুটো বাঁধ, দিন রাত চলছে খোঁড়াখুঁড়ি, আর লোক যে কত, লোকের ভিড়েই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব, যেমন হয় বনে। আর সবাই চেঁচায়: ‘খবরদা! খবরদা!’ তার মানে

হুঁশিয়ার, ডিনামাইট বসছে, আর পাথর ফাটছে এমন ডাক ছেড়ে যে নদীর চেয়েও বেশি। দেখি, নদী কেমন মেনে নিয়েছে, তাকে নিয়ে যা খুঁশি করুক কিছু তার এসে যায় না। তবে তা ঠিক নয়।

আমি কাজ করতাম নিচে, যেখান থেকে পাথর সরানো হত, খাটখাট করত নিউম্যাটিক হাতুড়ি। আমি এখন গিজেলদনস্রয়ের টেকনিশিয়ান, ওসব ব্যাপার জেনে গেছি, কিন্তু তখন ছাগল যেমন নদুন চাটে, তেমনি কেবল ঘুরে ঘুরে শৃংকি আর চাটি, সবই মনে হয় ভারি স্বাদু আর কেমন বোঝা যায় না, যেন স্বপ্ন। খাটতাম আমরা বলদের মতো, মোষের মতো, কেননা অমন কাজে তাগদ দিতে মায়া হয় না। একদল বড়ো বড়ো পাথর ফাটাত টুকরো টুকরো করে, অন্য দল তা সরিয়ে নিয়ে যেত, আরেক দল পাহাড় ফুটো করত বোরিং যন্ত্র দিয়ে, থরথরিয়ে কাঁপত যন্ত্র, থরথরিয়ে কাঁপত লোকে, যেন শীতে হাওয়া দিচ্ছে, অথচ গরম তখন ভয়ানক, আর ফোঁসফোঁস করত ছোটো ছোটো ইঞ্জিন, কেবলি ওপর-নিচ করত ছোটো ছোটো ওয়ান, পাথর পড়ত নদীতে, তাতে রাগ করে গর্জে উঠত নদী, কাঁচকাঁচ করত কপি কল।

কাজ করতাম আমরা আলুথালু পোষাকে, পাথর আর তার কুঁচিতে পোষাক হয়ে যেত যেন আগুন-পোড়া, কিন্তু কেউ তার মায়া করত না, ঘাম মদুছত সবাই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে, চারদিকে এমন গোলমাল আর ফুর্তি যা কোনো পরবেও দেখা যাবে না। তখনো ঝর্টিতি বাহিনীর চল হয় নি কমরেড, কিন্তু সবাই আমরা ছিলাম ঝর্টিতি বাহিনীর মতোই, থাকবার ব্যারাকও আমরা তৈরি করে নিই চারদিনের মধ্যেই আর এখানেই ছুতরের কাজ শিখি আমি।

আর যখন চেয়ে দেখলাম কত জাতির লোক কাজ করছে চারিপাশে, তখন অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে সবাই আমরা

আলাদা অথচ কী সুন্দর আমাদের চলছে, আর আগে কুকুরের মতো কামড়া-কামাড়ি করতাম হাড় নিয়ে। কাজ করছিল সেখানে ওসেতিন, জর্জীয়, আবখাজী, রুশী, আর্মেনী, কত জাতের লোক। বুদ্ধলাম এই হল আন্তর্জাতিক, এরই জন্যে অতদিন লড়েছি গৃহযুদ্ধে। এরই জন্যে আমরা কাবাদীদের জন্যে লড়েছি পিয়াতিগোস্কে, মেহনতী জর্জীয়দের জন্যে রাচাতে, আর এখন শান্তির জীবন গড়েছি।

চারিদিকে নানান ভাষা, ভারি ইচ্ছে হল সবার সঙ্গেই কথা কই, সবাইকে বুঝি। রুশীতেও ভালো বলতে পারতাম, কেননা অনেক শব্দই আমাদের ভাষার সঙ্গে এক। আমরা বলি ‘মাদ’ আর রুশীতে বলে ‘মাত’ (মাতা), আমরা বলি ‘মিত’ আর ‘মাজ্গ্’, রুশীতে তার মানে ‘মেয়দ’ (মধু) আর ‘মজ্গ্’ (মগজ), আমরা বলি ‘সেদসে’, রুশীতে ‘সেদ্ৎসে’ (হৃদ), রুশীতে যা ‘জিমা’ (শীত), ওসেতিন ভাষায় তা ‘জিমেগ’। তাই শিগগিরই রুশীতে নিজেকে বোঝাতে পারতাম, আর ভারি অবাক লাগল যে জর্জিয়ার ভাষায় মা’কে বলে ‘দেদা’ (রুশীতে—দাদা) আর বাপকে বলে ‘মামা’ (রুশীতে—মা), তবে জর্জিয়ার ভাষাতেও সকালে কাজে গিয়ে বলতাম ‘গামার্জোবা আম্‌খানাগো’ কিংবা ‘খোগাসাখর্দ, কাৎসো’ তার মানে ‘নমস্কার কমরেডরা’ কিংবা ‘কেমন আছো হে লোকেরা’। আর যাবার সময় বলতাম, ফের দেখা হবে, জর্জিয়ার ভাষায়—‘ম্‌শ্‌বিদব’। অনেক কমরেডের কথাই বুদ্ধতে পারছি, এতে ভারি ভালো লাগত আমার। ইচ্ছে হত সকলের সঙ্গেই আমাদের ব্যাপার-স্যাপার, আমাদের কাজ নিয়ে কথা বলি।

সবে কাজে এসেছে এমন কোনো লোক যদি হত, কিংবা তুর্কী বা আবখাজী, যার কথা বুঝি না, তাহলে বলতাম ‘লেনিন’, সেও

বলত ‘লেনিন’, তারপর ইশারায় কথা চালাতাম কিংবা দোভাষী জোটাতাম, তবে বন্ধু নিতাম, ও আমাদেরই লোক।

একবার একজনের সঙ্গে কথা কইছি, লোকটার মন ভার, খালি গা, কেননা পাথরে তার হাতে চোট লেগেছে। দেখলাম তাকে কোথায় কম্পাউন্ডার, কি ভাবে যেতে হবে। ও কোনো জবাব দিলে না, মাথা নাড়লে, আমি যখন বললাম ‘লেনিন কমরেড!’ ও তখন তার বেড়ালের মতো মস্তো চোখদুটো মেলে বললে, ‘মহম্মদ’। ‘লেনিন’ বললে না। ভাবলাম লোকটা গোঁড়া মুসলমান, বললাম:

‘মহম্মদ আর নেই, তবে ভাবনা নেই, তাকে ছাড়াই তোর চলে যাবে।’

ও কিন্তু জর্জিয়ার ভাষায়—ও ছিল আজারী—কেবল বলতে লাগল ‘মহম্মদ, মহম্মদ’। তখন আমি বললাম:

‘ভাষা যখন বদ্বিস তখন জবাব দিচ্ছিস না কেন? আর কেবল যদি ‘মহম্মদ, মহম্মদ’ আওড়ে যাস, তাহলে তুই লোকটা খারাপ, মোল্লারা তোকে ভিজিয়েছে, কিন্তু তোকে থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে নয়, নদীর সঙ্গে লড়াই তো একজোটাই।’

ও কিন্তু ঘৃসি দেখালে আমায়, আমি অবিশ্যি ওর খারাপ কিছু করি নি। তবে লোকটাকে আমি মনে রেখে দিলাম, শেষ অবধি ও বদলোকই রয়ে গেল, তারপর মজুরদের যখন রোগে ধরল—অসাবধানে আজোবাজে জল খেত সবাই, ফলে নানারকম পেটের গোলমাল দেখা দেয়—ও তখন ব্যারাকে ঘুরে ঘুরে গোপনে বলে বেড়াত যে ব্যামোতে সবাই মারা যাবে, কেননা এসব ব্যাপার হচ্ছে ভগবান আর মহম্মদের বিরুদ্ধে। একদিন ওকে পাকড়াও করলাম এক কোণে, ও তখন পেঁছিয়ে-থাকা লোকেদের বোঝাচ্ছিল যে ইচ্ছে করে টাইফাস রোগ ছড়ানো হচ্ছে, লোককে উচ্ছ্নে দেবার মতলব, কত লোককে এক জায়গায় এনে পুঁরেছে।

বলছিল কী ভাবে টাইফাস ছড়ানো হয়: গলা থেকে পচা মাংস নিয়ে তিন দিন তিন রাত ভিজিয়ে রাখা হয় জলে, তারপর নিঙড়ে, সেদ্ধ করে তিন চামচে খেতে দেওয়া হয় ইন্দুরকে, ইন্দুর তা খেয়ে টাইফাস ছড়িয়ে বেড়ায়।

বললাম, ‘কী মহা গবেষ্ট তুই, আর যারা তোর কথা শুনছে তারাও সব হাঁদা। আমরা বলশেভিকরা চুলোয় দিই তোর ইন্দুর আর তোর মতো লোকেদের।’

আমার কথায় ভয় পেয়ে যায় সে, কাজ ছেড়ে দেয়, চলে যায় যেখান থেকে এসেছিল।

কথাটা বললাম কারণ ফের নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরুর করেছিলাম, যা পারি শিখি, সবকিছু দেখি, কেমন ধারা খাটুনি, কেমন যন্ত্রপাতি, প্রলেতারিয়েতের কত বিদ্যে দরকার। মনে পড়ল আমাদের আদরের কমরেড গেওর্গির কথা, কী ঠিক কথাই না সে বলেছিল, অথচ আমি বিশ্বাস করি নি যে সত্যিই আমি লড়ব এই আমাদের নদীটার সঙ্গে, এমন একটা জিনিস গড়ব যাতে আলো হয়ে যাবে কোঁবি থেকে তিফ্লিস পর্যন্ত। কী বিরাট কান্ড-কারখানা শুরুর হয়ে গেছে এখানে। পাৎসিয়া-খোঁবি খাদটাকে চালাতে হবে টিউবের মধ্যে দিয়ে, বানাতে হবে ত্রিশ মিটার চওড়া, আট মিটার গভীর ক্যানেল, বাঁধ দিতে হবে, তলা খুঁড়তে হবে, বানাতে হবে সেতু, পাথর সরাতে হবে, তাই দিন রাত কাজ চলল তিন শিফটে। কাজ করতাম আর দেখতাম কী কী ব্যাপারে তখনো আমরা ঠেকায় পড়ছি, কী ধরনের প্রতিবিপ্লব তখনো কোথায় লুকিয়ে আছে। আর শোনো বলি, এক নম্বর প্রতিবিপ্লব ছিল নদীটাই। এই তার ফোঁসফোঁসানি এত কম যেন নেই, একেবারে উধাও হয়েছে, এই আবার সামনে যা পাচ্ছে সাপটে নিচ্ছে, যেন মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বেড়াল। দুই নম্বর প্রতিবিপ্লব ছিল আমাদের নিজেদের লোকজনেরই অসভ্যতা, বিবেচনা করে সবাই

চলত না, ঘাড়ের ওপর মাথা তো নয় তরমুজ। কাছেই একটা ছোটো শহর মৎস্বেতে বেড়াতে যেতাম, বিছাঁছির শহর, সাবেকী, ওই একরকম আর কী। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে বসতাম সরাইখানায়, কত কালের কত কথা হত, দিবিয়া আলাপ জমত। নাচতে ভালোবাসি আমি, তখন বয়সও কম, তবে বলি শোনো, নাচটা ভালো উৎসাহে তবেই আমি তাতে রাজী।

এসেছি মৎস্বেতে, সরাইখানার সামনে থামল কাঠ-কুটো বোঝাই দুটো গাড়ি। মোষগুলো মাথা নাড়ায়, শোঁকে, ফোঁসফোঁস করে নাক দিয়ে। জর্জরীয়া গাড়ি থেকে নেমে এল সরাইখানায়। দু'পাঁইট করে আঙুরের মদ খেলে তারা, বাস আর কিছা না। একজন সঙ্গে সঙ্গেই নাচতে শুরু করলে, মদ খেয়েছে বলে নয়, এমনি, মনের আনন্দে, প্রাণ ওর অটেল, সেটা ভর করল পায়ে। ভারি চমৎকার! প্রথমে নাচতে লাগল একটা পা, দ্বিতীয়টা তার পাশে পাশে, তারপর একসঙ্গে দু'পায়ে। তারপর এমন কায়দা করে কোমর ঘোরাতে লাগল যে দেখেও আনন্দ। দেখি, কাঁধ আর স্থির থাকতে পারছে না, তাও নাচছে। শূধু মাথাটা নাচছে না, শূধু হাসছে। তারপর মাথাটাও কেমন একটা দুলালুনি দিয়ে ভাসতে লাগল।

অন্য জর্জরীয়া ছোটো, চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। সরাইখানার মালিক বোরিয়ে এসে ঠেলা দিলে তাকে বড়োর সঙ্গে নাচতে, আর বড়োটা তখন যেন উড়ছে, একটু হাঁপিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ছোটোটা একটু পাশকে হয়ে, টিকটিকির মতো বেঁকে তালি দিলে হাতে, আমার দিকে চোখ মটকে সেও নাচতে নামল। ঘুড়ির মতো উড়তে লাগল দু'জনে, মাটিতে পা যেন ঠেকেই না, ভারি ভালো লাগল দেখে, তারপর একসঙ্গে হাঁক দিয়ে তারা উঠল গাড়িতে, চাবুক হাঁকালে, মোষগুলোও ফোঁসফোঁস করে যেমন এসেছিল তেমনি উধাও হয়ে গেল। একে বলে ফুর্তি, কাজের

ব্যাপারে কোনো গণ্ডাগোল না ক'রে। যেমন ধরো, আরেকবার এসেছি সরাইখানায়, কাঠুরেরা নাচতে চাইছে সামোভার মাথায় ক'রে। দোকানদার কিন্তু সামোভার দিতে চায় না, ঠিক কথাই বলে, মাতাল হয়েছে, গায়ে গরম জল পড়বে, জীবন হারিয়ে লাভ কী। ওরা কিন্তু মদ গিলছে, ঘোড়ার মতো পা ঠুকছে, ডাক ছাড়ছে, একেবারে বিছছিঁরি।

হঠাৎ একজন বলে, 'কাৎসো, কাৎসো, কাঠের গুঁড়িগুলোকে ভালো করে বেঁধেছিস তো?'

অন্যজন বলে, 'কার দায় পড়েছে তোর কাঠ মারতে। বসে বসে মনের সুখে চুমুক দে।'

'আলগা বাঁধন হলে স্রোতে ভেসে যাবে,' বলে প্রথম জন, 'কুরা নদীতে ঢল নামছে, কী হবে রাতে, বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে।'

আমি মনে মনে ভাবি, 'দ্যাখো কেমন মাথামোটা, কত হয়রানির কাজ, যা রোজগার করেছিল, ওড়াচ্ছে, একেবারে খামোকা।' ওরা কিন্তু বসেই আছে, মদ খাচ্ছে, একজন উঠে গেল, আবার ফিরে এল, হাঁটতেও পারছে না, বলে—মানে কোনোরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে:

'কাৎসো, ব্যাপার সুবিধের নয়, কাঠগুলো নিজেরাই চলে যাচ্ছে ভাঁটির দিকে।'

সবাই তাতে হেসে উঠল। ভাবল ঠাট্টা। আমিও হেসে ফেললাম, তারপর সবার সঙ্গে গেলাম দেখতে। হঠাৎ গা এমন হিম হয়ে এল যেন জলে ডোবা গুঁড়ি।

কাঠের গুঁড়িগুলোকে খসিয়ে দিয়েছে নদী, পাথরে আছড়ে আছড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে দড়ি, সমস্ত কাঠ ভেসে চলছে ভাঁটির দিকে, ঘটাংঘটা আওয়াজ কী যেন তোপ দাগছে। যেমন ছিলাম, তেমনি টুপি হাতেই ছুটলাম মৎস্বেত থেকে, আরো অনেক মজুরও ছুটল, কেননা শহরে আমাদের পারাপারের একটা হালকা সেতু

ছিল। দৌঁখ, গুঁড়িগুঁলো ধেয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সেতুতে, সেতুও আমাদের জায়গায় জায়গায় ধসে পড়ল, তক্তাগুঁলো খসে গিয়ে গুঁড়িগুঁলোর পেছনে পেছনে রওনা দিলে ভাঁটির দিকে।

আমরা ওদিকে তীর বরাবর ছুটছি আর চ্যাঁচাচ্ছি, কেননা খানিকটা দূরে ভেলার ওপর ছিল আমাদের পাইল বসাবার যন্ত্র, আর গুঁড়িগুঁলো ছুটছে সোজা সেই দিকে, যদি ধাক্কা মারত তাহলে ও যন্ত্রকে আমাদের কবর দিতে হত, চোখেও আর দেখতে হত না কখনো। তবে ভাগ্য ভালো, কাঠগুঁলো ওটাকে চক্কর দিয়ে এগুতে লাগল সামনে, আর আমরাও ফের চ্যাঁচাতে লাগলাম, কেননা সামনে অল্প জলে ছিল আমাদের ড্রিলিং-এর ভেলা, ড্রিলগুঁলো বসানো ছিল নদীর তলে, ভয় হল গুঁড়ি ওগুঁলোর দফা সারবে।

ইচ্ছে হল বন্দুক নিয়ে ওই হাঁদাদুটোকে গুলি করি, ভারি রেগে গিয়েছিলাম। তবে গুঁড়িগুঁলো ওদের চেয়ে বুদ্ধিমান, ডুব দিলে ভেলাটার নিচে, গিঙয়ে গিঙয়ে ভাসিয়ে তুলল তলে বসানো ড্রিলগুঁলোকে, কোনো ক্ষতি না করে আবার চলল ভেসে। ভেলাটা শুধু একটু দুলতে লাগল, তাছাড়া বেশি কিছু হল না।

দ্যাখো কেমন রকমারি সব লোক হয়!..

আমরা ছুটছি, চ্যাঁচাচ্ছি, দূর্ভাবনা করছি আমাদের যন্ত্রগুঁলোর জন্যে আর কাঠুরিয়া দুটো গিয়ে দেখল গুঁড়ি নেই, আবার ফিরে এল সরাইখানায়, মাথায় সামোভার নিয়ে নাচলে, গরম জল পড়ল মাথায়, তারপর ওই মেঝের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল, ভারি বদখদ লোক, চেয়ে দেখতেও ঘেন্না হচ্ছিল।

তখন আমি বুদ্ধিতে পারলাম নতুন হালটাই বা কী, পুরনো হালটাই বা কী। নতুনটা হল সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত আমাদের কাজ, আর পুরনোটা কেবল দাঁড়িয়ে রইল, হাত গুঁটিয়ে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে, এ হল আমাদের দুঃখ। সেইজন্যেই দরকার ছিল

লড়াই করা, নতুন ধরনে বাঁচা, ওই কাঠুরিয়াগুলো মতো নয়, কিংবা যে লোকটা কেবল বলত ‘মহম্মদ, মহম্মদ’। এত বড়ো বড়ো কমরেড, পার্টির লোক থাকতে কে তোমার ঐ মহম্মদ। মেহনতীদের জন্যে কী করেছে মহম্মদ?

এই যেমন আরেকবার আমায় বললে:

‘আচ্ছা কমরেড সিমন, এই কমরেড সেগো কেন রোজ সন্ধ্যায় যায় মঠে। কী হচ্ছে এটা?’

বললাম:

‘ভালো হচ্ছে না, আমি নিজেই মঠে গিয়ে দেখব কী সেখানে আমাদের কমরেড সেগোর এত ভালো লাগল, অথচ সমাজতন্ত্রের জন্যে সে তো চমৎকার খাটে।’

আমাদের ওখানে মঠ ছিল পাহাড়ের ওপরে, আগেকার কালে লোকে সেখানে উঠত ভগবানের আরাধনা করতে, আরেকটা ছিল কিছুটা নিচে, এখনো সেখানে নানা ধরনের অচেতন সব লোক থাকে। সন্ধ্যায় গির্জার ঘণ্টা বাজতেই আমি এই মঠটাতেই গেলাম। গিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি কে এই লোকগুলো, আর খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার দেখলাম।

মানে জানো, ঘণ্টা বাজতেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল সন্ন্যাসিনীরা। বুড়ি বুড়ি সব সন্ন্যাসিনী, মদুখ ভরা রেখা, যেন লেবু, মাথায় মুরগীর মতো ঝুঁটি; তাছাড়া সোমন্ত মেয়েও আছে, রক্তহীন মদুখ, মোমরঙা, বাইবেল পড়ার টেবল বয়ে আনছে, সেটা রাখতেই এল প্রধানা সন্ন্যাসিনী, পড়ছে তো পড়েই চলেছে, পরপারের জন্যে দেখি তার ভারি তাড়া, বুড়ো বুড়ো দাঁত দিয়ে যেন চিঁবিয়ে যাচ্ছে, আর তাকাচ্ছে সবার দিকে। চাউনিটা যখন রাগী-রাগী হয়, তখন ভজন গাইতে শুরুর করে দেয় সবাই।

শোনো তোমায় বলি, আমরা ওসেতিনরা তেমন খৃষ্টান ছিলাম না। পাদ্রীর কাছে খৃষ্ট দীক্ষা নিতে কেউ যেত না। আগের কালে

খৃষ্ট দীক্ষা নিতে গেলেই পাদ্রীর কাছ থেকে পাওয়া যেত দু'টাকা বকশিশ আর পোষাক। আমার দাদু চার বার গিয়ে খৃষ্টান হয়। পাঁচ বারের বার গেলে পাদ্রী তাকে খুব বকে।

আগের কালেও পাদ্রী-মার্কী ভগবানের সম্বন্ধ ভালো ছিল না, আর এখন ওদের ওই ভজন গান শুনতে আর পারছিলাম না।

আমাদের সমবায়ের দোকান থেকে দেশালাই, সিগারেট, সেফটি পিন এইসব বিক্রি হয়, সকালে একদিন সেখানে দেখি এক 'চিনারি' মাছ, রুশীতে বলে 'উসাচ'। পড়ে আছে দোকানের কাউন্টারে, ওঠা-নামা করছে কানকো, চোখে মাছি পড়ছে আর অমনি হাঁ করছে, কী কালো কুরা নদীতে ধরা ওই চিনারি মাছ।

আর এখন চেয়ে দেখি, সন্ন্যাসিনী ঠিক সেই মাছটার মতো কালো হাঁ করছে, হাঁ করছে, নিঃশ্বাস আর নিতে পারে না। ভারি হাসি পেল আমার, ভাবলাম, দেখি তো সেগো কী করছে। দেখি থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর আড়ালে মূর্চক হাসছে। ওকে ইশারা করলাম বেরিয়ে আসতে, ও-ও বেরিয়ে এল, গিয়ে বসলাম আমরা কবরখানায়। ওকে বললাম:

'কমরেড সেগো, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র তো আমাদের নিজেদেরই সিনেমা রয়েছে। এই ধরনের ছবি দেখতে কেন আসিস বল তো। বেশিক্ষণ এ ছবি দেখা খারাপ, গাধা হয়ে যাবি। আমরা খাটছি সংকাজে, আর এখানে, রুশী কমরেডরা যা বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।'

মূর্চক হাসল সেগো, আমায় ঠেলা দিয়ে বলে:

'ওদের দেখতে আসি না, একটি মেয়েকে দেখতে আসি।'

'কোন মেয়ে?'

'ওদের ক্ষতি করতে চাই।'

'কেমন ক্ষতি?'

'একজন সন্ন্যাসিনীকে কমসোমলে ভেড়াব।'

শ্বুনেই হেসে আর্মি কবর থেকে গাঁড়িয়ে পড়ে যাই আর কি। এ একেবারে ভাবতেই পারি নি। মেয়েটাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছিল সেগোঁ, বৈদ্যুতিক কেন্দ্রে আমাদের ওখানে কাজ করত, কাপড় কাচত, আর মোটেই খারাপ কাচত না।

সেগোঁ মঠের জীবন নিচ্ছে বলে তাকে ধমক দিতে চেয়েছিলাম, জনগণের টাকায় দিন কাটিয়ে সাধু হতে চাচ্ছে ভেবেছিলাম, তা নিয়ে পরেও আমরা অনেক হাসাহাসি করছি।

কতরকম ঘটনা হয় জীবনে, বিশেষ করে এখন, কেননা বড়ো একটা কাজের জন্যে জমায়েৎ হচ্ছে বিশাল লোকজন, আর সেখানে দেখাছি বীরত্বে ভরা সব ঘটনা অথচ উল্টোরকমের ব্যাপার।

সেদিন হঠাৎ কেমন ঘুম আসছিল না, মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্বভাবনা হচ্ছে, আবার টাটাতে শ্বরু করেছো কাঁধটা। তীরে বসে আছি। সামনে ছাই-রঙা ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে কুরা নদী, মনে পড়ল আমাদের নদীগুলোর কথা, যেন পাথর-দেওয়া সুপ, আর কিছতেই ভরসা হয় না কুরার ওপর, কিছতেই না।

বসে বসে ওই জল দেখছি আর মনে হয় যেন কার একটা গলা শোনা যাচ্ছে তাতে, আমায় যেন ভেঙাতে চায়, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সেই যে ঘাটের কাছে দেবলা যখন ডুবাছিল, তখনকার চেয়ে আর্মি এখন একেবারেই অন্য লোক। রাজনৈতিক শিক্ষা আমার আছে, মজদুরের কায়দা-কানুন রপ্ত করছি, এ কাজটা শেষ হলে একটা কোর্স নেব ভাবছি, সচেতনভাবে এগিয়ে যাচ্ছি রাস্তা ধরে। কিন্তু এমন মেজাজ আমার কেন, রাস্তায় আড়াআড়ি একটা যেন গাঁড়ি পাতা। কেন এমন হচ্ছে?

অথচ রাতটা বেশ গরম, কী কী কাজ হয়েছে ভাবতে লাগলাম। পাহাড় খুঁড়েছি বিশ মিটার, খাতটার তলাটা এখন ভিজে উঠতে শ্বরু করেছো, কংক্রীট দিয়ে তা বাঁধাই করা দরকার। আনন্দের কথা।

এইসব ভালো ভালো ভাবনাতেই মনটা ভরে উঠল, নদীর দিকে একবার চেয়ে ঘুমতে চললাম। ব্যারাকে গিয়ে কিন্তু ঘুম আর আসে না। তবে দেখা হল সেগের সঙ্গ, সিগারেট ধরিয়ে কথা কইতে লাগলাম, তারপর ঝিম্‌ঝিম ধরল, এমন ঝিম্‌ঝিম যে সঙ্গ সঙ্গই ঘুম এসে গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম, কাজে গেল শুধু রাতের শিফট।

আর এইবার, বন্ধলে কিনা, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটল। প্রথমটা স্বপ্ন দেখাছিলাম, বিছাছিঁরি স্বপ্ন। হাঁটা পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি সামনে ঐসৎসা। ঐসৎসা বলে, ‘তোকে গুলি করেছিলাম, এবার তুই আমায় গুলি কর।’ বললাম, ‘চাই না গুলি করতে।’ বলে, ‘গুলি কর, নইলে তোকে জলে ডোবাব।’ দেখি রাস্তার ওপর জল, হাঁটু পর্যন্ত জল। ঐসৎসা আমায় জলে ঠেলছে, হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছি আমি। চোখ খুলতেই দেখি সেগের আমায় ঠেলছে আর চ্যাঁচাচ্ছে:

‘হাঁটু অবধি জল!’

‘কী হল সেগের, হাঁটু জলে কে?’

কাঁপছে সেগের।

‘সবাই হাঁটু জলে!’

‘সে আবার কী?’

‘কুরা কুল ছাপিয়েছে সিমেন, সবাই ছুটছে সেখানে। কুরায় বান।’

এমন আওয়াজ শুধু হল যেন রেলগাড়ি যাচ্ছে। যারা ব্যারাকে ছিল, যারা কাজে গিয়েছিল সবাই ছুটছে, সবাই কথা কইছে নানান ভাষায়। সবাই ছুটল কেবল একটি বাড়ির দিকে। এখানে থাকতেন আমাদের নির্মাণ কাজের প্রধান কর্তা বাগরাত মিখালিচ। শতক ভাষায় সবাই চিৎকার করছে: ‘একটা উপায় করো বাগরাত মিখালিচ, ওঠো বাগরাত মিখালিচ, উপায় করো।’ আমার চোখের

সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠল ঝগলভের মূর্তি, আমায় সে বলছে, ‘নদীর সঙ্গে লড়াবি সিমন!’ আর আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘বাঁচাও ঝগলভ!’ শুধু একটা শার্ট গায়েই বোরিয়ে এলেন বাগরাত মিখালিচ, আমাদের সঙ্গে ছুটলেন নদীর দিকে।

এবার কুরাকে দেখে বুব্বলাম বেইমানি কাকে বলে। এখন আর সেই ছাই-রঙা ছোট ছোট ঢেউ নেই, গলার স্বর নেই—আক্রোশে একেবারে জ্বলে উঠেছে, দাঁত দেখাচ্ছে, আর আওয়াজ করছে, কী আওয়াজ। কমরেডরা সবাই জলে, যন্ত্রও সব জলে, অন্ধকারে নদীর শেষ আর দেখা যায় না, শোনা যায় কেবল হু-হু আওয়াজ, যেন ঝড় বইছে গুহায়।

বললাম, ‘এই এসেছে প্রতিবিপ্লব!’

কোদাল চেপে ধরে লাফিয়ে নামলাম নিচে, সঙ্গে সঙ্গেই এক কোমর জল। লোকজন যন্ত্রপাতিতে আঁকড়ে ধরছে জল, বাঁধ তুলতে হবে এখানেই।

এই কোথায় কী করতে হবে হুকুম দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে গেল বাগরাত মিখালিচের। সমস্ত লোকে যেন চান করতে নেমেছে, যারা ছিল সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে, মেয়েরাও চলে এসেছে, গিজ্গিজ্ লোকে সবকিছু যেন কালো হয়ে উঠেছে আর সবাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে জলে। পাথর, বালি, মাটি, ডাঙা সব ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে জলে, আর পাথরগুলোর মাঝে মাঝে সে জল হিসিয়ে উঠছে সাপের মতো, মনে হল এ রাতের বুঝি আর শেষ হবে না, একের পর এক ভেঙে পড়ছে বাঁধের দেয়াল আর ঘামে, জলে স্ক্যাপার মতো আমরা ভিড় করতে লাগলাম, হাতে করে পায়ে করে ঠেলতে লাগলাম পাথর, যথাসাধ্য মজবুত করতে লাগলাম বাঁধ। এক বাক্যে সবাই বললে, ‘আসতে দেব না নদীকে!’ কেউ নড়ল না, মস্তো এক জটলায় সবাই কাঁপছে, কষ্ট করছে।

মনে মনে বললাম, ‘গর্দুলিতে তুই মরিস নি সিমন, নদীও তোকে মারতে পারবে না। খাট সিমন! ঐসাগলভ তোর দিকে চেয়ে আছে, লেনিন তোর দিকে চেয়ে আছে, সারা প্রলেতারিয়েত তোর দিকে চেয়ে আছে।’

ভুলে গেলাম কাঁধের ব্যথা, ঘুম, ক্লান্তি — এইভাবেই আমরা কাজ করে গেলাম সারাটা রাত, আকাশ ফরসা হওয়া পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর একটা স্ক্যাপামি পেয়ে বসেছিল আমায়, সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। আর সেই ভয়ঙ্কর ভুলো অবস্থাতেই কেবলি জুগিয়ে যাচ্ছিলাম পাথর, কেবলি পাথর। হঠাৎ সেগো বলে, ‘চেয়ে দ্যাখ ভাই সিমন।’ চাইলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। সেগো কিন্তু ফের বললে, ‘চেয়ে দ্যাখ।’ ফের চাইলাম, কিছুই দেখলাম না। তখন সে আমার হাতটা ধরে তা নামিয়ে আনল আমার পায়ের কাছে, তখন হাতের ছোঁয়ায় চৈতন্য হল যে জল মাত্র হাঁটু পর্যন্ত এমন কি আরো নিচে, তার মানে জিতে গেছি আমরা।

চারদিকে দেখলাম, বেশ ফরসা হয়ে উঠেছে।

সবাই আমরা ঘুমোচ্ছিলাম যেভাবে পাখিরা ঘুময় দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে যাবার সময়, আর শিরার মতো নীল হয়ে ফুলে উঠেছে কুরা, কিন্তু আর কিছু করতে পারল না।

তারপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া শেষ হল। স্টেশন গড়ে জল ছাড়া হল। লেনিনের একটা বড়ো মূর্তি বসানো হল পাহাড়ের মধুখোমধুখি, আলো পেঁাছিল তিফ্লিসে। তিফ্লিসের লোকেদের কাছে সারা রাত হয়ে উঠল দিনের মতো ফরসা। এটা আমরা করেছি।

ছুটি নিয়ে এলাম বাড়িতে, এক জায়গায় বেড়াতে গেছি, দেখি মজদুররা খাটছে, তার মানে এখানেও কিছু একটা গড়া হবে। জিজ্ঞেস করলাম:

‘কী করছ তোমরা?’

ওরা বললে, ‘ঐসখিনভালি পর্যন্ত সড়ক পাতা হবে কমরেড।’

মনে মনে ভাবলাম, ‘দক্ষিণী ওসেতিনরাও তাহলে এবার ভালোভাবে দিন কাটাতে পারবে।’

হঠাৎ আগুন দেখলে ঘোড়ার চোখ যেমন দপ করে ওঠে, তেমনি দপ করে উঠল আমার প্রাণটা। জিনে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম:

‘টানেল হবে তো?’

বলে, ‘তুমি জানলে কোথেকে?’

বললাম, ‘জানি হে, একজন লোক আমায় বলেছে।’

বলে, ‘লোকটা তাহলে কোনো উঁচু কাজে আছে।’

আমি বললাম:

‘আমার বন্ধুর মধ্যে খুবই উঁচুতে, এত উঁচুতে যে বলবার নয়।’

‘কে সে?’

বললাম:

‘আমাদের ভাই, বলশেভিক।’

বলে, ‘ও, তাহলে সব ঠিকই আছে।’

বললাম, ‘আমারও তাই ধারণা, সবই ঠিক আছে।’

ঘোড়দৌড়



দেখতে গিয়েছিলাম ‘এইলাগ’ — গ্রীষ্মের চারণক্ষেত্র, ভারি আগ্রহ ছিল পশুপালকদের জীবনে। রাখালদের সঙ্গে প্রাণভরে আলাপ করে, সংখ্যাহীন পশুপাল দেখে দেখে, যাযাবর ধূনির গন্ধে গন্ধে ভেঁা হয়ে, সমস্ত রাখালিয়া ছাউনির সমস্ত কন্বলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ডাঁশের কামড় খেয়ে, চারণক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে আমি উত্তরের পার্বত্য মাঠ পেরিয়ে রওনা দিলাম সবকিছু ঘোরাঘুরির পর সামুদ্রের অতিথিবৎসল উপত্যকায় বিশ্রাম নিতে।

প্রথমে আমার সঙ্গে ছিল কেবল একজন রাখাল, পাশের আউল পর্যন্ত পেঁাছে দেবার কথা ছিল তার। পরে দু’জন সওয়ারীকে ধরে পরের দিন একসঙ্গে রওনা দিলাম।

একজন সওয়ারী ছিল গাঁটাগোড়া বড়ো, বড়ো বড়ো পকেটওয়ালা একেবারে লোম-ওঠা পশমের কুতর্া, শিকারীদের মতো। টুপিটা কপালের ওপর টেনে নামানো। ভাবখানা গম্ভীর, এমন রোদপোড়া যে প্রায় কালো, কড়া, ছাঁটা-ছাঁটা মোচ, স্বল্পবাক, ঘোড়া চালায় খাঁটি পাহাড়ীর মতো।

নাম তার তেরেস্তিয়েভ। সেচ বিভাগে কাজ করে। ককেশাস সে পাড়ি দিয়েছে এমুড়ো-ওমুড়ো, এপাশ-ওপাশ। এমন সহযাত্রীর সঙ্গে পর্যটন আনন্দের কথা।

যেকোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার বা জীবনযাত্রার রীতি সে বোঝাতে পারত, এবং অনিবার্যই নিজস্ব অভিজ্ঞতার নজির দিয়ে। অবিশ্যি প্রায়ই আমরা ঘোড়া ছোটাতাম জোরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাহিনী থেমে যেত।

আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছিল মস্কারাবাজ এক ছোকরা, তাকে সে ডাকত শূধু সাফার বলে। পাহাড়ী হলেও পরনে তার কোট প্যাণ্ট, উঁচু হাই-বুটে প্যাণ্টের নিচু দিকটা গোঁজা। যখন সে বলত যে ধাতু-কর্মী হতে সে পারে নি, পশু টেকনিশিয়ান হতে হয়েছে — কেবল তখনই মুখটা তার কালো হয়ে উঠত, চোখ দুটো দেখাত বিষম। আর এই একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া লোকটা ছিল ভারি ফুর্তিবাজ, নিজের ধূসর দাগওয়ালা শাদা ঘোড়াটা নিয়ে বড়াই করত খুব।

এক ডেরায় আমাদের সঙ্গে জুটল পঞ্চম সহযাত্রী, ক্লান্ত এক মিলিশিয়া-ম্যান, মুখে না-কামানো পার্টিকলে দাড়ি। একজন যোঁথখামারীর ঘোড়া চুরির ব্যাপারে তাকে যেতে হয়েছিল শীতকালীন ঘাঁটিতে, সেখান থেকে ফিরছে। ঘোড়ার ব্যাপারটার কোনো কিনারা হয় নি, তার ওপর ঠান্ডা লেগেছে, অসুস্থ বোধ করছে, কাশত জোরে জোরে, মাঝে মাঝে ধূর্ত ঘোড়া-চোরটার বাপান্ত করত। বাকি সময়টা সে সিগারেট খেত আর নিজের মিলিশিয়া-সংক্রান্ত ভাবনা ভাবতে ভাবতে চুপচাপ তার অসম্ভব রোগা খাসি-ঘোড়াটার প্রকাণ্ড মাথা থেকে ডাঁশ তাড়াত চাবুক দিয়ে।

এখানকার মাঠগুলো এতই উঁচুতে যে বলা যায় আকাশ ছোঁয়া। ঘাসগুলো নানা মাপের। কখনো কয়েক ইঞ্চি, কখনো ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত, কখনো আবার সওয়ারী মাথা ছাড়িয়েও এতটা উঁচুতে যে হাত তুলে ডগার নাগাল পাওয়া যাবে না। দুর্বোধ্যরকমের সুন্দর এ মাঠের গন্ধ, আর পাহাড়ে সূর্যের তাপ সরে যেত অদূরের তুষার-ঢাকা চূড়া থেকে আসা দমকা হাওয়ায়।

কয়েক ঘণ্টা যাত্রার পর একটা সূর্যচিহ্নিত পথ-রেখা ধরে আমরা পেঁছাই উপত্যকায়। অপূর্ব তার শোভা। ঘোড়াগুলোকে আমরা ডিমে তালে হাঁটাতে লাগলাম সবুজ গালিচার মধ্যে দিয়ে, বিস্তৃত

তা পাথর নুড়ি ভরা পাহাড়তলিটা পর্যন্ত। ওপরে মাথা তুলেছে হলদেটে লালচে পাহাড়। এমন অদ্ভুত আকারের সব শিলাস্তূপ বোরিয়ে এসেছে তাদের গা থেকে যে দেখে কেমন একটা মর্মাস্তিক আনন্দ বোধ হয়। তাদের খাঁজগুলোয় আলো ছায়ার খেলায় প্রতি মূহুর্তেই ফুটে উঠছে অভূতপূর্ব সুন্দর আর কদাকার, শ্বাপদ আর দানব কিংবা নিতান্ত পরিচিত কোনো ব্যক্তির পার্শ্বচিত্র। মনের সমস্ত ভাবনা এখানে রূপ নিতে পারে এই পাথরের মূখোস-প্রহসনে, কল্পনাকে তা অতি হাস্যকর ভেঙিচি কাটবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলাটা চললেও চোখ ক্লান্ত হয় না, পালা-বদলগুলো এতই বিচিত্র আর স্বাভাবিক। উদিত অপছায়াদের একটা সশঙ্ক প্রাণময়তার খবর দিচ্ছিল ফিরোজা আকাশের পটে লঘু আঁচড়ে আঁকা উষ্ণ মাংস-বর্ণের লালচে পাথরগুলো, মনে হবে যেন সত্যিই এসে পড়েছি এক নতুন প্রকৃতিরাজ্যে, সে রাজ্য কখনো দেখব বলে ভাবি নি, অভ্যস্ত যে প্রকৃতিরাজ্যে মন বহুদিন নির্বিকার হয়ে উঠেছে তার চেয়ে এটা অনেক বলিষ্ঠ আর অপরূপ।

মাঠের সবুজ গালিচার ওপর নকসার মতো পড়ে আছে নরম সুপ্রসর ছায়া, চলে গেছে তা মাঠের খাদটা পর্যন্ত, অনেক নিচে সেখানে চিকচিক করছে নদী, কল্লোল তার আমাদের কান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে না।

কেমন একটা উদ্ভিন্ন ব্যাখ্যাভীত ভাবাবেগ পেয়ে বসল আমায়, হঠাৎ কলম নিয়ে কী জানি কেন লোকে যখন কবিতা লিখতে বসে অনেকটা সেইরকম।

মাথার ওপরে আমার নীলাভ আতপ্ত দিনের জ্যোতি, উঁচু আকাশ, বরফ-ঢাকা চুড়ো, অব্যাহত প্রসার, আর এসবের সঙ্গে একান্ত সম্পর্কহীন একটা কবিতা ভেসে উঠল আমার স্মৃতিতে। কে যেন আমায় অতীতের কী একটা মনে করিয়ে দিয়ে আমার কানে কানে বলে চলেছে:

দিনের কাজের বোঝা রাখবার...
দিনের কাজের বোঝা রাখবার...
দিনের কাজের বোঝা রাখবার...

আবিষ্কের মতো পণ্ডিতটা আমি আবৃত্তি করে চললাম বার বার, কিছু না ভেবে-চিন্তে অনির্দিষ্টের মতো বিড়বিড় করলাম কবিতাটা। কেশর ঝাঁকিয়ে ঘোড়াটা হেঁটে চলেছে। রেকাবের শব্দে, জিনের ক্যাঁচকেঁচে, ঘোড়ার ফোঁসফোঁসে ভেসে উঠল আরেকটা কবিতা, প্রথমটার সঙ্গে তার যোগ নেই:

গুলির আওয়াজে দ্ব'কান পেতে...

গুলির কোনো শব্দই শোনা যায় নি। দরদী উপত্যকাটার সবকিছুই শান্ত, চুপচাপ, আর যেন-বা পাহাড়ের গভীর থেকে ভেসে আসা, নয়ত-বা সুদূর নদীটার ঝিলিমিলি আর মাঠের নেশা-লাগানো গন্ধে জন্ম নেওয়া এই ছদ্মদৃটো কেবল ঝংকার দিতে লাগল আমার মাথায়।

মনে পড়ল না লাইন দুটো কার লেখা, কীই বা তাদের মধ্যে যোগাযোগ। প্রচণ্ড একটা উর্ধ্বশ্বাস গতির বাসনা হল আমার। চাবুক কষলাম ঘোড়ায়। দল ছেড়ে সে সামনে লাফিয়ে গিয়ে, কান মৃদে, লাগামের কড়া কামড়ে ছুটল কদমে। তখনো ভালো করে দম নিতে পারি নি, কদমে ছোট্ট সময় কানে যে শনশন শব্দ শোনা যায়, সেটা তখনো জাগে নি, দেখি বিস্ময়িত চোখে ঘোঁৎঘোঁৎ করা একটা মৃৎ। সাফারের ঘোড়া।

মুহূর্তের মধ্যে সাফার এসে আমার সঙ্গ ধরলে, সহযাত্রীদের অনেক পেছনে ফেলে ছুটলাম আমরা। এমন ধাবনের ভারি একটা মাধুর্য আছে। প্রাণ মাতানো ব্যাপার। বলে রাখা ভালো যে ওটা বিশেষ নিরাপদ নয়, পাহাড়ে মাঠের ঘাসের মধ্যে পাথর আছে অনেক, তাছাড়া পথ-রেখাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে কী যে আছে জানা নেই। একবার আমরা হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ি সোজা

একটা ছোটো নদীতে, আমার গায়ে একরাশ জল ছিটিয়ে ঘোড়া ছুটে যায় অপর পাড়ে, পেছনে তার খসে পড়তে থাকে নর্দী-পাথর; আরেক বার একটু হলেই গিয়ে পড়তাম একটা চোরা জলায়। কিন্তু ছোটো থামানোর ইচ্ছে হচ্ছিল না...

ফিরে চাইলাম। পেছনে আমাদের ছুটে আসছে তেরেস্তিয়েভ আর পশুপালকটা, এমন কি মিলিশিয়ার লোকটার বড়ো ঘোড়াটাও তার অতীত দিনের কথা ভেবে ছুটছে প্রাণপণে। সামনে কেউ ছুটতে থাকলে পাহাড়ে ঘোড়ারা সহিতে পারে না। সওয়ারের ইচ্ছা অমান্য করেই নির্ঘাৎ প্রতিযোগিতায় নামবে তারা, ঠান্ডা করতে অনেক বেগ পেতে হয়।

গতিতে মাতাল হয়ে এইভাবেই ছুটতে লাগলাম আমরা। ভিজ়ে উঠল ঘোড়ার গা, ফোঁসফোঁস হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত। আমি ছুটছিলাম ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর সামান্য ঝুঁকে, পা দুটো দিয়ে ওর পেটটা জোরে চেপে, আর সামনে আমার চিহ্নিতের মতো ছুটতে লাগল ওই লাইন দুটো, শুকনো ঠোঁটে যা আওড়াচ্ছিলাম: ‘দিনের কাজের বোঝা রাখবার... গুলির আওয়াজে দু’কান পেতে।’

ধাবনের ছন্দের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছিল, এমন কি দ্রুত ক’রে তুলিছিল তার তাল। অদ্ভুত শিলাস্তূপগুলো কখনো বলক দিচ্ছিল ডান দিক থেকে, কখনো বা কাছিয়ে আসছিল সামনে, কখনো আবার দূরে সরে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা ঘোড়ার গতি কমাতে কমাতে হাঁটার মাদ্রায় নামিয়ে আনলাম, কয়েক মিনিট চললাম চুপচাপ। ফের সারি জুড়ে উঠল। কে জানে কোথেকে ওই যে উদ্বেগটা পেয়ে বসেছিল, ছোটোছুটিতে তা কেটে গেছে।

মস্তো এক নীল রুমালে কপাল মুছে তেরেস্তিয়েভ বললে ভৎসনার সুরে:

‘এমন ঘোড়া ছুটানি কেন বাপু? একেবারে খামোকা... কোনো দরকার থাকলে নয় কথা ছিল। সব এই তোর কান্ড সাফার,’

ঝোঝা গেল ওটা বললে আমার প্রতি সৌজন্যবশে, কেননা আমিই
যে প্রথম শব্দ করছিলাম, সেটা ওর চোখে না পড়ে পারে নি।

খব্দু ফেললে সাফার, চাবুক দিয়ে গা চুলকালে, তারপর হেসে
উঠল:

‘তুমি যে বড়ো গো, বেরোয়া তো নও, কী বড়াবে?.. তোমার
ঘোড়া ছুটিয়ে লাভ কী — তুমি হলে কাজের লোক।’

‘আর তুই হাঁলি এশীয়,’ কড়া করে বললে তেরেস্তিয়েভ।

‘আমাদের লেজগিন ভাষায় এশীয় মানে কী জানো? এশীয়
মানে কঠিন, আর আমরা চাই গায়ে ফুঁ দিয়ে দিন কাটাতে। কষো
চাবুক, মারো ছুট,’ ঠাট্টা করে চাবুক হাঁকালে সে।

মিটমাটের জন্যে আমি বললাম, ‘কদমে ছোটানোর খুবই দরকার
আছে। ফোঁজে নিয়ম আছে, অভিযানের সময় মাঝে মাঝে কদমে
ছুটতেই হবে। গা ঝাড়া দিয়ে ঘোড়াকে চাপ্সা করিয়ে নেওয়া
দরকার।’

‘তা হয়ত হবে,’ এড়িয়ে-যাওয়া জবাব দিলে তেরেস্তিয়েভ,
‘ফোঁজের ঘোড়া অন্যরকম।’

নিজের ঘোড়াটাকে সে চালাতে লাগল আমার পাশে পাশে।
হঠাৎ সে দ্বন্দ্বু-দ্বন্দ্বু হেসে দূরে একটা ছোটো পাহাড়ের ছেদের
দিকে দেখালে।

সেখানে ধাপে ধাপে মাঠ নেমে গেছে নদীতে, সরু সরু অসংখ্য
পথ-চিহ্নে তা আকীর্ণ। এইসব পথ-রেখা বেয়ে জন্তুরা নামে জল
খেতে।

‘ওই দিকে চেয়ে দেখুন, বড়ো পাথরটার বাঁয়ে, কুকুর দেখতে
পাচ্ছেন?’

চোখের ওপর হাত আড়াল দিয়ে চাইলাম। সত্যিই একটা কুকুর,
টিপক্যাল পাহাড়ী চোঁকি কুকুর — কখনো কখনো তা ঢাল
বেয়ে সমানে ওপরে উঠে যাচ্ছে, কখনো পড়ে থাকছে মাটিতে,

পথ রেখার পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে নিচে, আবার খরবেগে উঠছে ওপরে, ফের শূন্যে পড়ে থাকছে নিশ্চল হয়ে।

জিঞ্জের করলাম, ‘কী ব্যাপার?’

‘এবার ওপরে, পাথরটার ডান দিকটায় চেয়ে দেখুন,’ বললে তেরেসিয়েভ। যে দিকটায় ও দেখালে, সেখানে চোখে পড়ল একটা দীর্ঘ ধূসর ছোপ। পরে ঠাহর করা গেল একটা পাল চলেছে। যেমন উঁচুত, পালের সামনে একটা মর্দা ছাগল, তার পেছনে খুঁটখুঁটিয়ে চলছে ছাগীরা, তাদের পেছনে ভয়ানক ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে ভেড়ার পালের ধূসর কুন্ডলীগুলো।

রাখাল ছাড়ি দোলাচ্ছে তাদের ওপর। কুকুরগুলো পালের আশেপাশে সামনে পেছনে ছুটোছুটি করে খাদের দিক থেকে তাড়িয়ে আনছে ভেড়া। কোনো কোনো কুকুর ছুটে যাচ্ছে আগে, দাঁড়িয়ে বাতাস শুকছে, পালটাকে চলে যেতে দিচ্ছে পাশ দিয়ে তারপর আবার ছুটে যাচ্ছে সামনে।

অন্যদিকে ওই একলা কুকুরটা পালের যাবার পথের মাঝখানে পড়ে গিয়ে খুবই জটিল কতকগুলো চাল মারছে যাতে অন্য পালের কুকুরদের চোখে না পড়ে।

ঘুরপাক খাচ্ছিল সে, বায়ুস্রোতের বিপরীতে, শূন্যে পড়ছিল পাথরটার পেছনে, মাথা বাড়িয়ে নজর রাখছিল শত্রু কতটা কাছিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত তার নিজের চালের সঠিকতায় নিশ্চিত হয়ে একলাফে অবাক হয়ে থমকে পড়া কুকুরগুলোর নাকের সামনে দিয়ে গিয়ে পড়ল পাশের টিলাটায়। কুকুরগুলো তার পথ আটকাতে পারল না।

শূরু হল প্রচণ্ড ঘেউঘেউ, গজরানি, কুকুরটা কিন্তু লেজ ঝাঁকিয়ে ততক্ষণে চলে যেতে শূরু করেছে, ফিরেও চাইলে না।

তেরেসিয়েভ বললে, ‘দেখলেন? ওই কুকুরটা এখানে জল খেতে এসেছিল একা। অন্য পালের ওই কুকুরগুলোর সামনে যদি পড়ত,

তাহলে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কিন্তু পালাল কেমন, সাবাস! তাই না? এইসব কুকুরগুলোর কোনো কোনোটা নেকড়ের ওপর হামলা করে একা-একা। একবার আমায় ঘোড়া থেকে প্রায় টেনে ফেলিছিল আর কি, প্রাণপণে ঠেকাতে হয়েছিল,’ একটু চুপ করে রইল সে, তারপর কোনো প্রসঙ্গক্রমিকতার পরোয়া না করে বললে, ‘এখানে এই পাহাড়ে এখনো অনেক কিছুই চলে সহজাত ঝোঁকে। নিজেদের বেশ বদলে শহুরে পোষাক ধরছে পাহাড়ীরা, সঙ্গে ছোরা ঝোলানো ছেড়ে দিচ্ছে, কোটের সঙ্গে তরোয়াল একটা বিদ্যুটে ব্যাপার, আর রুচিবোধ ওদের জন্মগত, তাই কোটের সঙ্গে পরছে ছোরা...’

ওর কথা শুনছিলাম খুবই অন্যমনস্কের মতো, ভাবিছিলাম লাইনদুটো কার: ‘গুলির আওয়াজে দু’কান পেতে... দিনের কাজের বোঝা রাখবার...’ অন্যের কথা কইছিল লেজিগিন ভাষায়। রাখালটা জিনের ওপর পেছনে হেলে হাসছিল হো-হো করে। সাফার আত্মতৃপ্তির মতো মূর্চকি হাসিছিল, এমন কি মিলিশিয়ার লোকটার মুখেও ঝলক দিচ্ছিল খুশির উদ্ভাস।

কী একটা নাম শুনলাম যেন, রাখাল সেটার পুনরাবৃত্তি করার পর হেসে উঠিছিল সবাই। মনে হল যেন বলছে: ‘আইশে, আইশে’, কিন্তু নিশ্চিত নই।

আলতা-রঙা বাঁটওয়ালো একটা মেটে পাইপ থেকে আকাঁড়া তামাকে টান দিয়ে তেরিস্তিয়েভ বলিছিল, ‘এই সাফারকে ধরুন না কেন, বেপরোয়া ছোকরা, একটু খেয়াল না রাখলেই স্ট্রেফ গিয়ে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ছোটো থেকেই ওকে চিনি তো... এখানকার সব পাহাড়ই চষে বোরিয়েছি।’

কিন্তু আমি ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, যার কথা বলছে সেই আইশেটি কে? একটু অবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে, তারপর ওদের আলাপটা খানিক শূন্যে বললে:

‘সাফারকে নিয়ে রাখালটা হাসাহাসি করছে; আমরা যে গাঁয়ে যাচ্ছি সেখানে একটি মেয়ে আছে, আইশে, সাফারের জন্যে হেঁদিয়ে মরছে, আর কাউকে বিয়ে করতে চায় না, কারো সঙ্গে আড্ডা মারে না, আর সাফারের মা ওঁদিকে মিষ্কিঞ্জিতে ওর জন্যে কোন এক ট্যারা কন্যে জুটিয়েছে, সাফারও বুনো পাঁঠার মতো যেখানে খুঁশি বেলেল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে। তাই ওর কাণ্ড নিয়ে সব চুটকি গল্প করছে ওরা, মাপ করবেন, মুখে আনা যায় না...’

মস্তো একটা গাঁয়ে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, দিন তখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। এখানেই আমাদের রাত কাটাবার কথা। কিন্তু পাহাড়ে আবহাওয়া এমনতেই খামখেয়ালী, এখন তা এমনই খারাপ হয়ে উঠল যে গাঁয়ের বদলে দেখলাম কেবল একটা বিরাট ধূসর মেঘ, সমস্ত ঘরবাড়ি তাতে নিশ্ছিদ্রে ঢাকা পড়েছে। কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না, হাঁটিছিলাম যেন দুধের মধ্যে।

মেঘের মধ্যে কোথাও কোথাও ভেসে উঠছিল বারান্দার থাম, চালার একাংশ, পাথরের দেয়াল, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল নিশ্চিহ্নে।

‘আমি এখানে একটা লোকের কাছে চললাম,’ বললে তেরেস্তিয়েভ, ‘দেখা হবে ইশকুলে, সেখানেই সম্ভবত রাত কাটাব।’

ছাড়াছাড়ি হল আমাদের। আমি রয়ে গেলাম সাফারের সঙ্গে, আর তেরেস্তিয়েভ, রাখাল আর মিলিশিয়ার লোকটা রওনা দিলে আরেকটা চড়াইয়ে।

আমাদের ঘোড়াগগুলো যাচ্ছিল মাথা নামিয়ে, মাটি শব্দকে শব্দকে পা ফেলছিল। থেকে থেকে সরে যাচ্ছিল কুয়াশা, সেই ফাঁকে আমার চোখে পড়ল আমাদের নিচের দিকে একটা চত্বরে, কাঠগাদার কাছে অদ্ভুত এক জীব। মাথায় তার একটা শাল, তার প্রান্তের এলোমেলো ঝালর নেমেছে কোমরের নিচে, কাঁধে ওয়েস্ট-কোটের

মতো একটা জিনিস, পরনে লাল ফোঁজীদের শীতকালীন পোষাকের মতো তুলোট প্যাণ্ট, পায়ের গোছের কাছ থেকে শব্দ হচ্ছে। প্রায় মাটি পর্যন্ত লম্বা একটা তুর্কী পাইপ টানছিল সে।

‘কী এটা?’ সাফারকে দৃশ্যটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ফিরিয়ে সাফার বললে:

‘ও একজন গিনি। এখানকার সব গিনিই ওইরকম পোষাক পরে। তাতে সর্বাধিক। জায়গাটা বরাবর ঠান্ডা। আবহাওয়াটা যতসই নয়...’

ঘিরে এল কুয়াশার একটা নতুন তরঙ্গ। ঠান্ডা, চ্যাটচেটে, একেবারে বিশ্রী। ঘোড়াগুলো ক্রমাগত পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছিল। যাচ্ছিলাম সরু সরু রাস্তা দিয়ে, খুব সাবধান থাকতে হচ্ছিল, কে জানে কখন একটা এগিয়ে আসা কোণ, খিলান কি নিচু বারান্দা পড়বে, তখন বেঘোরে মাথা ভাঙবে।

শেষ পর্যন্ত কী একটা চওড়া চত্বরে পৌঁছলাম, এখানে বাতাসের ঝাপটায় পর্দার মতো সরে গেল কুয়াশা, কিছুর না ভেবেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামলাম আমি। সাফারও তাই করলে।

সামনে আমার বাড়ি বরাবর বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। ব্যাপারটা যদি পাহাড়ে না ঘটত, তাহলে এতটুকু আশ্চর্য হতাম না আমি। কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে, শহর থেকে বহু দূরের এক পাহাড়ী গ্রামে, একেবারে হিমপ্রপাতগুলোর কাছে, মেঘের ওপারের এক বারান্দায় একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে একটি ছিপছিপে মেয়ে, এমন বিচিত্র তার লালিত্য যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিহবল হয়ে গেলাম আমি। এত সে আমার কাছে যে চাবুক বাড়িয়ে তার পা ছোঁয়া যেত।

পান্ডুর স্বচ্ছ মেয়েটির মদ্য, একেবারেই আবহাওয়া-রুদ্ধ নয়। হালকা, সামান্য অন্ধকৃষ্ণ ভুরুর, সরু ঠোঁট, চোখে কেমন একটা উপেক্ষা আর সেই সঙ্গে প্রভুত্বব্যঞ্জক অহংকার। পরিপার্শ্বের সঙ্গে

তার এমনি একটা বৈষম্য যে কোনো কথা না বলে বোকার মতো অস্ফুটে কী একটা বিড়বিড় করে উঠেছিলাম।

পরনে তার আটপোঁরে ধূসর পোষাক, ঘাড়ে ফুঁয়ো-ফুঁয়ো একটা শাল। বাদামী রঙের অপ্রসর কোমরবন্ধ। খাটো হিলের শস্তা জুতো।

শেষ পর্যন্ত আমার বিহ্বলতা কাটিয়ে বললাম:

‘একেই বলে সুন্দরী। এখানে এলেন কোথেকে?’

গলার স্বরে কোনোরকম উষ্ণতা ছাড়াই মেয়েটি উপহাস করে বললে:

‘ইচ্ছে হল চলে এলাম।’

‘কিন্তু এলেন কোথেকে?’

‘এখান থেকে জায়গাটা দেখা যাবে না।’

‘নাম কী আপনার?’

‘নাম জেনে কাম কী? লাভ নেই তাতে।’

‘এইখানে থাকবেন ঠিক করেছেন?’

‘তাতে এমনটা কী আর হল? জায়গাটা ঠান্ডা, আমিও ঠান্ডা ভালোবাসি, নিজেও আমি উষ্ণ স্বভাবের নই।’

‘কেমন শীত এখানে জানেন? সবাই চলে যায় নিচে আজারবাইজানে, এখানে কেবল বরফ জমে, বরফের নিচে থাকে কেবল বড়োবুড়ি আর বাচ্ছারা, গালিচা বোনে মেয়েরা। বসন্ত পর্যন্ত কোথাও যাবার উপায় থাকবে না...’

হঠাৎ হাসল মেয়েটি, রক্তিমভা ছাড়িয়ে পড়ল মৃদু, চোখ তার হেসে উঠল, বললে:

‘আমার তাতে বয়েই গেল। লোকে থাকে, আমরাও থাকব...’

‘কী করেন এখানে?’

মৃদুখানা তার কালো হয়ে উঠল, প্রায় রাগতভাবেই বললে:

‘কিছুই না। স্বামীর সঙ্গে শব্দই।’

‘জিবে আপনার বেশ ধার আছে দেখছি।’

‘যেমন জন্মেছি তেমনি। এখানে আপনারা থামলেন কেন? আপনাদের বরণ করতে তো আমি বেরিয়ে আসি নি। যেখানে যাচ্ছেন, চলে যান...’

‘আচ্ছা, ইশকুলে যাব কোন দিক দিয়ে?’

‘ইশকুলে যাবেন?’ ঘুরে গেল সে, আমিও তার হাতের ইঙ্গিত অনুসরণ করে ঘোড়া ফেরালাম, তাকালাম সাফারের দিকে। চোখ কদুচকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে সে তাকিয়েছিল আমাদের অপরিচিতার দিকে, ফুতিবাজ, আত্মসন্তুষ্ট সাফারের যেন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপের কৃপা না করে মেয়েটি দেখাল ওপরের রাস্তার দিকে, ‘ওই দিকে চলে যান, পাথরের বেড়া পাবেন, আরেকটু উঁচুতে ডান দিকে ইশকুল...’

সাফারের ঘোড়ায় চাবুক মারলাম আমি, সেও চমকে উঠে এগিয়ে চলল। সশব্দে হেসে উঠল মেয়েটি, সাফার যেন হঠাৎ জেগে উঠল। মাথায় টুপিটা ঠিক করে সে এমন জোরে চাবুক মারলে যে তার শ্বেত-ধূসর ঘোড়াটা খাড়া হয়ে উঠল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম আমরা, চমৎকার মনে রইল শব্দ মেয়েটির এই কারুকাজ করা থামওয়ালা বারান্দা আর বাড়িটার কথা।

ইশকুলটা ফাঁকা, ঠান্ডা। একটা ঘরে ডেস্কগুলো সব গাদা করে জড়ো করা, মেঝের ওপর পা গুলিয়ে বসেছে ফ্ল্যানেলের মিহি কম্বল জড়ানো দুটি মেয়ে, ডোরা-কাটা কামিজ কে এক রোগাটে ছোকরা প্রাইমাস স্টোভ জ্বালাচ্ছে, নীলাভ ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে।

তাদের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঢেঙা রোগা একটি পাহাড়ী মেয়ে, গায়ে ঢোকায় সময় যে অদ্ভুত জীবটিকে দেখেছিলাম, তারই

মতো তার পোষাক। পোষাকটা এবার আমি দেখলাম মন দিয়ে, বলতে কি, ভালোই লাগল। এই সবজেটে তুলোট লাল ফোঁজী প্যান্ট, পায়ে কালো ভারী পদুৰুশালী জুতো, শাদা কার্মিজের ওপর নীল মখমলী জ্যাকেট, তার ওপর বড়ো বড়ো পদুরনো রুপোর মুদ্রার এক পদুরো ভাণ্ডার, তার মধ্যে স্তূফান বাতোরির পার্শ্বাচিত্র সমেত মুদ্রাও চোখে পড়ল। প্রান্তে ঝালর দেওয়া শাল গৌঁজা কোমরবন্ধে। শব্দ হাতে তার লম্বা পাইপ নেই। এবং কিছুই বলিছিল না, বললেও কিছুই বুঝতাম না।

নির্বিকারভাবে সে দেখাছিল পাতলা কম্বলের তলে কুঁকড়িসুঁকড়ি মেয়ে দুটোকে, স্টোভ জ্বালাতে তন্ময় ছেলেটাকে। আমার কাছে মনে হল সে যেন এক নীরবতার রোজ প্রতীমূর্তি, কিছুতেই যা সঞ্জীবিত হবে না।

দেখা গেল মোটেই তা নয়। সাফারকে দেখামাত্রই তার রোজ মূখ জ্বলজ্বল করে উঠল, বড়ো বড়ো হয়ে উঠল চোখ। হাত নেড়ে সে ছুটে গিয়ে সাফারের হাত ধরল, এক দমকে কথা কয়ে গেল অজস্র, বোঝা গেল খুবই বুক ভরা কথা। সাফার কিন্তু রুঢ়ভাবে তার হাত ছাড়িয়ে নিলে, প্রায় ঠেলেই দিলে উপেক্ষা আর অপমান করে।

তার ভ্রুকুটিত কপাল আর গোমড়া চোখ দেখে মেয়েটি কেঁপে উঠে করুণ স্বরে কী বলে চলে গেল জানলার দিকে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে সে ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, কাঁধটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল, মুখখানা তাকিয়ে রইল কুয়াশার দিকে, ততক্ষণে সে কুয়াশা গোটা গ্রামকে আগের চেয়েও ঘন করে ঢেকে ফেলেছে।

‘আপনারা পর্বতারোহী,’ জিজ্ঞেস করলাম ছোকরাটিকে, প্রাইমাস স্টোভ ছেড়ে সে তখন ন্যাকড়ায় হাত মুছছিল।

ঠান্ডায় দাঁত ঠক্ঠক্ করে হেসে উঠল মেয়ে দুটি।

‘আমাদের সবকিছুই হতে হয়, কেননা আমরা হলাম ভূতাত্ত্বিক।

আজ আমরা হিমবাহের কবলে পড়েছিলাম, এখনো পর্যন্ত গা গরম হয় নি, পড়ে গিয়েছিলাম তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে।’

‘আপনাদের গোটা দলটাই এখানে?’

‘না, মিশকা আর ইউরা অন্য একটা সম্মানক্ষেত্রে থেকে গেছে। রাতের আগে না ফিরলে খুঁজতে যাব।’

‘খুঁজে বার করা খুব কঠিন কি?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘না, তেমন নয়, শুধু ভারি ঠান্ডা, একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের ঠান্ডা। হতচ্ছাড়া স্টোভটাও বিগড়েছে। আমরা এংকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,’ পাহাড়ী মেয়েটার পিঠের দিকে দেখাল ওরা, ‘অন্তত একটা জোব্বা কোথায় পাওয়া যায়, কিন্তু একটা রুশী কথাও ও বোঝে না।’

এই সময় সশব্দে ইশকুলে এসে ঢুকল তেরেস্তিয়েভ, রাখাল আর অচেনা কে একজন পাহাড়ী। তেরেস্তিয়েভ তাকে ডাকছিল আহমেত বলে।

তেরেস্তিয়েভকে বললাম, ‘শুনুন, আপনি এখানে নিজেদের লোক। মিছিমিছি ঠান্ডায় মরছে এই ছেলেমেয়েগুলো। কম্বল কি জোব্বা জোগাড় করে দিন না...’

আহমেতকে লেজগিন ভাষায় কী বললে তেরেস্তিয়েভ, সে ডাক দিলে:

‘আইশে!’

আইশে জানলা থেকে ফিরে, বুকের ওপর হাত জড়ো করে আহমেতের বস্তব্য শুনলে তারপর কোনো কথা না বলে, কারো দিকে না চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তেরেস্তিয়েভ আমায় অনুবাদ করে জানাল যে, ভূতাত্ত্বিকদের জন্যে ওকে কিছু এনে দিতে বললে আহমেত। তারপর সে স্টোভটার কাছে বসে স্কাই দিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে, ঝাঁকাল, স্টোভও হঠাৎ গোঁ-গোঁ করে উঠল একেবারে নতুনের মতো।

‘আমি সব পারি,’ ফুতির সুরে বললে সে, ‘এসব জিনিস আমায় ভয় পায়। কত স্টোভকে যে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই...’

দুটো গরম জোব্বা আর একটা ধূসর কম্বল টানতে টানতে এল আইশে। মেয়েদুটি জয়ধ্বনি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোব্বার ওপর।

মেয়েদুটি উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল ওরা মাথায় লম্বা নয়, স্কাটাম গড়ন, চটপটে। কালো নলওয়ালা একটা কেটলি চাপল স্টোভে, ঘরখানা হয়ে উঠল সামান্য আরামপ্রদ, যদিও সেটা মনে হওয়া মাত্র।

আসলে আমার মনে হচ্ছিল, এত ঠান্ডা যে এখুনি বরফ পড়বে, জানলার বাইরে একটা শ্বেত তমসা।

তেরেস্তুয়েভ বললে, ‘আমরা যাচ্ছি আহমেতের ওখানে, আর তোমাদের যদি কিছু দরকার হয় সেখানে আমার খোঁজ করো। আইশে, সাফার এসেছে বলে খুব খুশি তো?’ হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে ব্রোঞ্জের মেয়েটিকে, আবার সে প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে।

প্রশ্নটা সে আবার করলে লেজগিন ভাষায়। ঠোঁট চেপে একটা দীর্ঘ বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করে আইশে বেরিয়ে গেল।

‘দেখ কান্ড,’ অবাক হয়ে বললে তেরেস্তুয়েভ, ‘অতিথি নিয়ে এলাম ওর কাছে, আর উনি পাছা ঘুরিয়ে পিটটান। সাফার, কী করেছিস বল তো, কী দোষ করেছিস? ও বাবা! এও যে দেখি মনমরা। এরও মেজাজ খারাপ, ওরও মেজাজ খারাপ। দুঃখ আর কাকে বলে... ভাবনা নেই, কেটে যাবে... হয় এরকম।’

কিন্তু সাফার ফোঁস করে কী জবাব দিলে লেজগিন ভাষায়, তাতে তিনজনই হেসে উঠল। বন্ধুলাম বরাবরের মতোই সে একটা খিস্তিবাচক স্ক্রল রসিকতা করেছে।

বেরিয়ে এলাম আমরা ইশকুল থেকে। আমাদের পেছন পেছন ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসছিল কয়েকটা ছেলে। যাচ্ছিলাম আমরা কী একটা সরু রাস্তা ধরে, বাদামী কুহেলীতে কিছুই প্রায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। তেরোঁস্তিয়েভ কেবলি আমায় বলছিল:

‘কোথায় পা ফেলছেন খেয়াল রাখবেন, শালার কী যে এখানে নেই...’

‘কমরেড তেরোঁস্তিয়েভ, গায়ে ওই রুশী মেয়েটি কে? ওকে আমরা দেখেছিলাম টোকার মূখে।’

‘রুশী?’ জিজ্ঞেস করলে ও, ‘ওরা তো ভূতাত্ত্বিক। ওদের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন?’

‘আরে না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, ধূসর ড্রেস, মাথায় শাল, বাইরেরকার লোক।’

‘ও, কিছুদিন হল একজন অ্যাকাউন্টেন্ট এখানে এসেছে গালিচা সম্বায়ে। টাকা কামাবার মতলব, তবে এখানে মূর্শকিল আছে। মেয়েটি নিশ্চয় ওর বোঁ। কেন, খুবসদুরত?’

‘কী যে বলি, আমার মতে আশ্চর্য সুন্দরী।’

‘বটে-এ!’ বললে সে টেনে টেনে, ‘তাই যদি হয় তাহলে কপালে দ্বঃখু আছে, নয়ত স্নেফ লোপাট হয়ে যাবে আর্থতিতে। এখান থেকে তেমন দূরে নয়... আচ্ছা সাফারটার হল কী?’ জিজ্ঞেস করলে সে, কিন্তু এই সময় বেমক্লা একটা হোঁচট খেয়ে পায়ে বেদম চোট লাগল আমার, ‘সাবধানে চলবেন বাপু, নয়ত ঠ্যাং ভাঙবেন। দেখে পা ফেলবেন। ইস, কী জাহান্নামী আঁধার। মাঝে মাঝে এমনি খচরামি চলে গোটা হপ্তা ধরে। জায়গাটা একেবারে নচ্ছার, তা বলতেই হবে। তবে মাঠ এখানকার স্বর্গ। কলখজে ভেড়া আছে একেবারে হাজারে হাজারে। তা সাফার এমন ঠান্ডা মেরে গেল কেন?’

বললাম, ‘জানি না, ভাবী বোয়ের কথা ভাবছে বোধ হয়...’

‘বোয়ের কথা?’ বললে তেরেন্তিয়েভ, ‘ও বোয়ের কাছে ওকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হবে... ও অবিশ্যি মায়ের বাধ্য, মাতৃতান্ত্রিক প্রথা এখানে এখনো টিকে আছে, তবে ততটা নয়। তবে ছুঁড়ীর কথাই ভাবছে সেটা ঠিক।’

আহমেতের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন একেবারে অন্ধকার। বাড়িখানা বড়ো কি ছোটো তাও বলতে পারতাম না, কেননা বারান্দায় ওঠার পৈঠা ছাড়া কুয়াশায় আর কিছুই দেখি নি। খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠলাম আমরা, ঘরে ঢুকলাম, আর ঘরখানার আয়তন দেখে বোঝা গেল বাড়িটা প্রকাণ্ড। কবুল করছি, এখানে এসেই কম্বলে ধরাশায়ী হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তবে বেশিক্ষণ ঘুম হল না। ভদ্রভাবে আমায় জাগিয়ে দিয়ে তেরেন্তিয়েভ বললে:

‘ঘুমের জন্যে রাত পড়ে আছে। এখন আমরা খাব মহা খিঙ্কাল। নিন, উঠুন...’

এ খাদ্যটি গ্রহণের অভিজ্ঞতা আমার আগেই হয়েছে, তাই শ্রদ্ধা জিজ্ঞেস করলাম:

‘মুঠো সমান ভুট্টার বোমা, নাকি আরো বড়ো?’

‘গিয়েই দেখবেন,’ বললে তেরেন্তিয়েভ। এবার যে ঘরখানায় গেলাম সেটি আমার সংক্ষিপ্ত নিদ্রার ঘরটির চেয়েও বড়ো।

এটা একটা টিপি ক্যাল ককেশীয় মেহমানখানা। দেয়ালে ঝুলছে সেকালের বাসন-কোসন, রেকার্বি, কোথাও কোথাও কীসব হাতিয়ার, ডেয়ারি-সংক্রান্ত দ্রু’টি পোস্টার, সজ্জানা আর সমাজপিতাদের রঙীন ছবি, এক কোণে কাচের তলে রঙীন চিত্র আর প্রতিচিত্র আঁকা পোস্টকার্ডের এক বিপুল সংগ্রহ, প্রথমটা সেদিকে আমি খেয়ালই করি নি।

আপ্যায়নের জায়গাটায় নেতাদের ছোটো ছোটো ফোটো। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম জানলাটার কাছে, সামনে বারান্দা, বেশ উঁচু, কিন্তু

জানলার ওপাশে সেই পাগল করা ক্ষান্তিহীন গোধূলি, যা এখন রাত্রির তমসায় পরিণত হচ্ছে।

আমি গিয়ে কার্ডগুলো দেখতে লাগলাম। এই ধরনের কার্ড, পারিবারিক ফোটোগ্রাফ, পোস্টার, ছবি মেহমানখানায় টাঙাতে ভালোবাসে পাহাড়ীরা।

পাহাড়, সমুদ্র, নগরের অসংখ্য ছবি ছিল সেখানে। ছিল প্রাক-বিপ্লব ফ্যাশনের নারীমূর্তি, অপরিচিত নানা লোকের পোর্ট্রেট, তার মধ্যে লেখক, সুরকার, যোদ্ধার কয়েকটা চেনা ছবিও চোখে পড়ল। এই সবকিছুর মধ্যে মিলটা কোথায় ভেবে পাচ্ছিলাম না। আহমেত কিছুটা রুশী বলতে পারে, সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে:

‘এরা সবাই দেখতে সুন্দর।’

বুঝলাম, ‘দেখতে সুন্দর’ এই মানদণ্ডে এই সমস্ত কার্ড বাছাই করা হয়েছে, সেটা গৃহস্বামীর রুচি। লেরমন্তভের ছবি দেওয়া একটা কার্ডও এই সময় চোখে পড়ল আমার। কেন জানি আহমেত যেই বলল ‘দেখতে সুন্দর’, অমনি চোখে পড়ল লেরমন্তভ, একটা শিহরণ খেলে গেল পিঠে। ‘গুলির আওয়াজে দ্ব’কান পেতে... দিনের কাজের বোঝা রাখবার’ — সারা দিন এই যে দুটো পঙক্তি আমার জ্বালিয়েছে, সে তো লেরমন্তভের লেখা। হ্যাঁ, লেরমন্তভেরই। গোটা কবিতাটা মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এই সময় খাবার এল, বসতে হল গালিচায়।

গালিচায় আমরা বসলাম ঘরটার মাঝামাঝি, জায়গা ছিল আরো। বসলে বোতাম খোলা কুর্তায় তেরেণ্ডিয়েভ, দেখাল তাকে ককেশীয় যুদ্ধের পুরনো সৈনিকের মতো, বসলে সাফার, তখনো ভ্রুকুটিত, কেমন যেন আত্মহারা, বসলে গৃহস্বামীর আত্মীয়রা, মাঝারি বয়সের সব পাহাড়ী, আমার গাইড রাখাল, এবং একজন রুশী, চুলিভরা মুখ, বয়স বোঝা মুশকিল, অলস চাল-চলন, দাড়ি কামায় নি।

পাহাড়ীরা ওকে স্নেহ স্তোত্র বলে ডাকাছিল, বিশেষ কেয়ার করছিল না।

তেরেস্তিয়েভকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে লোকটা?’

‘এ সেই অ্যাকাউন্টেন্ট, গালিচা সম্বায়ে যে টাকা করতে এসেছে। দেখছেন তো কেমন ধাতস্থ হয়ে গেছে। খিৎকাল ধরেছে, নয়ত বা ভোদকা,’ যোগ করলে সে মৃদু ঠাট্টায়।

খিৎকাল খেতে শুরুর করলাম আমরা। খাদ্যটা কী যারা জানে না তাদেরকে বদ্বিষয়ে দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যাই হবে অযথার্থ, কেননা কোথায় খাচ্ছি সেই অনুসারে তার চেহারা পালটায়। খেবসুরেতিয়ায় তার এক চেহারা, আভারিয়ায় অন্যরকম, লেজ্জিয়ায় তৃতীয় ধরনের। আমরা যেটা খেলাম সেটা রশদুন দেওয়া ঘন একটা ঝোল, বলা যায় চাঁট, ভেড়ার মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোর সঙ্গে তা মাখিয়ে খেতে হয় ভেড়ার মাংসের সুরুরা আর ভুট্টার ছাতুর বড়ার সঙ্গে। বিভিন্ন অঞ্চলে বড়াগুলোর আকার দাঁড়ায় বাদাম থেকে শুরুর করে মস্তো একটা মুরোর মতো। গরম গরম তা যদিও বা খাওয়া যায়, ঠান্ডা অবস্থায় তা সবচেয়ে সর্বভুক ইউরোপীয় পাকস্থলীর পক্ষেও দুষ্কর।

রশদুনের ঝোলটা ছিল ঘন, গরম এবং ঝাল। ভোদকা দেওয়া হয়েছিল প্রচুর এবং তা খাওয়া হয় অন্য পাত্রের বদলে গেলাসে গেলাসে।

তবে পাহাড়ীরা খুবই শক্ত লোক, ভোদকায় তাদের ধাতের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ল না। বাড়ির মেয়েরা সর্বকিছু পরিবেশন করে অদৃশ্য হয়ে গেল, পুরুষালী ভোজনে কোনো ব্যাঘাত ঘটতে চায় না তারা।

খিৎকাল গলাধঃকরণের অনুষ্ঠান চলল খুবই সমারোহে। সবাই চিবুতে লাগল খচমচ করে, হাত মূছলে গালিচার ওপর রাখা রুমালে। খেলে হাত দিয়ে। আলাপ চলল ধীরেসুস্থে রুশী এবং

লেজিগিন ভাষায়। সময়টা এমন যে কারো কোথাও তাড়া নেই।

গিরিশঙ্করের ওপারে, জর্জিয়ায় মদ্যপান প্রস্তাব যে অতুলনীয় চারুকলায় পরিণত হয়েছে, এখানে তার চল নেই, এখানে তা স্নেফ সংক্ষিপ্ত এবং জরুরী, সরস এবং স্থূল, কিন্তু সবই সাদামাটা আর সহজ।

পরে ভোদকার খানিকটা প্রভাব পড়ল মেজাজে, পরস্পরকে নিয়ে মজাদার সব ঘটনা শোনানো হতে লাগল।

আমি চুপিচুপি লেরমন্তভের কবিতাটা মনে করতে লাগলাম, চারণক্ষেত্র আর রাখালদের ঘটনায় ভারাক্রান্ত স্মৃতি খানিকটা যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল ভোদকায়। এক ঘণ্টা পরে শুধু একটা স্তবক মনে পড়ল, মাথা কুটেও বাকিটা আর স্মরণ হল না।

পুরুষেরা যখন রীতিমতো হেঁচো শুরু করেছে, কীসব লৌকিক চুটকি বলছে চিৎকার করে, এমন সময় বারান্দায় দরজা খুলে ভেতরে এল শাল জড়ানো সেই মেয়েটি, যাকে দেখে সাফার আর আমি অমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময় মেহমানখানার হুক থেকে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন ঝোলানো হল, তার আলোয় দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটিকে মনে হল অন্য জগতের আগন্তুক। ঘরে ঢোকার সময় এক রাশ ঘন কুয়াশা সঙ্গে করে এনেছিল সে, মনে হল যেন দীপ্ত বাষ্প তাকে ঘিরে আছে, কেননা আলো লেগে কুয়াশাটা মিটিমিট করছিল লালচে আভায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখল সে। এখন তার পরনে হাতে বোনা একটা নীল সোয়েটার আর শাদা স্কার্ট। আহমেত বললে:

‘নমস্কার নাতাশ।’

তাহলে নাম ওর নাতাশা। আমিও হাঁকলাম:

‘নাতাশা, আসুন এখানে, আমাদের তো আগেই পরিচয় হয়ে গেছে, বসুন আমাদের সঙ্গে...’

নাতাশা কিন্তু তাকিয়ে রইল তার স্বামীর দিকে, বসে আছে সে পাতলা এলোমেলো চুলে, কোট খুলে রেখেছে, হাত বেয়ে গড়াচ্ছে চৰ্বিৰ ফোঁটা, এক গ্লাস ভোদকা নিয়ে সে তাতে এমনভাবে চুমুক দিচ্ছিল যেন চা খাচ্ছে।

রুঢ় তিক্ত কণ্ঠে নাতাশা বললে:

‘নাও, বাড়ি চলো, রাত ভোর গিলে শেষে নর্দমায় পড়ে থাকবে।’

নির্বিকারভাবে স্তম্পান তাকাল তার দিকে, গ্লাসে চুমুক দিলে, ভুট্টার বড়া নিয়ে টেপাটোপি করলে, তারপর ধীরে ধীরে চিবাতে চিবাতে বললে:

‘বাড়ি গিয়ে করবটা কী? একেবারে জ্বালিয়ে মারলে।’

কোনো জবাব না দিয়ে নাতাশা দরজার দিকে এগুনো। কিন্তু নীরস গুরুভার মর্দতি সত্ত্বেও আহমেত লঘু ভঙ্গিতে চট করে গালিচা থেকে লাফিয়ে উঠে অতি সমাদরে তার হাত চেপে ধরে সান্নুয়ে বললে:

‘রাগ্ করো না নাতাশ, বসো আমাদের সঙ্গে। বসো, বসো, আনন্দ করে বসো...’

গালিচার এক প্রান্তে পা গুটিয়ে বসল সে, পাহাড়িনীরা যেমন বসে। গেলাস নিয়ে আধাআধি ভোদকা ঢাললে তাতে, চেরির রসের যে বোতলটা আমরা ছুঁই নি, তা থেকে রস ঢেলে ভোদকাটা রাঙিয়ে তুলল।

তারপর এক ঢোকে সবটা খেয়ে ফেলল, চোখাচোখি হল উন্মাদের মতো স্থিরদৃষ্টি সাফারের সঙ্গে। হাসির মতো কী একটা ফুটে উঠল তার ঠোঁটে, ভুট্টার বড়া নিয়ে সে নিভয়ে তা ভেজালে রশ্মনের ঝোলে।

এই সময় পুরনো একটা লেজগিন গান ধরলে পাহাড়ীরা! গাইছিল তারা দুলে দুলে, যেন ঘোড়ায় চেপে চলেছে। কথাগুলো

আমি কিছুই বুঝি নি, কিন্তু ওই টানা-টানা, বিষণ্ণ, মিহি গলার
ছন্দে আমার মানসপটে স্পষ্ট ফুটে উঠল এইসব খাদ, যেখানে ঝড়
তুলে ছোট্ট নদী, ধস নামে, হানা দিয়েছে পাহাড়ীরা, লড়েছে আর
মরেছে।

অপূর্ব গানটা। তেরেস্তিয়েভ তার নিজের ভাষায় আমায় সেটা
বলেছিল। যুদ্ধে মৃত্যুর কথা ছাড়া প্রায় সবটাই আমি অনুমান
করতে পেরেছিলাম। যে পাহাড়ীকে নিয়ে গানটা, সে অনেক
খোঁজাখুঁজি করেও যমকে পায় নি, কে যেন তাকে যাদু করে
রেখেছিল।

এর পর গাওয়া হল অন্যান্য রসাল গান, মদ্যপান চলল, আলাপ
চলল এলোমেলো।

আমি বললাম, ‘আমাদের রুশী কিছু একটা গেয়ে শোনান
নাতাশা।’

‘আমি গাই না,’ বললে সে সোজাসুজি, মৃদু গলায়। ‘সত্যি
বলছি, সত্যি, ন্যাকামি করছি না। গলা নেই আমার, তার চেয়ে
আপনি বরং গান...’

এবং এমনভাবে সে হাসল যে আমি অসাধারণ একটা কাণ্ড
করে বসলাম। বললাম:

‘বেশ, তবে গাইব কিন্তু কবিতা।’

সমবেত কণ্ঠে সমর্থন জানালে পাহাড়ীরা আর সারা দিন
লেরমস্তভের যে শব্দকটা আমায় একটা আর্ত উদ্বেগে কুরে কুরে
খেয়েছে, সেটি আমি গাইতে লাগলাম।

গাইলাম একটা ভয়ঙ্কর মরীয়া গলায়, কম্বল আর ভোদকার
ধোঁয়ার মধ্যে রাত কাটাবার ফলে যা ঘড়ঘড়ে। গেয়েছিলাম বলা
ঠিক হবে না, স্রেফ ঘড়ঘড়িয়ে উদ্‌গীর্ণ করলাম শব্দকটা, আমার
মনে হয়েছিল যে স্থান কালের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিহীন এই
পঙক্তিগুলোয় প্রবেশ করছে খাপছাড়া আর অপরিপূর্ণ এই পার্বত্য

দিনটার সমস্ত মর্মবাণী। গাইলাম রোমান্স সঙ্গীতের ধারায়, প্রতি
তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির পদনরুদ্রি করলাম দ্ব'বার করে:

দিনের কাজের বোঝা রাখবার
পরে সন্ধ্যার তীরেতে যেতে,
তোমারি স্বপ্ন দেখি বারবার
গর্দলির আওয়াজে দ্ব'কান পেতে।

সে আওয়াজ চেপে ধবলচুড়
ডেউ এসে যত লুটিয়ে পড়ে।
কাঁদি, আমি কাঁদি বিরহাতুর,
ঝরি যেন আমি অমনি করে।

শেষ করলাম চোখ বুজে। নিশ্চয় খুব হাস্যকর হয়েছিল
ব্যাপারটা। অট্টহাস্যের বিস্ফোরণ আশা করেছিলাম, কিন্তু কেউ
হাসলে না।

‘এও বেশ সুন্দর গান,’ ভদ্রতা করে বললে আহমেত, পাহাড়ীরাও
আমার স্বাস্থ্যপান করলে।

নাতাশা তাকিয়ে ছিল গালিচার দিকে, যেন তার জটিল
নকসাগুলোকে অনুসরণ করছে তার দৃষ্টি। এই সময় জায়গা
থেকে উঠে সাফার চলে গেল ঘরখানার দরবরের কোণে, আমার
মনে হয়েছিল, গেল যেন কেমন মাতালের ভঙ্গিতে।

কিন্তু এই টলমলে পদক্ষেপগুলো হল লেজগিঙ্কা নাচের
প্রস্তাবনা মাত্র, নাচে নামার আগে নর্তকের নমনীয় গতিভঙ্গি। হঠাৎ
সিধে হয়ে উঠল সে, যেন ছাড়া পাওয়া স্প্রিং, এমন চলনে সে
নাচ শুরু করলে যা আমি তার পক্ষে কখনো সম্ভব বলে ভাবতে
পারি নি, সারা দিন তাকে যে মামুলী স্বল্পদৃষ্টি ছোকরা বলে
মনে হয়েছিল, তার সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই।

এমনভাবে সে নাচলে যেন দুনিয়ায় লেজগিঙ্কা নাচ নাচছে
সে-ই সর্বপ্রথম, এ যেন তার নিগদ্য ভাবনার উৎসার। তার নাচের

সে গতিভঙ্গি আশেপাশের সবাইকে আনন্দ দেবার জন্যে নয়, সেই ভৌলিকবাজ নটের মতোও তা নয়, যে তার কেরদানি দেখিয়ে তাক লাগাচ্ছে। এ হল এক প্রাচীন কালের পাহাড়ীর নর্তন, যে ভাষা দিয়ে যা বলতে পারে নি, সেইটে বলছে নাচে।

আনন্দে উন্মাদনায় চুমকুড়ি কাটতে লাগল পাহাড়ীরা, হাত তুলে তুলে তালি দিতে লাগল, যেন খঞ্জনী মন্দিরা বাজাচ্ছে।

এমন অবলীলায় সন্তুর্পণে সে নাচলে যে তার পদক্ষেপে লণ্ঠনটা পর্যন্ত কাঁপল না। হয়ত ভোদকা টানা হয়েছিল একটু বেশি, কিন্তু নাচটা আমায় একেবারে আচ্ছন্ন করল। সাফার যতক্ষণ তার পা চালাচ্ছিল, কেউ সেখান থেকে দৃষ্টি ফেরায় নি। তাই কেউ আমরা লক্ষ করি নি কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল নাতাশা, নাচের গোড়ায় নাকি তার শেষ দিককার উদ্দাম পাকগুলোর সময়। কিন্তু সাফার যখন দ্বম্ব করে থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে দরজার দিকে, তখন সবাই আমরা দেখলাম যে নাতাশা দরজার হাতল ধরেছে।

নীরবতা নামল, আস্তে করে নাতাশা বললে:

‘এখানে বড়ো গুমোট।’

কিন্তু চলে গেল না সে। সাফারের মৃৎখোমৃৎখি দাঁড়িয়ে সে এমনভাবে হাতলটায় চাপ দিচ্ছিল যেন গুঁড়িয়ে দেবে।

‘নাতাশ,’ তার দিকে এক পা এগিয়ে সাফার বললে, ‘নাচো আমার সঙ্গে, সারা জীবন মনে থাকবে...’

কেন জানি জানলার দিকে একবার তাকিয়ে কড়া করে নাতাশা বললে:

‘ওসব পারি না। আমি বরং তোমায় আমাদের নাচ দেখাব।’

‘লাগাও,’ চেঁচিয়ে উঠল সাফার।

‘আরে এখন নয়, কী ক্ষ্যাপা দেখো দিকি। ঝাঁপ দিতে পারলেই হল, দেখো ডুবে মরবে নদীতে’...

ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে ঢেকে ফেলল নাতাশাকে। কুয়াশার দিকে ছুটে গেল সাফার, কিন্তু দরজার শব্দে বদ্বলাম নাতাশা ততক্ষণে চলে গেছে।

ছোপ ছোপ মেঘগুলো ধীরে ধীরে ছতরে গেল ঘরের মধ্যে। আবার কী একটা ভারি বিষম গান ধরল পাহাড়ীরা, তাতে গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। এক গ্লাস ভোদকা ঢেলে সাফার তা ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে নিলে।

খেয়াল ছিল না কতটা সময় কাটল। পাইপ টানছিলাম আমি, দেখছিলাম লণ্ঠনের আলোয় কেমন বদলে যাচ্ছে মদুখগুলো। হঠাৎ সবাইকে আমার মনে হল ভারি নরম, ভারি ভালো, ঘরখানা — খুব আরামের, উষ্ণ, বন্ধুবৎসল।

সাফার উঠে বেরিয়ে গেল বারান্দায়, ক্ষিপ্ত পদে তার পেছা নিলে তেরেস্তিয়েভ।

মনে হল, এইবার সবচেয়ে মনে রাখার মতো কিছা একটা ঘটবে। সিগারেট খাচ্ছিল পাহাড়ীরা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল স্ত্রপান। লালচে কালো কম্বলের পটে কপাল ওর ধবধব করছিল কাগজের মতো। রগে ঝিকমিক করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দায়োরের পাশের জানলাটার কাছে গেলাম আমি। পরস্পরকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে কথা কইছিল সাফার আর তেরেস্তিয়েভ, যেন গোটা গ্রামে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

কথা বলছিল বারান্দায় পায়চারি করতে করতে। শব্দগুলো কখনো সরে যাচ্ছিল কখনো কাছিয়ে আসিছিল, তাই গোটা আলাপটা শুনতে পাই নি। কানে এসেছিল ছেঁড়া ছেঁড়া কতকগুলো বাক্য।

তেরেস্তিয়েভ বলছিল, ‘এখনি চলে যেতে হবে তোকে। আমি তোর স্বর্গত বাবাকে কথা দিয়েছি যে তোকে দেখব।’ তারপর অস্পষ্ট কতকগুলো কথার পর ফের শুনলাম:

‘তুই একেবারে সেইরকমই রয়ে গেলি... আর মা, মিস্কিঞ্জিতে পাত্রী?..’ তারপর বাকিটা চলল লেজগিন ভাষায়।

প্রচণ্ড আপত্তি করছিল সাফার, তারপর ওর কাঁকরচেবানো শব্দস্রোতে শোনা গেল রুশী গালাগালি। বললে:

‘নিকুচি করেছে আমার পাত্রীর...’

সিঁড়িতে নামার মুখে দাঁড়াল তারা। একঘেয়ে ভারি গলায় তেরেস্তিয়েভ নাছোড়বান্দার মতো বলে যাচ্ছিল:

‘এক্ষুনি চলে যেতে হবে তোকে। আমি তোকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিয়ে আসব। উঠোনে ঘোড়া তৈরি। চলে যেতে হবে তোকে...’

নিথর একটা স্তব্ধতার পর সাফার এমন মিনতি করে বললে যে আমার ভয়ই করে উঠল:

‘ভাল্লাগি, এ মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে আমি পারব না। মরব, তাও সই, ছেড়ে যেতে পারব না।’

ফের সে লেজগিন ভাষা ধরলে।

একটু চুপ করে রইল তেরেস্তিয়েভ, তারপর আবার কথা কইতে লাগল, গলার স্বর ওর চাপা চাপা হয়ে এল, সরে যেতে লাগল দূরে। সম্ভবত সাফারের সঙ্গে ও কথা কইছিল তার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। তার বেশি আর কিছু ধরতে পারি নি।

জানলা দিয়ে তাকালাম। বদুঝতে পারলাম না কেন, কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম আঙিনাটা সবুজ আলোয় ভরা, যেন ঘটনাটা ঘটছে সমুদ্রের তলে। লাগাম বল্গার শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় জিন পরিয়ে ওরা চেপে বসল দ্ব’জনেই।

তারপর পাথরে উঠল খট্‌খট্‌ শব্দ, সওয়ারীদের ছায়া সরে গেল আঙিনা পেরিয়ে, খট্‌খট্‌ শব্দটা চলে গেল দূরে। ভাবলাম, দ্ব’জনেই চলে গেল নাকি? কিন্তু এই সময় দরজা খুলে গেল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী খেলা ঘরে ঢুকল তেরেস্তিয়েভ।

পাহাড়ীদের দিকে দৃকপাত না করে সে এগিয়ে এল আমার কাছে। একজন ঢুলিছিল, আরেকজন ফিস্‌ফিস্‌ করে কী বলছিল আহমেতকে। কী একটা কাগজ পড়ার চেষ্টা করছিল রাখাল, অসহ্য কার্লি ছড়ানো লন্ঠনটার ক্ষীণ আলোয় উঁচু করে ধরছিল কাগজটা।

ভোদকা আর ঘরোয়া তামাকের গন্ধ ছাড়ছিল তেরেস্তিয়েভের গা থেকে। তার নীল চোখে একটা প্রজ্ঞা ও অবহেলার দৃষ্টি, যেন আমায় সে বোঝাতে চায় ঢের সে দেখেছে জীবনে, সবই জানে, কিছতেই আর সে অবাক হয় না।

বললে, ‘কী দিউশিউশ!’ তারপর আমার নির্বোধ মূখ দেখে যোগ করলে, ‘আপনি যে এখানকার ভাষা জানেন না তা মনে ছিল না। বলছিলাম, দেখুন কী কান্ড...’ একটু চুপ করে রইল সে, ‘পাপ থেকে ওকে দূরে ভাগিয়ে দিলাম। নয় খানিকটা ঘোড়াই হাঁকাক, পাহাড়ে পথটা অবিশ্যি এখানে খারাপ, নিশ্চয় ঠান্ডা হয়ে যাবে। তা, আপনি কি বলেন?’ এমনভাবে সে কথাটা পাড়ল যেন আমাকে সে তার সঠিকতায় নিঃসন্দেহ করতে চায়, যদিও কোনোই আপত্তি আমি করি নি, ‘ছোকরাটা ভালো, ভারি ভালোবাসি ওকে, তবে কপালটা ওর খারাপ। ভেবেছিল লোহাকর্মী হবে, হল মামুলী পশু টেকনিশিয়ান, মদ খাওয়া ওর উচিত নয়। আর আপনি ঠিকই বলেছেন — মেয়েটা রান্ধুসে সুন্দরী। একসময় আমরাও তো ছিলাম তাগড়াই ঘোড়া। জোয়ান বয়স, বন্ধুয়েছেন তো... এমন রাত্রে আমি...’

হাতের একটা ঝটকা ভঙ্গি করে সে চলে গেল আমার কাছ থেকে, ঘুমন্ত রাখালকে ডিঙিয়ে লন্ঠনের পলতেটা ঠিক করতে লাগল।

তারিকয়ে দেখলাম ভোজের অবশেষ। গালিচার ওপর পাতা জাজিমের ওপর গড়াচ্ছে আধ-ভাঙা ভুট্টা বড়া, মাংসের ঠুকরো, কাত হয়ে পড়ে আছে গেলাস। দেয়ালের কাছে গেলাম আমি,

কাচের নিচে সেখানে আবছা দেখা যাচ্ছিল সাবেকী হুজার বাহিনীর হাবিলদারের লাল উর্দী।

তাকিয়ে দেখলাম উর্দীর ফিতেগুলো, চড়া রঙে আঁকা মৃদু। ‘দেখতে সুন্দর’ বলেছিল পাহাড়ী। ঘরখানায় কেমন অস্বস্তি লাগল। রাখালের ধূনির অনির্বাক্ত অঙ্গারের মতো যে উদ্বেগটা আমার মধ্যে সারা দিন ধিকিধিকি জ্বলে উঠেছে, তা এখন ফেটে পড়ল একটা একাকিত্ব-বোধের দমকে। কারো দিকে চেয়ে দেখার ইচ্ছে হল না। জোর করে দরজাটা খুলে আমি বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

কুয়াশার লেশমাত্র কোথাও নেই। সবুজাভ জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে গ্রামটা। ঠিক আমার সামনেই লম্বমান এক বিশাল হিমবাহ, যেন পাশের আঁঙিনায় এসেই নামবে। আমার ওপরে নিচে অসংখ্য ধাপে গ্রামটা গড়া, যেন ছোটো একটা বাবিলন। আঁঙিনার প্রতিটি পাথর চোখে পড়ে। এক কোণে চালার নিচে ঘূমের মধ্যে ফোঁসফোঁস করছে ঘোড়ারা।

অতল আকাশখানায় ছড়িয়ে আছে শাদা শাদা নক্ষত্র। বিপরীত দিকের যে বিশাল পিরামিডটার গা দিনের বেলায় দেখিয়েছিল গোলাপী, তা থেকে এখন মৃদু ছটা বেরচ্ছে সবুজ। চুড়োটার জমাট বাঁধা তুষার জ্বলছে আশ্চর্য ধবলিমায়।

এ রাতের মায়া আমায় একেবারে বশ করলে। পুরনো ক্যাঁচকোঁচে সিঁড়িটা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম আঁঙিনায়, বেরিয়ে এলাম ফটক দিয়ে।

নিশ্চর বারান্দাগুলোর নিচে নির্জন সরু সরু রাস্তা দিয়ে পুরনো পাথরের বেড়া আর আধ-ভাঙা দেয়ালগুলো পেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম আমি। কোথায় যেন ঘেউঘেউ করে উঠল কুকুর, আমার পথের আড়াআড়ি নিচের দিকে পিঠে ভারি ঝোলা নিয়ে যাচ্ছিল একদল লোক। আন্দাজ করলাম এরা ওই ভূতাত্ত্বিক,

সঙ্গীদের খুঁজে বার করে এখন একসঙ্গে গাঁয়ে ফিরছে। ওদের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর আর ভারি পদক্ষেপ কানে আসছিল। ওরা মিলিয়ে গিয়ে ফের নীরবতা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম।

ঠান্ডা রাতের এই নীরবতায় আমি ঘুরতে লাগলাম এক পাথকের মতো যে থাকতে চায় রাতের সঙ্গে একা, আর কিছুই তার দরকার নেই। জীবন — সে আছে নিচে, অনেক দূরে, একেবারে চাঁদ আর চিরন্তন তুষার আর তারাদের কাছে তুলে ধরা এই গ্রামটার তলে। একটা পাথরের ওপর বসে আমি এই বন্য এলাকাটার সহজ কাঠিন্যের বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে রইলাম।

মনে হতে লাগল, আমি যেন বেঁচে আছি একসঙ্গে কয়েক যুগ ধরে। চারপাশে আমার বাবিলনের মতো সব পুরী। ওখানে মেহমানখানায় পুরনো লেজিগন গালিচার ওপর বসে আছে পাহাড়ীরা, গায়ে তাদের শামিলের আমলকার পোষাক, কথা কইছে মৃদু স্বরে। নিচে ইশকুলে শোবার যোগাড় করছে শক্ত-সমর্থ তরুণতরুণী, এইসব প্রাচীন দেয়ালগুলো নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। গহন পাহাড়ী পথে ঘোড়া ছোটাচ্ছে সাফার, মনের পোড়ানি দূর করছে উদ্দাম নৈশ কদমে। সুদূর কোন রুশী শহর থেকে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে নিক্ষিপ্ত নাতাশা বসে আছে ঘরে, অপেক্ষা করছে তার মাতাল স্বামীর, আর ভেজা ঠোঁটে সে খেয়ে শেষ করছে কে জানে কত গেলাশ ভোদকা — সেই লজ্জাতেই কি সে এসে লুকিয়েছে এখানে, এই অজ্ঞাতবাসে?

এসব ঘটেছিল বছর দশেক আগে, পাথরটার ওপর বসে বসে তখন ভেবেছিলাম এইরকম নিষ্ঠুর চাঁদিনী রাতে দ্বিতীয় বার খুব সম্ভব আর এই পাথরটার কাছে আসব না, এলোমেলো এই সশঙ্ক দিনটায় যা কিছু সয়েছি তা আর সহিতে হবে না...

দিনের কাজের বোঝা রাখবার...

দিনের কাজের বোঝা রাখবার...

ওখানে চারগন্ধে ঘুমচ্ছে চৌকি কুকুরেরা, মাথা রেখেছে টিপি
ওপরে যাতে রাতে যা কিছু ঘটে তা তাদের কানে যায়।
ভেড়াগুলোই কেবল এক পাল থেকে অন্য পালে যাতায়াত করতে
পারে নির্ভয়ে। এক টুকরো কম্বল জড়িয়ে ঘুমচ্ছে রাখালেরা,
তাদের নীল হয়ে আসা ধুনিতে ধিক্ধিক করছে অঙ্গার।

ঠান্ডা বোধ হল, পাথরটা থেকে উঠলাম। ফের ঘুরতে লাগলাম
সরু সরু রাস্তা আর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে, বার বার আওড়াতে
লাগলাম আমার জানা কয়েকটি লেজগিন শব্দের একটি — ইয়ের
অর্থাৎ ভালো। শব্দটার হ্রস্ব সহজ উচ্চারণ মিলে যাচ্ছিল এই
অনন্য রাতটার শীতল লঘুতায়। ইয়ের!

সামনের বাড়িটার দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলাম। বারান্দায়
কাঠের কাজ করা থামগুলোর ছবি আমার মনে থেকে গিয়েছিল।

নাতাশার বাড়ি। বারান্দাটা ফাঁকা, থামগুলোর সবকিছু ফাটল
আমার চোখে পড়তে পারত। ফের ওই সেই মূর্তিটা কল্পনা
করলাম, যাতে সে আমায় আর সাফারকে হতবাক করেছিল।

হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখতে লাগলাম। বাড়িটা
বড়ো নয়, পুরনো, গরিব-গরিব। সব কটা জানলা বন্ধ। বারান্দায়
প্রায় কালো ছায়া। কী একটা ঠুন্ঠুন করে উঠল সেখানে। কান
পেতে রইলাম। আবার শোনা গেল ক্ষীণ শব্দটা। কাছে এসে
অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে পড়ল থামে বাঁধা একটা
ঘোড়া।

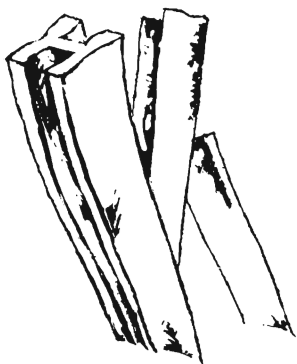
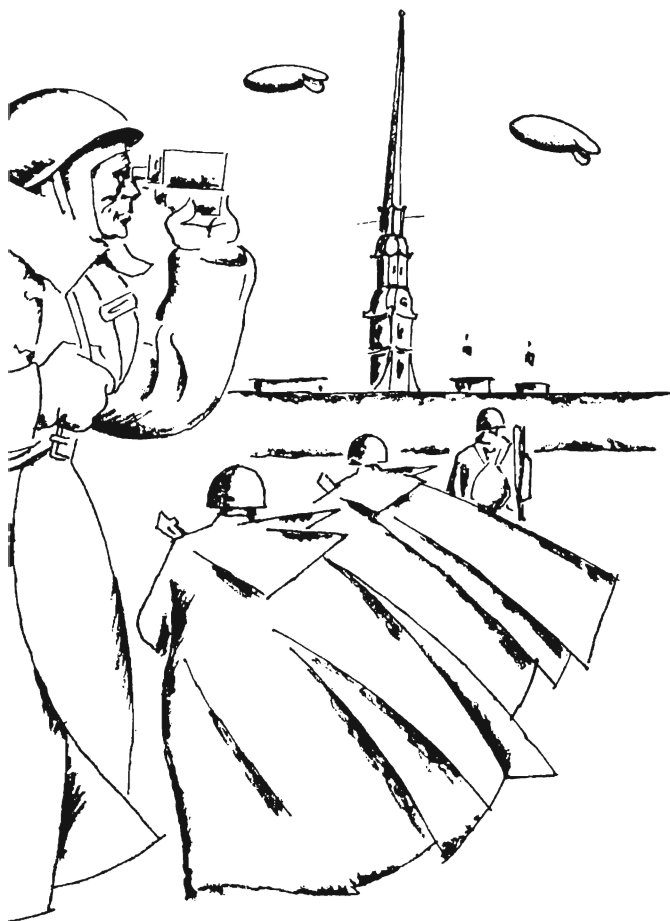
মনে হল ঘোড়াটা যেন চেনা। একেবারে কাছে আসতে বোঝা
গেল সাফারের ঘোড়া। ফুটকি দেওয়া। খুরজিনও তারই, রঙচঙা যে
খুরজিন দেখে আমার অমন হিংসে হয়েছিল। সাফার তাহলে
দূরে কোথাও যায় নি।

চারিপাশে মৃত্যুসম স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতায় মনে হল জ্যোৎস্না
যেন ক্ষীণ হলুদ রঙনে বাজছে।

ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। সে আমার কাছ ঘেঁসে এসে সশব্দে হাত শূঁকতে লাগল, বোঝা গেল, সাফার ওকে নিজের হাতে খাওয়ায়। চত্বরটা থেকে ওপরে উঠতে লাগলাম, নিজের ডেরায়। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি নারীমূর্তি, পাথরের ওপর বসে আছে নিথর হয়ে, চেয়ে আছে কোথায় যেন পাহাড়ে, উঁচু পিরামিডটায়, তার ঝকঝকে সুদূর হিমবাহে।

নিশ্চল তার রোঞ্জ-রঙা মুখ। ঠোঁট চাপা। হাত দুখানা হাঁটুর ওপর, যেন দূরের কী একটা শব্দ শুনছে, আর সেটা শুনতে পাচ্ছে একা সেই। মেয়েটি আইশে। আমি কাঁছিয়ে আসাতেও সে নড়ল না। তার রোঞ্জ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। কিন্তু বসে আছে নিথর হয়ে।

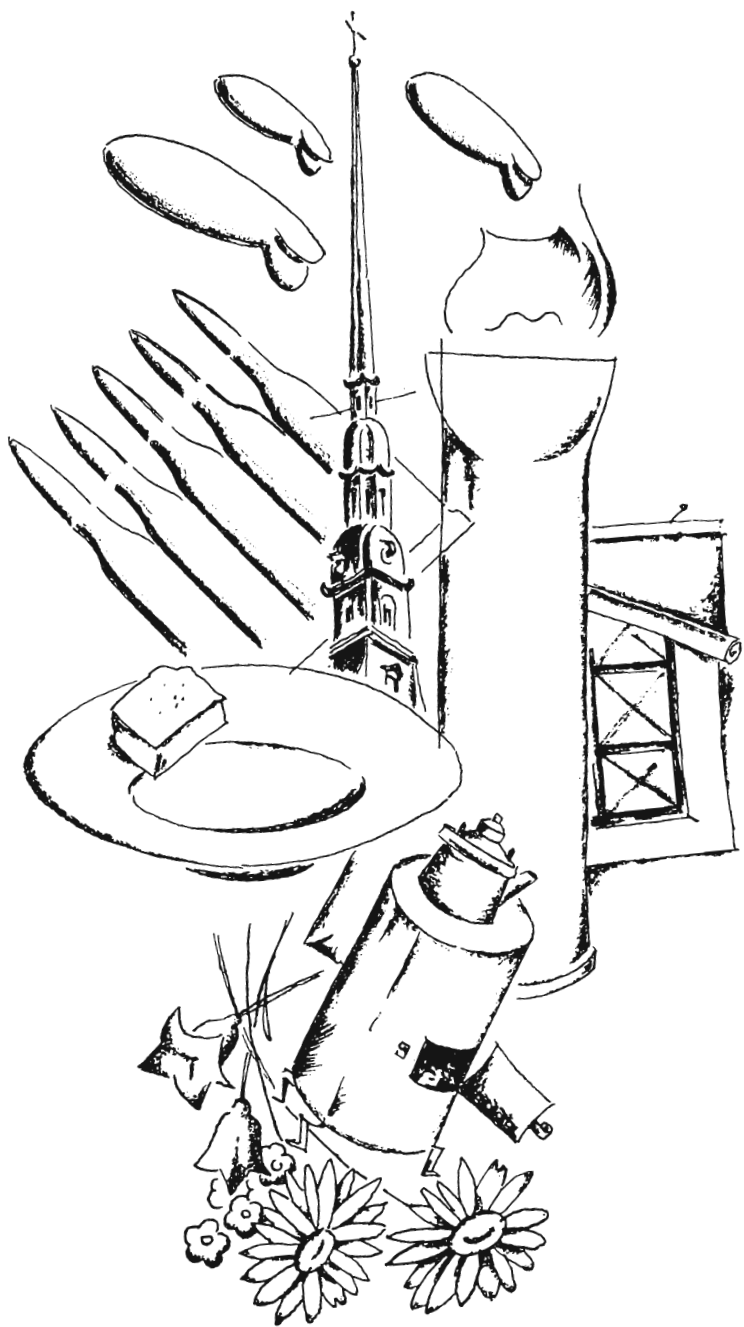
পেরিয়ে গেলাম তাকে, ছোট্ট বাড়িখানা আর ঘোড়াটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। যখন পৌঁছলাম তখন পাহাড়ীরা সবাই ঘুমচ্ছে। গায়ে কোনো কিছুর ঢাকা না দিয়ে যেমন বসেছিল তেমনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রচণ্ড নাক ডাকাচ্ছে স্তোপান। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমচ্ছে তেরেণ্ডিয়েভ, তাকে জাগাবার ইচ্ছে হল না। কোণে আমার ছোটো আভারী জোব্বাটা জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।





লেনিনশ্রাদ কাহিনী





দৈৱথ সময়



লক্ষ্যবস্তুটা চমৎকার চোখে পড়ল জার্মান বৈমানিকের: সবুজ পিঠের মতো বনটার মাঝখান দিয়ে গেছে হলদে একটা সরু ফালি। সামরিক মাল নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছে একটা লম্বা ট্রেন। তাই বনের ওপর ডাইভ করার মানে হয় না। দরকার একটু অপেক্ষা করা, দুই বনের মাঝখানকার খোলা জায়গাটার মুখে ট্রেনটা যেই আসবে তখন নিশ্চিত্তে এবং অভ্রান্ত লক্ষ্যে বোমা ফেলা যাবে।

ঘুরে গেল বিমান, তারপর রোদ্দুরে ঝকঝক করে একটা পাক দিয়ে ওপরে উঠে ডাইভ করল। এম্ব্যাস্কেমেন্টের যেখানে ট্রেনটা আসার কথা তার দুই পাশে দেখা দিল কাদা-মাটির ফোয়ারা। কিন্তু বনের দিকে ফিরে চাইতে বৈমানিক দেখল ট্রেনটা খোলা জায়গা পর্যন্ত এসেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাচ্ছে বনের ভেতর। খামোকা বোমা খরচা হল।

আরো এক চক্রর দিলে বৈমানিক, ঠিক করলে এবার আর লক্ষ্য ফসকাবে না। খোলা জায়গাটা দিয়ে ছুটছে ট্রেন। কোথেকে ট্রেনটা জানতে পারল যে এবার তার ওপর হামলা হবে বনের ভেতরের ওইখানটাতেই, বজ্রাঘাতে ছিটকে আসা ভারী ভারী পাইন গাছ পড়বে ওয়াগনের ওপর? পাইনগুলো পড়ল শূন্যে। জায়গাটা চট ক'রে পেরিয়ে গেছে ট্রেনটা। আবার খামোকা বোমা খরচা হল।

মুখ খিস্তি করলে বৈমানিক। এই লম্বা গদাইলস্করী মালগাড়িটা কি সত্যিই শাস্তি না পেয়ে যাবে? এবার সে ডাইভ করলে সোজা বনের ওপর, মালগাড়িটার মাঝামাঝি। হয়ত ওর হিশেবে ভুল হয়েছিল, হয়ত অভাবিত কিছু একটা ঘটেছিল, তবে বোমা পড়ল

গাড়িতে নয়, বনে। অধরা ট্রেনটা এগিয়েই চলল একগুঁয়ের মতো।

‘দাঁড়া!’ বললে জার্মান বৈমানিক, ‘এবার আলাপটা হবে গুরুতর।’

এবার খুব সাবধানে, মন দিয়ে দূরত্বটা দেখে সে হিশেব করতে লাগল। এই কঠিন মৃগয়ায় একটা আকর্ষণই বোধ করলে সে।

মেঘ থেকে সে নেমে এল একেবারে মাটিতে, আতপ্ত বাতাসে যেখানে তিরতির করছিল ধোঁয়ার একটা স্বচ্ছ ফালি। মনে হল সোজা ইঞ্জিনে গিয়েই বন্ধ লাগবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যেন কেউ তার তল থেকে টেনে নিল গাড়িটাকে। বিস্ফোরণের গর্জনটা তখনো কানে বাজছে, তবে পরিষ্কার বোঝা গেল: ফাঁকা। তাকিয়ে দেখল, তাই বটে। গাড়ি চলছেই, এতটুকু ক্ষতি হয় নি তার।

বৈমানিক টের পেলে কোনো একজনের ইচ্ছাশক্তি কম একরোখা নয়, হার মানতে চাইছে না তার কাছে। ড্রাইভারের নজর কড়া, আশ্চর্য সঠিক তার হিশেব, ধরা তাকে সহজ হবে না।

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলতেই থাকল। বোমা পড়ল গাড়ির আগে, পিছে, দ্ব’পাশে, কিন্তু এই বিদ্যুট্টেটা, মনে মনে তার এই নাম দিয়েছিল জার্মানটা, এগুতেই থাকল স্টেশনের দিকে, যেন অদৃশ্য কোনো প্রেত তাকে রক্ষা করছে।

কেমন একটা উদ্দাম লাফ দিলে ট্রেন, রোষে ঝন্ঝনিয়ে উঠল তার সমস্ত হুক, কড়িয়ালির টান খাওয়া ঘোড়ার মতো তা ছুটল ঢালুতে, আর ঠিক পরের পালায় যেখানে বোমা পড়ার কথা, সেইখানটিতেই আর এগুল না। পিছছে ট্রেন, থামছে, হাঁটহাঁট পা-পা এগুচ্ছে, ছুটছে তীর বেগে — কী না করছে এই ড্রাইভারের বশীভূত বিরস লম্বা মালগাড়িটা। বোমা ফেটে যাচ্ছে স্ট্রেশন পটকার মতো।

সেমে উঠল বৈমানিক। নিচে থুতু ফেলে সে, বারম্বার আক্রমণ চালাল। শেষ বারটা সে আন্দাজ করেছিল ঠিকই। এই প্রথম ভুল

হয়েছে ড্রাইভারের। ফ্যাসিস্টটার রক্ষা ঠোট থেকে খিস্তি বেরুল:
সমস্ত বোমা... শেষ হয়ে গেছে!

তখন সে গাড়ি বরাবর উড়ে মের্সিনগান চালাতে লাগল। কিন্তু
এই সময় ফের দেখা দিল বন, কোন এক দাঁতি যেন হঠাৎ ওটাকে
ঠেলে দিলে, সবুজ তিমিরে ফের অক্ষতই চলতে লাগল গাড়ি,
মনে হল কিছুতেই ওকে আটকানো যাবে না। ক্ষেপে উঠল
ফ্যাসিস্টটা। তাক করল সে ইঞ্জিনে, তার পাতলা দেয়ালের ওপাশে
লুকিয়ে আছে যে দুঃখময়, ওই ভয়ংকর রুশী মজদুরের দিকে,
তার সমস্ত বীরত্ব দেখে যে হাসছে, ফাঁকা মাঠ আর বনের ভেতর
দিয়ে যে তার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে পাগলার মতো... গুলি ছুটে
এল গাড়ির দিকে, কতকগুলো লাগল কোথায় যেন চাকার তলে,
খট্‌খটিয়ে উঠল রেললাইন, কিন্তু গাড়ি চলতেই থাকল...

অবসন্ন হয়ে হেলান দিলে বৈমানিক। জ্বলজ্বল করছে আকাশ।
স্ফটিকস্বচ্ছ শরৎ, কেমন যেন সুন্দর ভেসুফালের শরতের মতোই।
গুলিও শেষ হয়ে গেছে, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সমাপ্ত। নিচে ওই রুশীটাই
জিতল। গোটা বিমানটা দিয়ে ঘা মারব? ক্ষেপামিকে থামাব
ক্ষেপামি দিয়ে? শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল ফ্যাসিস্টটার।

নিচে নেমে এল সে, কৌতূহলে আর আক্রোশে সে উড়ে গেল
ট্রেনের ওপর দিয়ে। দেখতে পেল না যে তার দিকে নজর রেখে
আছে ড্রাইভারের অতন্দ্র চোখ। ড্রাইভার শূন্য বললে, ‘কী শালা,
পারলি?’

আর কালো ছায়াটা ভেদ করে, দলিত করে গেল ট্রেন, পথের
ওপর লুটিয়ে পড়া শত্রু বিমানের কালো ছায়া।

ভেলার ওপর



স্টিমার ডুবে যাচ্ছিল। তার পিছনের গলুইটা উঁচু হয়ে উঠল জলের ওপর, তার ওপর কয়লাগাড়ির কালো মেঘ। বোমা পড়েছিল ঠিক মাঝখানটায়, তাতে কয়লা রাখার খোল থেকে এই ধুলো উঠেছে, ধীরে ধীরে তা থিতুয়ে যাচ্ছে সাঁতারদুদের মাথার ওপর, ভাঙুরগদুলোর ওপর, জাহাজের তলিয়ে যাওয়া গলুইটার ওপর।

ফিন উপসাগরের ঠান্ডা হৈমন্তী জলে ঝাঁপিয়ে পড়া বেসামরিক যাত্রীদের মধ্যে ছিল একজন ফটোগ্রাফার। ক্যামেরা আর নানারকম ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম সমেত কাঁধে ঝোলানো ভারি কেসটা তাকে টানছিল নিচের দিকে। মির্টমিটে সবুজ জলের কল্লোল বাজছে কানে, আকাশ থেকে আসছে জার্মান বোমারুটার ইঞ্জিন-গর্জন, দস্যুর মতো যেটা হামলা করেছে এই ছোট্ট শান্ত স্টিমারটার ওপর, একটি কামান একটি বন্দুকও ছিল না তাতে। ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, কিন্তু সামরিক লোক কেউ ছিল না।

ফটোগ্রাফার ঠিক করলে প্রাণের আর আশা নেই, তাই ডুবন্তরা যেভাবে অনাবশ্যক হাত-পা ছোঁড়ে, তা করে কণ্ট ভোগার মানে হয় না। সে ভাবতে চাইছিল যে এটা একটা বিচ্ছিন্ন দৃঃস্বপ্ন, কিন্তু জল এসে পড়ছিল তার মুখে চোখে, তবে অদ্ভুত রকম অসাড় হয়ে গিয়েছিল দেহ, ঠান্ডা বোধ হচ্ছিল না।

বৃকের ওপর হাত রেখে চোখ বৃজে সে তার বোঁ আর ছেলেমেয়ের মূর্তি কল্পনা করতে চাইল, শেষ বারের মতো।

চেতনায় ঝাপসাভাবে তারা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, যেন ঢেউয়ে ভেসে গেছে। মাথা নিচু করে ডুব দিয়ে সে তলাতে লাগল। কিন্তু তলে পৌঁছল না। জল তাকে ঠেলে দিলে ওপরে। ঢেউয়ে

অর্ধমৃত অর্ধপিপষ্ট অবস্থায় সে ফের ভেসে উঠল, চোখ মেলে চেয়ে দেখল সমুদ্রে ছড়ানো মানুষের মাথা, নিচু সূর্য, সীসের মতো মেঘ, কানে এল মেরিসনগানের শব্দ।

ডুবন্তদের ওপর উড়ে উড়ে গুলি করছে জার্মান বিমান।

এত বিশ্রী আর অসহ্য লাগল তার যে ঠিক করলে ফের ডুববে। আবার বৃকের ওপর হাত জড়ো করলে সে, যে ভারী কেসটা ওর কাছে সবচেয়ে দামী হাতিয়ারের মতো, সেটা ওকে ফের টানতে লাগল গভীর সবুজে। কেমন একটা দুর্বলতা ভর করল দেহে, এলিয়ে এল পা, মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যেতে লাগল সবকিছু।

ফের ঢেউ তাকে তুলে দিলে ওপরে, কিন্তু চোখ মেলল না সে, ভয় হল আরো একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হবে। বন্ধ চোখে ফেনায়িত ঢেউগুলোর মধ্যে দুলতে থাকায় মনে হল যেন দুটো ঢেউ বৃষ্টি তাকে পেড়ে ফেলে পিষছে, তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ঢেউ দুটো, এপাশে-ওপাশে টেনে আনছে তাকে। এইভাবে ওকে নিয়ে কিছূক্ষণ খেলল ওরা, আর — আশ্চর্য ব্যাপার — চেতনা ওর খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এল।

ভাবলে, এটা নিশ্চয় চেতনার শেষ ঝলক, লোকে যাকে বলে সজ্ঞানে মরা, এটা তাই।

এই সময় খরবেগে সে ওপরে উঠতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ব্যথাবোধ ছিল না, কিন্তু এইবার ঘাড়ে একটা তীক্ষ্ণ ধাক্কা টের পেলে সে, চোখ খুলে দেখলে যে সে উঠে এসেছে একটা ভেলার পাশে। মৃত্যুর মুহূর্তে তাড়াহুড়োয় না ভেবে-চিন্তে বানানো এই করুণ নড়বড়ে জিনিসটায় চোখ বুলিয়ে, তার যাত্রীদের দেখে কিছূতেই তাতে উঠে পড়ার ভরসা হল না তার, শূন্য হাত দিয়ে চেপে ধরল তক্তার প্রান্তটা, তারপর জল থেকে খানিকটা উঠে বুক ভরে তাজা বাতাস টানল।

একটু তাজা হয়ে কপাল থেকে সে ভেজা চুল সরাতে লাগল, অন্য চোখটা দিয়ে চেয়ে দেখল ভেলাটা। তিনজন পুরুষ ও একটি যুবতী মেয়ে বসে আছে তাতে। পুরুষেরা একেবারে ভেজে জবজবে, কথা কইছে না, বিষন্ন। সজোরে তত্তা আঁকড়ে ধরে আছে তারা, মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে না। মেয়েটা কিন্তু অবিস্মৃত ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছে: সমুদ্রের ওপরে কখনো জোরে, কাংস্যকণ্ঠে, কখনো করুণ গলায় বাজছে তার বিলাপ।

তার ছড়ে যাওয়া গাল, এলোমেলো চুল, বিস্ফারিত চোখ, সবকিছু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সে পেঁচেছে হতাশার চরম সীমায়, জ্ঞান-গম্য তখন আর কিছুর নেই। পুরুষদের ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, গোমড়া মুখ, চেপে-বসা ঠোঁট — এসব ফটোগ্রাফারের এত কাছে যে আপনা থেকেই তার দৃষ্টি সরে গেল এই নির্বাক নিশ্চলতা থেকে মেয়েটির ছটফটানিতে। এমন সে চিৎকার করছে যে এই অর্ধবধির জলমগ্ন লোকটাও তাতে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যেতে পারে।

তত্তাগুলোর ওপর মাথা তুলে এক মুখ নোনা জল উগরে ফোটোগ্রাফার নিশ্চল পুরুষগুলোকে বললে:

‘মেয়েটাকে আপনারা শান্ত করতে পারছেন না?’

ওরা তাকাল নির্বিকার বিষন্ন দৃষ্টিতে। খুব দুর্লভ ছিল ভেলাটা, তত্তার তলে গিয়ে যাতে না পড়ে তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হচ্ছিল ফোটোগ্রাফারকে। মাথার ওপর দিয়ে একটা ঢেউ গাড়িয়ে যাওয়ায় স্বস্তি ফিরল তার। ভারি আনন্দ হল শব্দ তত্তা ধরতে পেরে...

নিজের পোষাক ছিঁড়িছিল মেয়েটা, তাকিয়ে ছিল কোথায় যেন দূরে, সন্ধ্যা নামছিল যেখান থেকে। তার চিৎকারকে চাপা দেবার জন্যে বাজখাঁই গলায়, অন্তত তাই তার মনে হল, সে শূন্য:



‘কমিউনিস্ট এখানে কে আছে?’

কাছের লোকটা একদৃষ্টে তার আপাদমস্তক লক্ষ করে বললে, ‘আপনি’, ভেলায় ফোটোগ্রাফারকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে।

‘কী হচ্ছে কমরেড...’ ধীরে ধীরে বললে ফোটোগ্রাফার, ‘মেয়েটা এমন চ্যাঁচাচ্ছে, ওকে যে শান্ত করতে হয়। আপনি কমরেড...’

এই সময় মস্তো একটা ঢেউয়ে ছিটকে গেল ভেলাটা, তার ওপরকার লোকগুলো কোথায় যেন অদৃশ্য হল কুহেলীতে, আর ফোটোগ্রাফার তলিয়ে গেল এত গভীরে, যা সে আগে কখনো তলায় নি, এই নতুন ডুবনটা এতই কঠিন লেগেছিল তার কাছে।

যখন ওপরে উঠল, আশেপাশে কোনো ভেলা দেখা গেল না, ভাসাছিল শুধু অদ্ভুত তিনটে তত্তা, নিজের জন্যে সেগুলোকে সে নিলে। তবে তাতে ওঠা তেমন সহজ হল না। হাত থেকে পিছলে যাচ্ছিল, কাত হয়ে যাচ্ছিল, আর এইবার সে বদলে যে তার বরাবরের সঙ্গী ওই কেসটাকে ছেড়ে না দিলে তত্তাগুলো তাকে ফেলেই চলে যাবে, আর সেইসঙ্গে যাবে তার উদ্ধারের শেষ সুযোগ, কেননা সন্ধ্যা কাছিয়ে আসছে।

ককাতে ককাতে সে বেলেটের বাঁধন খুললে, কাঁধ থেকে খসে এল বেলেট। শুধু কেসটা তলিয়ে গেল। পরের মূহুর্তে ফোটোগ্রাফার তত্তার ভেজা ধারটায় গাল চেপে পড়ে রইল। সত্যি করেই সে চোখের জল ফেললে ক্যামেরাটার জন্যে...

.

যে প্রতিষ্ঠানে ফোটোগ্রাফার কাজ করত সেখানে এল একটা ঢেঙা, মনমরা লোক, কপালে ক্ষতচিহ্ন, জিজ্ঞেস করলে এখানে প্রধান কে, তাকে সে ফোটোগ্রাফারের মৃত্যুর কথা বলতে চায়। বলবে যে জার্মান বোমারু স্টিমারটা ডুবিয়ে দেবার পর তারা, তিনজন পুরুষ ও একটি মেয়ে, একটা ভেলা বানিয়ে প্রাণ বাঁচায়,

ফোটোগ্রাফার আসে তাদের কাছে, যখন আলাপ শুরু করেছে, তখন ঢেউয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভেলা থেকে বহু দূরে। স্টিমারটা যেখান থেকে ছাড়ে, সেখানে ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। উঁচু দরের লোক, ভালো কর্মী... শেষের সেই ভয়াবহ মৃদুহৃৎও আশ্চর্য তার আচরণ।

এই সময় তাকে থামিয়ে দিয়ে একজন বললে:

‘ফোটোগ্রাফারকে আপনি নিজেই সে কথা বলতে পারেন, উনি আছেন পাশের ঘরে।’

‘পাশের ঘরে মানে?’ চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, ‘বেঁচে গেছে?’
‘হ্যাঁ।’

তক্ষুনি ডাকা হল ফোটোগ্রাফারকে। লোকটাকে চিনতে পারল সে, ভেলায় এই বলেছিল ‘আমি’।

হেসে সে জিজ্ঞেস করলে:

‘মেয়েটি কেমন আছে? শান্ত করেছিলেন তাকে?’

বিরত বোধ করল কাটা দাগওয়ালা লোকটা, তাহলেও বললে:

‘শান্ত করেছিলাম। নিজেরা আত্মস্থ হয়ে ওকে শান্ত করি। আপনার চিংকারে সবাই আমরা সম্মিৎ ফিরে পাই। সমুদ্র থেকে আপনি এসেছিলেন একেবারে আচমকা, আর তের্মনি আচমকাই উধাও হয়ে যান। যখন বেঁচে গেলাম, তারপর থেকে কেবলি আমরা আপনার কথা ভেবেছি, বলাবলি করেছি। এখানে এসেছি বিশেষ করে আপনার ব্যবহারের কথা বলতে।’

‘ব্যবহারের আর কী আছে,’ বললে ফোটোগ্রাফার, ‘শুরু ক্যামেরাটা তুলিয়ে গেল। কী সুন্দর ক্যামেরা, যদি জানতেন! ওহ্!’



‘ওকে দেখে আসি,’ বললে মা, আর ওলিয়া বন্ধুকে কার কথা হচ্ছে।

‘ও’ মানে ছেলে, ওলিয়ার ভাই বরিয়াকে, স্বেচ্ছায়তী। বললে ওর কোর্সের সমস্ত সঙ্গীদের সঙ্গে ফোঁজে যাবে। মা দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনে, বেঁটে, সিধে, মন্থে দৃষ্টিচস্তার ছাপ।

‘তুই চোখে ভালো দেখিস না, স্বাস্থ্য খারাপ,’ বললে মা, ‘ভয় হচ্ছে না তোর?’

‘কিছু ভেবো না মা,’ বললে বরিয়া।

‘কখনো তুই লড়িস নি, খুব কষ্ট হবে তোর।’

‘ওসব কিছু ভেবো না মা,’ থলি গোছাতে গোছাতে বলেছিল বরিয়া।

...যে গ্রামে সে যুদ্ধের তালিম নিচ্ছিল, সেখানে ওলিয়াকে নিয়ে মা গেছে বেশ কয়েক বার। কুচকাওয়াজ থেকে সে ফিরত উত্তেজিত, ক্লান্ত, ধূলোমাখা, রোদপোড়া হয়ে। বসত, গল্প হত শহর, চেনাপরিচিত, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। যুদ্ধের কথা কিছু বলত না, কেননা এমনিতেই চতুর্দিকটা যুদ্ধে ভরা।

শহরের বাইরে ভাইয়ের কাছে এই যাওয়াটা ওলিয়ার মনে হত যেন গ্রীষ্মকালের একটা ভ্রমণ, শহরের উপকণ্ঠের বাগানবাড়ি আর চেনা জায়গাগুলোয় বেরিয়ে বেড়ানোর মতো। মেঠো ফুল তুলে স্টেশনে আসত তারা, ফিরত সন্ধ্যার শহরে, শশব্যস্ততা ও সামরিক শঙ্কায় যা ভরা।

শুধু এই হালে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। ফ্রন্ট এগিয়ে এসেছে কোথায় যেন খুব কাছে। ওলিয়ার দৃষ্টিচস্তা হল আজ তারা ভাইকে খুঁজে বার করবে কী করে, আগে বরিয়াকে দেখতে

যাবার সময়কার সেই রবিবাসরীয় নিরিবির্লি বাগানবাড়ি যাত্রার মতো ব্যাপার যে আর কিছুই নেই।

গেল তারা হেমন্তের ফাঁকা ফাঁকা মাঠপেরিয়ে, বাগানবাড়িগুলোর দরজা জানলা তত্তা দিয়ে বন্ধ করা, সামনে থেকে আসছে গাড়ি, ট্রাক, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলেছে শরণার্থীরা, সঙ্গে ছেলেমেয়ে, পোটলা-পুটলি, কাঁধে বস্তা, রাস্তার ধারের নালা থেকে আকাশের দিকে কেঠো কেঠো পা উঁচিয়ে আছে মরা ঘোড়া, সৈন্যরা যাচ্ছে, ঝন্ঝন্ করছে তাদের মগ, কাছেই কোথাও গোলাগুঁড়ি চলছে কানে তাল ধরিয়ে।

কোলাহলমুখর সড়কটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তারা।

পরিচিত হাঁটা-পথটা দিয়েই তারা যাচ্ছিল, কিন্তু চারিপাশটা একেবারে বদলে গেছে: ভাঙা বেড়া, লোকজন নেই, কেমন একটা শঙ্কা, উৎকণ্ঠা, ভয়ঙ্কর কিছু একটার প্রতীক্ষা। মাঠে ঝোপঝাড়ের আড়ালে মেসিনগান নিয়ে আছে লাল ফোঁজীরা, প্রথম গাঁয়ে এসে দেখা গেল একেবারে ফাঁকা, খাঁখাঁ করছে। এমন কি চড়ুইগুলোও ধুলোয় হুটোপাটি করছে না, নেই একটিও মুরগী, একটিও কুকুর। ধোঁয়া উঠছে না চির্মনি থেকে, বাড়ির সামনের বেঁকে যাওয়া ফাঁকা বেগুগুলো দাঁড়িয়ে আছে অনাথের মতো। গাঁয়ের এমন চেহারা হয় কেবল শ্বেত রাগিতে, সবাই যখন ঘুমোয়। কিন্তু এখন কেউ ঘুমচ্ছে না, একেবারে যেন মরুভূমি।

এই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চুপচাপ কিন্তু দ্বিধাহীন পা ফেলে এগুচ্ছে মা, তার পেছ পেছ নিভঁয়ে চলেছে ওলিয়া।

দ্বিতীয় গ্রামটা জ্বলিছিল। টিপিটাতে উঠতেই তারা থেমে গেল অনিচ্ছায়। চালের ওপর লকলক করছে আগুনের লালচে জিব, কেউ তা নেবাচ্ছে না। কয়েকটা কুটির পরিণত হয়েছে কাঠের কুটির স্তুপে। অদ্ভুত দৃশ্য।

মায়ের হাত টেনে ধরেছিল ওলিয়া, মা কিন্তু শান্তভাবে বললে, ‘আমাদের যেতে হবে ওই গাছগুলোর কাছে।’ জবলন্ত বাড়িগুলোর মাঝখানকার রাস্তা দিয়ে চলল ওরা।

গ্রামটা পেরিয়ে ওরা যখন নিচুতে নামল, শোনা গেল একটা ক্রমবর্ধমান তীক্ষ্ণ শিস, এত একগুঁয়ের মতো অমোঘভাবে তা কাঁছিয়ে আসছে যে শব্দে যন্ত্রণা করে ওঠে কান।

মা থেমে মাথা নিচু করলে, ওলিয়াও তাই। ওরা বদ্বীপে পারাছিল যে ঠিক করছে না, ছুটে রাস্তায় গিয়ে মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে থাকা উচিত, কিন্তু ওদের যে খুঁজে বার করতে হবে বরিয়াকে, গোলা আসছে দেখে প্রতিবার যদি তাদের মাটিতে শব্দে হয়, তাহলে ওর কাছে আর পেরাঁছনো যাবে না, কখনোই আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

গোলাটা ফাটল টিলার ওপারে। ধীরে ধীরে মাটির ফোয়ারা নেমে এল বাতাসে। সেটা থিতোতেই আরেকটা গোলা ফাটল।

এরপর তারা ছুটে লাগল ঝোপে-ঝাড়ে হোঁচট খেতে খেতে। কেননা রাস্তায় অবিরাম উঠছে লাল বিদ্যুতের ঝলক দেওয়া কালো কালো কুন্ডলী। সারা গা ওলিয়ার কাঁপছিল, ঠোঁট শব্দ দিয়ে উঠল, কিন্তু একভাবে চলেছে মা, তার পেছ পেছ ওলিয়া, মনে তার এক খাপছাড়া চিন্তা: আমাদের ওপর পড়বে না, পড়া চলবে না, পড়া চলবে না...

বরিয়া যে গ্রামটাতে ছিল, সামরিক তালিম নিত, তা আর স্নেহ নেই। তার জায়গায় খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে কালো কালো খুঁটি, কোথাও কোথাও অঙ্গারীভূত তক্তার বিকট স্তূপ জমেছে। গাছগুলো পর্যন্ত পড়ে গেছে কিংবা শিকড় সমেত উপড়ে এসে পড়ে আছে সবজিতে ঘোলা জল ভরা প্রকান্ড প্রকান্ড গহ্বরে।

ওলিয়া বললে, ‘এবার আর কোথায় যাব মা?’

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মা। দেখে ভারি কষ্ট হল ওলিয়ার, এত ছোট্ট, ক্লান্ত, জেদী।

ফের সে বললে, ‘চল মা, বাড়ি ফিরে যাই। এখন আর যাব কোথায়?’

মা বললে, ‘চল একটু এগোই, সেখানে কাউকে জিজ্ঞেস করব...’

ফের চলল তারা। তখন ঘাসের ওপর, খাদে, সর্বত্রই দেখা গেল লাল ফোঁজীরা শূয়ে আছে, তাকিয়ে দেখছে বাঁ দিকে। হঠাৎ ছোট্ট একটা স্নানের ঘর থেকে তিনজন সৈন্য বেরিয়ে এল তাদের দিকে।

মা এগিয়ে গেল তাদের কাছে। তাদের মধ্যে একজন ছিল রোগা, ঢেঙা, ছদ্মলি ভরা মুখ, খুঁশি হয়ে মা তাকে বললে:

‘আমার ভুল না হলে আপনি পার্ভলিক, তাই না?’

অবাক হয়ে সৈনিকটি চোখ বড়ো বড়ো করলে, তার সামনে দাঁড়ানো বেঁটে মহিলাটির দিকে মন দিয়ে এক নজর দেখে বললে:

‘আর আপনি বরিয়ার মা, না?’

মা বললে, ‘হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কোথায় পাওয়া যায় ওকে?’

‘কোথায় পাবেন?’ খানিকটা হতভম্বের মতো বললে পার্ভলিক, ‘যেমন এসেছেন তেমনি সোজা এগিয়ে যান, ওই টিলাটার, তবে আপনার না যাওয়াই ভালো... ওকে খুঁজে পাওয়া আপনার পক্ষে কঠিন হবে, তাছাড়া,’ হঠাৎ হেসে ফেললে সে, ‘চারিদিকে যে লড়াই চলছে, আমরা প্রায় ঘেরাও হয়ে গেছি, আপনারা এখানে বেরিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?..’

‘আমরা বেড়াচ্ছি না,’ বললে মা, ‘বরিয়ার কাছে যেতে হবে আমার, দরকার আছে...’

কথাটা সে এমন উদীপ্ত গাঢ় গলায় বললে যে পার্ভলিক (সে পড়ত বরিয়ার সঙ্গে একই কলেজে, আছে একই ব্যাটার্লিয়নে) শব্দ জবাব দিলে:

‘বেশ, যান...’

...লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে স্নানঘরের কাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিল মা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওলিয়াও বসেছিল পাশেই। একজন লাল ফোঁজী দেখালে নিচুতে, জলা-জলা একটা লম্বা মাঠের দিকে, ঝোপঝাড় তা ভরা, কোথাও কোথাও ঝক্‌ঝক্‌ করছে ছোটো একটা নদীর জ্বলজ্বলে পাক। মাঠটা গিয়ে ঠেকেছে বনে, আর বনের পেছনে টিলার ওপর একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত এলাকাটা জুড়ে যা চলছে, তাকে বলা যায় চোখ ধাঁধানো গর্জন। পেছন দিকের কোথেকে আমাদের কামানগুলো সেই গাঁয়ের উপর গোলাবর্ষণ করছে, আর জার্মান কামান গোলা দাগছে এই মাঠটায় আর ওলিয়া আর মা যে টিবিটায় বসেছিল তার পায়ের কাছে।

‘ওরা এইমাত্র আক্রমণে নেমেছে,’ বললে লাল ফোঁজী, ‘আপনি বসে থাকবেন কি না সেটা আপনার ইচ্ছে। ওই যে ওখানে... আক্রমণে নেমেছে...’

‘বরিয়াকে আপনি চেনেন?’ জিজ্ঞেস করলে মা।

‘চিনব না মানে? চিনি বইকি। সেও আছে ওখানে...’

‘গুলি চালায় কেমন?’

‘দাঁবি চালায়।’

‘ভড়কায় না?’

প্রান্তন কলেজ-ছাত্র এই লাল ফোঁজী ক্ষুব্ধ হয়ে কাঁধ নাড়ালে:

‘ভয় পেলে ওকে আমাদের দলে নিতাম না...’

দু’জনেই চুপ করে গেল। চুপ করে দেখতে লাগল টিলার ওপরকার গ্রামটা জ্বলছে, বন থেকে ভেসে আসছে লোকজনের হুন্স, চিৎকার করছে ‘হু-র-রে-রে’ কিংবা লম্বা কী একটা ধ্বনি,

কথাগুলো ধরা যায় না। দাবদাহের লালিমায় উদ্ভাসিত বনটা মনে হল রক্তমাখা।

উঠে গিয়ে মা গেল টিলাটার প্রান্তে। মনে হল যেন তার ছেলেকে দেখতে চাইছে সে, লড়াইয়ে বিদীর্ণ মাঠটায় তাকে যেন সে দেখবে, রাইফেল নিয়ে ছুটছে ওইখানে, জ্বলন্ত গ্রামটার দিকে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মা।

তারপর সে ওলিয়াকে বললে:

‘চল যাই,’ এবং কোনো দিকে আর না তাকিয়ে হাঁটা-পথটা ধরে চলল রাস্তার দিকে।

‘অপেক্ষা করবেন না?’ হাঁক দিলে লাল ফোঁজী।

মা বললে, ‘না, আলাপটার জন্যে ধন্যবাদ। চল যাই, ওলিয়া।’
সড়কে গিয়ে উঠল ওরা।

মা বললে, ‘ওলিয়া, সোনা আমার, হাঁপিয়ে গেছিঁস তুই...’

‘না মা, শ্বুধু ভয় হচ্ছে পেঁছতে পারব তো। কেমন যেন ভীরু হয়ে গেছিঁ।’

পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসল মা।

‘আমাদের কিছুই হবে না রে।’ তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, ‘জানিস ওলিয়া, এবার আর আমার ভাবনা নেই। প্রাণ আমার শান্ত। আমার কেবলি ভয় হত ও যুদ্ধে যেতে পারবে না, শরীরটা দুর্বল, চোখ খারাপ, ঠিক করেছিলাম যাচাই করে দেখব। তা যাচাই করা হল। ছেলে আমার সবার মতোই লড়ছে। তার বেশি আমার কিছু চাই না। চল বাড়ি ফিরি।’

ছোটো ছোটো ক্ষিপ্ত পা ফেলে ফিরে চলল সে, বেংটে, সিধে, লঘুভার...

বামনরা আসছে



বড়োদের ব্যাপার বাচ্চা ভিত্তিয়া বিশেষ বুদ্ধাত না, কিন্তু আজ সকালে তার কাছেও পরিষ্কার হয়ে গেল যে খুব একটা বিছাছিঁরি আর আতঙ্কের কান্ড ঘটছে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হস্তদন্ত হয়ে লোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গরু ভেড়ার পাল, গাড়ি হাঁকাচ্ছে, তাতে রাজ্যের সাংসারিক জিনিসপত্র, চ্যাঁচাচ্ছে বাচ্চারা, মেয়েরা কাঁদছে আর খুব কাছেই কোথায় গোলা দাগছে কামান।

হতভম্ব মুখে কীসব পোঁটলা বাঁধছে তার মা, আর থেকে থেকেই তাকে বলছে, ‘বসে থাক চুপচাপ, ঝামেলা বাড়াস না, তোর দিকে মন দেবার আমার সময় নেই।’ তারপর সে চাইল জানলা দিয়ে, ছুটে গেল অলিন্দে, দূরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, তারপর উদ্ভ্রান্তের মতো আপন মনেই বলতে লাগল: ‘কিস্তিয়া কাকু আসছে না কেন? সত্যি, কেন যে আসছে না! এখানে আমরা থাকব কেমন করে, তা যে হতে পারে না...’

হাতে একটা কাঠি নিয়ে ভিত্তিয়া চুপিচুপি বেরিয়ে এল অলিন্দে, কৌতূহলে তাকিয়ে রইল গাঁয়ের রাস্তার দিকে, এরকম সময়ে এত লোক কখনো তা দিয়ে যায় নি, এত সোরগোলও কখনো শোনা যায় নি। তবে সব চাপা পড়েছে কামানের গর্জনে। কখনো তা গুম্‌গুম্‌ করছে টিলার পেছনকার কোনো একটা জায়গা থেকে, কখনো কান-ফাটিয়ে বাতাস বিদীর্ণ করছে একেবারে কোথাও যেন কাছেই।

লোকে সবচেয়ে বেশি করে বলছিল একটা কথা, সেটা হল জার্মান। ভিত্তিয়া ভেবে পায় না কে তারা, এল কোথেকে। এই হৈচৈর মধ্যে তা জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। কী ঘটছে তা ওকে

বোঝাবার চাইতে এমনিতেই বড়োদের ঢের কাজ। কিন্তু মায়ের আকুলতা তাকেও ছুঁয়েছিল, চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে সে আর পারিছিল না, সব সৈখানে অগোছালো, চতুর্দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, টেবিলে প্রাতরাশের নোংরা বাসন; ও দেখল ঘরের বেড়ালটা জানলায় বসে বসে ঘট থেকে দুধ খাচ্ছে, মা তা দেখেও তাকে তাড়া দিচ্ছে না, যেন এমনটিই হওয়া উচিত।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে হাতের কাঠিটা নাড়াচ্ছিল সে। নিঃশব্দে বোর্কা এসে তার হাত ধরলে। বোর্কার দিকে তাকাল ভিত্তিয়া, ভেবেছিল আজ বোর্কাকেও অন্যরকম লাগবে, কিন্তু বোর্কা সেই আগের মতোই, কেবল মাথার ঝুঁটিটা অনেক এলোমেলো, আর অদ্ভুত কিছু একটা ভাবনা মাথায় খেললে ওর চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি চকচকে ওর চোখ। অনদ্ভূতি না নিয়ে বনে কি জলা, কি স্টেশনে চলে যাওয়া ওর কাছে একটা আনন্দের ব্যাপার।

এবারও ভিত্তিয়ার হাত ধরে সে বললে:

‘চল, তোকে একটা জিনিস দেখাব, শিগগির!’

সম্মোহিতের মতো ভিত্তিয়া চলল তার পেছা পেছা। ভিত্তিয়ার হাত ধরে খালি পায়ে ধুলো ভেঙে যাচ্ছিল বোর্কা, চেনা রাস্তাটা দিয়ে ওকে সে নিয়ে গেল গাঁয়ের প্রান্তে। সেখানে টিপির ওপর একটা পুরনো গির্জা, আর তার উঁচু ঘণ্টা-মিনার, বাচ্চারা সেখানে ঢুকতে পায় না, কেননা কলখজের বড়ো জমাদার সেটা বন্ধ করে রাখত, বাচ্চারা তাই মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখত তার ছাদের দিকে, যেখানে ছিটিছিট রঙের পায়রাবের বাসা, ঘুরে বেড়াত তারা কার্নিসে, কিন্তু এত উঁচুতে যে গুলতিতেও নাগাল পাওয়া যেত না।

কিন্তু আজ কেমন পাগলাটে দিন, ঘণ্টা-মিনারের দরজা খোলা, কোথাও কোনো পাহারা নেই। প্রথমে ঢুকল বোর্কা, ভাঙা সিঁড়িতে পা হড়কিয়ে তার পেছা পেছা ভিত্তিয়া। অনেকক্ষণ চুপিচুপি

তারা উঠতে লাগল কেবলি ওপরে। বোর্কা ভিত্তিয়ার দিকে ফিরে একটা ভয়ঙ্কর মূখভঙ্গি ক'রে হুঁশিয়ারি দিয়ে হাত তুললে। অস্থির কোতূহলে ভিত্তিয়া চাইলে ধূসর দেওয়ালগুলোর দিকে, নানারকম লেখা আর আঁকায় তা কাটাকুটি, তবে ভালো করে দেখার সময় ছিল না। শেষ পর্যন্ত একেবারে ওপরে উঠে এল তারা, রোদের ঝলক লাগল মূখে। জ্বলজ্বলে নীল আকাশ বিছিয়ে আছে টিলাগুলোর ওপর। দেখা যাচ্ছিল একেবারে দূরের বন, মাঠ, নদী — সবকিছু, যেন ছবিতে আঁকা। কড়ি-বর্গার মধ্যে দিয়ে মাথা তুললে ভিত্তিয়া, অনভ্যস্ত এই উচ্চতায় বুক দ্বন্দ্বদ্বন্দ্ব করে উঠল তার।

প্রথমটা কিছুই তার মাথায় ঢুকল না, বিস্মৃতির একটা নতুন অনুভূতি জাগল তার মনে।

আঙুল দিয়ে বোর্কা তাকে খাদটার দিকে দেখালে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মেঘ উঠছিল, প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল, ঝিলিক দিচ্ছিল আগুন।

‘কী ওটা?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে সে।

‘হাঁদা,’ বোর্কা বললে একটা আত্মমর্যাদা নিয়ে, ‘ওটা কামান, আর ওই দিকে দেখ, ওগুলো আমাদের মেসিনগান।’

বোর্কা ছিল বয়সে একটু বড়ো, দলের পাণ্ডা, সবই তার জানা। হঠাৎ ঠিক ঘণ্টা-মিনারের ওপরেই শোনা গেল দুর্বোধ্য একটা প্রচণ্ড তুড়ি-মারার মতো শব্দ, কীসব ঝরে পড়ল ব্যতাসে, ঘা মারলে কাছের চালাগুলোয়, গাছে, উড়ে গেল পাতা, ঝন্ঝনিয়ে উঠল কাচ, নিচে কুটিরগুলোর মাঝখান থেকে কোথায় চিৎকার শোনা গেল।

আঁতকে ভিত্তিয়া মেঝের ওপর বসতে না বসতেই বোর্কা এমনভাবে তার হাতে টান মারলে যে ব্যথা করে উঠল, চ্যাঁচাল:

‘ওই দ্যাখ, বামনরা আসছে, বামনরা আসছে!’

ভিত্তিয়া গদুড়ি মেরে এগিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যে দিকটায় ওর বন্ধু দেখিয়েছিল। একেবারে নদীটার কাছে, মাঠের ওপর ঝোপ থেকে ঝোপে গদুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে কালো পোষাক পরা কীসব লোক, দূরত্বের জন্যে তাদের দেখাচ্ছে বেঁটে বেঁটে। ভিত্তিয়ারও মনে হল ওরা যেন হিংস্র ভয়াবহ একদল বামন, আসছে তারা তাকে, বোর্কাকে, মাকে, গাঁয়ে যারা ছিল সবাইকেই খুন করতে। কখনো থামছে তারা, কীসব করছে, কখনো উপদুড় হয়ে পড়ছে মাটিতে, ফের উঠছে, লুক্কিয়ে পড়ছে ঝোপের আড়ালে, উঠে আসছে খাল-খন্দ থেকে, সংখ্যায় এই বামনগদুলো অনেক, কে জানে এল কোথেকে, যেন ভয়ংকর এক কাহিনী।

সবকিছুই এমন অবাস্তব যে ভিত্তিয়া তার সব ভয় ভুলে চেয়ে দেখতে লাগল। যখন ওদের মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল উৎক্ষিপ্ত মাটির ফোয়ারা, পড়ে যাচ্ছিল বামনরা, তখন ভিত্তিয়ার হাত চেপে উত্তেজনায় চোঁচিয়ে উঠছিল বোর্কা। এবার লোহার কসকস শব্দ তুলে শিস দিয়ে গোলাগদুলো যাচ্ছিল ঘণ্টা-মিনারের ওপর দিয়ে। বাঁ দিকের কোনখান থেকে খট্‌খটিয়ে উঠল মেসিনগান, তা থেকে আড়াল নেবার জন্যে মাটিতে শূয়ে পড়ল বামনরা।

তারপর তারা এক এক করে বন্ধু ছেঁচড়ে এগুতে লাগল। এতক্ষণে ভিত্তিয়ার মনে হল মা ওকে গাঁয়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, নিশ্চয় চিৎকার করছে, কাঁদছে, বোর্কা ফের একটা ‘কান্ড করেছে’ (ওর সম্পর্কে সবাই যা বলে), শিগাগির, শিগাগির এখান থেকে পালানো দরকার। কালো কালো এই মর্তিগদুলো তার দৃষ্টিকে টেনে ধরে রেখেছিল তা সত্যি, তাদের কাছে থেকে, তাদের ঘোরাফেরা, বিদ্‌ঘুটে লাফ ঝাঁপ, শূয়ে পড়া থেকে চোখ ফেরানো ছিল অসম্ভব, কিন্তু পালানো দরকার, কেননা গোলা এসে পড়ছিল খুব কাছেই, ঘণ্টা-মিনার কাঁপছিল ঠিক নাগরদোলার ঘোড়ার মতো।

ভিত্তিয়া ছুটে নামল নিচে, দেয়াল ধরে ধরে বোর্কাও তার পেছা পেছা।

নিচে গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ে ভিত্তিয়া বোর্কাকে আর খুঁজে পেল না। তবে বোর্কার দিকে তার আর তখন লক্ষ্য ছিল না। নিচে গোলাগুলির শব্দ তখন আরো ভয়ঙ্কর, লোকে চিৎকার করছে আরো বেশি। একেবারে শেষ মূহুর্তে ভিত্তিয়া পেঁছিল বাড়িতে। কেঁদে কেঁদে ফোলা চোখে মা তাকে দেখতেই চোঁচিয়ে উঠল:

‘কোথায় তুই ছিলি, কস্তিয়া কাকু এসে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি ওই থলিটা নে। শিগগির চলে যেতে হবে। জার্মানরা আসছে...’

ভিত্তিয়া বললে, ‘মা, আমি ওদের দেখলাম। ভয় নেই মা, ওরা সব বামন...’

কিন্তু মা ওর কথা শুনলে না, পোটলা-পুটলি নিয়ে সে ছুটে গেল অলিন্দে, পিঠে তার একটা বস্তা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা ট্রাক।

কস্তিয়া কাকু মেয়ে আর বাচ্চাদের বসালে ট্রাকে, সারা শরীর তার ধুলো মাখা, মোচ পর্যন্ত শাদা শাদা ধুলোয় ধুসর, বললে:

‘ব্যস্ত হয়ো না গো, ভাবনা নেই, তোমাদের ফেলে রেখে যাব না...’

গাড়িতে স্টার্ট দিলে ড্রাইভার। ভিত্তিয়ার মা যখন তার পোটলা-পুটলির ওপর বসলে, ভিত্তিয়া তখন গাড়ির ধার ধরে দাঁড়িয়ে দেখলে যে, ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গাঁয়ের রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে বড়ো বড়ো ট্রাক, একের পর এক লাল ফোঁজীরা নেমে আসছে তা থেকে। হাতে তাদের রাইফেল, লাফিয়ে নেমেই তারা রাস্তার ওপর সারি দিচ্ছে।

দম বন্ধ করে ভিত্তিয়া দেখল তাদের বৃষস্কন্ধ মূর্তি, রোদপোড়া কঁচি কঁচি মুখ, মেসিনগান তুলে ধরা জোরালো হাত। মনে হল

এরা যেন অসম্ভব দীর্ঘকায়। যেসব বামনরা এখানে মাঠ বেয়ে
গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছিল, তাদের চেয়ে অনেক লম্বা লাগল
এখানকার সবচেয়ে খাটো লোকটিকেও। মাকে সে বললে:

‘এইবার বামনদের দফা রফা!..’

মা কী একটা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ড্রাইভার তখন স্টিয়ারিং
ধরে গাড়িটা চালিয়ে দিলে, গাড়িটাও থরথর ক’রে কেঁপে লাল
ফৌজীদের গাড়িটা ছাড়িয়ে চলে গেল।

ঘড়লোর ভেতরে ভিত্তিয়ার আর কিছু ঠাঠর হল না, ধাক্কা
থেয়ে সে মায়ের পেঁটলা-পুঁটলির ওপর পড়ে গেল এবং মা তাকে
বুকে চেপে ধরল। পড়ে থেকেও তার মনে পড়ছিল কী সে দেখেছে
ঘণ্টা-মিনার থেকে, বোর্কার সঙ্গে গিয়ে কীসব তার মনে হয়েছে।
তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সে, অনেক হৈঁচৈ হয় তারপর।
বৃষ্টি নামে, চেঁচামেঁচি করে লোকজন, দেখা দেয় ঘরবাড়ি, রাস্তা
হয়ে ওঠে মসৃণ, গাড়ি যায় সমান তালে, সে জাগে আর ঘুমোয়।
ঘুমন্ত অবস্থাতেই মা তার মুখে গোঁজে মাখন মাখা রুঁটি। ঘুমতে
ঘুমতেই তা সে চিবোয়। কিন্তু একটা জিনিস তার মনে রয়ে গেল
চিরকাল: মাঠের নীলাভ প্রসারতায় হিংস্র ভয়াবহ এই বামনগড়লোর
মর্দিত, আর বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘকায়, সুন্দর লাল ফৌজীরা, কে জানে
কোথেকে আসা এই লোকগড়লোর মদুখোমদুখি হবার জন্যে যারা
লাফিয়ে নামছে ট্রাক থেকে।

অগ্নিকুণ্ড



চিকিৎসা ব্যাটার্লিয়নের কমিশার আনা সিসয়েভা পারত না শূদ্ধ একটি জিনিস — লম্বা বজ্রতা দেওয়া। এবারও সবাই যাতে দেখতে পায় তার জন্যে গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পাথরুরে মাঠটায় উঁচু উঁচু পাইন গাছের তলে পাথরগুলোর মাঝখানে দাঁড়ানো স্বেচ্ছারতী মেয়েদের বিচিত্র জটলাটায় চোখ বুলিয়ে শূদ্ধ বললে:

‘শোনো মেয়েরা, ভোরে আমাদের সমস্ত আহতদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সমস্ত লটবহর তুলতে হবে স্টিমারে। রাস্তা এখানে নেই, যেতে হবে হাঁটা-পথ ধরে, পাথরগুলোর ওপর দিয়ে। তা বোমা ফেলতে পারে। গুলিও চালাতে পারে। আমাদের তো এই প্রথম নয়। শূদ্ধ একটা কথা: ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা আছে, তা কিন্তু ফেলে যেতে হবে। সঙ্গে আমাদের নানারকম জিনিস আছে, যখন জুড়িয়ে ছিলাম, যুদ্ধের কথা তো ভাবি নি। এখন তা ফেলে দিতে হচ্ছে। এই কথাটিই বলতে চাইছি। পোষাক-পাতি সব বরবাদ। প্রথম কাজ হল আহত আর আমাদের চিকিৎসা ব্যাটার্লিয়ন। কেমন?’

সবার হয়ে জবাব দিলে মারদুসিয়া ভলকভা। বললে:

‘কমরেড কমিশার, সবই তামিল করব, সব ঠিকঠাক চলবে, শূদ্ধ...’ এইখানে একটু থতমত খেলে সে, ‘তা কী হবে, দরকার যখন, পোষাক কি কখনো দেখি নি। চুলোয় যাক গে... বেঁচে থাকলে পোষাক হবে অনেক।’

‘ঠিক কথা!’ চিংকার উঠল চারিদিক থেকে।

কিন্তু অনিশ্চিত কণ্ঠস্বরগুলো থেকে সিসয়েভা টের পেল যে জামাকাপড় ফেলে যাওয়া ওদের পক্ষে কঠিন, চিকিৎসা

ব্যাটালিয়নে সে যে কড়া শৃংখলা চালু রেখেছে শুধু তার জোরেই মেয়েগুলো এত বড়ো লোকসানটা সহিতে পারছে।

‘এই তো দিব্য কথা,’ বললে সিসয়েভা, সে যে ওদের অনিশ্চয়তা টের পেয়েছে তা প্রকাশ করলে না, ‘যাও রাতের খাওয়া খেয়ে নাও, তারপর প্যাক করা। ঘুমিয়ে নিয়ে ভোরেই শুরুর করব।’

মাঠটা ফাঁকা হয়ে গেল। আলো থাকতে থাকতেই সিসয়েভা ভোরের যাত্রাপথটা আরো একবার পরীক্ষা করল, নিচে একেবারে জলের কাছে জায়গাটা ঠিকঠাক করে নেবার জন্যে খাটল মোডিকেল আর্দালিদের সঙ্গে, গ্যাং-প্লাঙ্কের ওপর দিয়ে আহতদের জাহাজে তুলে দেওয়া তাতে সহজ হবে, তারপর তালিকা তৈরি করল ডাক্তারদের সঙ্গে, হুকুম-টুকুম যা দেবার দিলে, তারপর গোছাল নিজের থলিটি আর দলিলপত্রের কেসটা, যার নাম সে দিয়েছিল চলমান দপ্তর, এবং হঠাৎ লক্ষ করল অন্ধকার হয়ে গেছে, রাত নেমেছে।

চারিদিক চূপচাপ। তাঁবু থেকে বেরিয়ে চিন্তিতভাবে সে পাহাড়ে উঠতে লাগলে। ফের মনে পড়ল স্বামীর কথা, পশ্চাত্তাগে লড়ছে সে। কাল ছোট্ট একটু চিরকুট পাঠিয়েছিল স্বামী, তাতে শুধু লেখা যে সে ভালো আছে, আর তার পিয়ন কর্তার মতোই সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল যে ওখানে অবস্থাটা কড়া, বাস। সারা দিন ধরে যত আহত এসেছে তাদের কাছ থেকে নিজেই সে জানে যে উপকূলটা নিয়ে ঘোর লড়াই চলছে, যে করেই হোক কাল ভোরেই আহতদের সরিয়ে নেওয়া দরকার। কাল কাছেই বনের মধ্যে গোলা ফেটেছে, সকাল নাগাদ গোটা উপকূল জুড়েই অগ্নিবর্ষণ শুরুর হবে।

এরপর তার মনে পড়ল স্থানান্তরিতা মেয়ের কথা, মাসীর সঙ্গে লেনিনগ্রাদে থাকত সে। আর মনে পড়ল স্বেচ্ছাসেবিকা

মেয়েগুলোকে। ড্রেস, জুতো, রেনকোট, ওভারকোট, টুপি — যুদ্ধের আগে উত্তরের নতুন নতুন শহরে কাজ করে যা কিছ্ তারা জমিয়েছিল সব ফেলে যেতে হবে জেনে কী মুষড়েই না পড়েছে ওরা।

এমন উচ্ছল শরতে না নেচে, খোশ মেজাজে হাওয়া না খেয়ে অগ্নিবর্ষণের মাঝখানে আহতদের টেনে আনতে হচ্ছে ওদের। রক্ত আর কাদা মাখতে হচ্ছে, জলা ভেঙে, বৃষ্টিতে ভিজ়ে, রাতে না ঘুমিয়ে সহঁতে হচ্ছে যতকিছ্ কৃচ্ছতা। ভালো মেয়ে এরা, ফুর্তিবাজ, দরকার হলে নিৰ্ভয়া। ওই মার্দুসিয়া ভলকভা, গুলি চালায় সে স্নাইপারদের চেয়ে খারাপ নয়। নিজেদের জিনিসপত্র ওরা ছাড়ল কী করে? দাঁড়াও না, চুপিচুপি চোখের জল ফেলছে বোধ হয়। ওদের বলা দরকার যে জিনিসগুলো এলোমেলো ফেলে যাওয়া ঠিক নয়, লুকিয়ে রাখা দরকার, ধরো বালির গর্তে, তাহলে একটা শৃংখলা থাকবে।

বনের গহনে চাপা দুটো গলার স্বর ভেসে এল তার কাছে, ঝোপ-ঝাড়ের ওপরে অগ্নিকুণ্ডের ফুলকি উড়তে দেখা গেল। একটা বড় পাথরের ওপর উঠে মোটা একটা ফার গাছের ঝালরের মতো শাখার আড়াল থেকে উঁকি দিতে আশ্চর্য একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তার, ঠিক যেন কোনো অপেরা, বসে আছে সে থিয়েটারের বক্সে, রূপকথার ব্যালে চলছে সামনে।

ফট্‌ফট্‌ শব্দ করে মস্তো এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে গহবরে, পাহাড় বেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা নামছে সেখানে। স্কাটকেস, ঝোলা, এমনকি স্নেফ মোড়ক বয়ে আনছে মেয়েগুলো, অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার পাথরটায় দাঁড়িয়ে তারা জ্বলন্ত আগুনে ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে যত রাজ্যের জিনিস। আগুনে গিয়ে পড়ছে সোনালী বগলস দেওয়া জুতো, রঙীন কোমরবন্ধ, ফুল প্রজাপতি জাহাজ আঁকা সব ড্রেস, নীল সবুজ লাল উত্তরীয়, আগুনেও যাদের রঙ নষ্ট হচ্ছে না।

হুতাশন গ্রাস করছে রুমাল আর হার, মটর-মালা আর হাতি-বেড়ালের ধাতব মূর্তি বসানো ঝকঝক কলারের ব্লাউজ। অগ্নিকুণ্ড ঠিক যেন তৃষিতের মতো তার বড়ো বড়ো লাল হাত পেতে সবকিছু গ্রহণ করছে, আর ক্রমাগত অর্ঘ্য এসে পড়ছে সেখানে। ধোঁয়া বিছিয়ে গেল বনের ওপর দিয়ে, পাথরগুলোর মাঝখানের সংকীর্ণ ফাটল দিয়ে তা নেমে এল নিচের হুদে।

আগ্নেয় গহবরে ভেসে আসা জিনিসগুলোকে দেখা যেতে লাগল ক্রমেই কম, ফালিতে ফালিতে ছড়িয়ে পড়ল বেশভূষার অঙ্গার, আর এই নানা রঙের ফালিগুলো আশ্চর্য ঝালর উড়িয়ে ধীরে ধীরে দাবিয়ে দিল নীলাভ শিখাকে, যেন অগ্নিকুণ্ডের ক্ষিদে মিটেছে, এখন আলস্যে রোমন্থন করছে বাকিটা।

ফার গাছটার নিচে বসে সিসয়েভা দেখলে যেন উদ্দাম হয়ে ঠেলাঠেলি করে মেয়েরা মস্তো একটা কাঠি দিয়ে আগুন উসকাচ্ছে। শেষটায় হাসিখুশি আর লঘুভার ওই মেয়েলী জিনিসগুলোর চিতাভস্মের ওপর সমাধিমন্দিরের মতো উঁচু হয়ে উঠল স্ল্যটকেস আর ব্যাগের একটা স্তূপ। পুড়ে গেল অগ্নিকুণ্ড। তাড়াতাড়ি যাতে তা পুড়ে শেষ হয়, সেজন্যে মেয়েরা আলতাল করে দিলে অঙ্গারগুলো। তারপর তা নীল হয়ে আসতে মূঠো মূঠো বালি ছড়াল তাতে। বালি ছড়াল উদ্দাম হয়ে। অঙ্গারগুলোর ওপর পড়ল বালির স্তর, ফোঁসফোঁস করল, ক্রমেই পুরনু হয়ে উঠল তা। তারপর অগ্নিকুণ্ডটার জায়গায় যখন দেখা দিল ধিকিধিকি জ্বলা ঘাসের রেখায় ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গা, তখন চাঁদ উঠল।

অদ্ভুত এই নৈশ দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সিসয়েভা। বালিয়াড়ির মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে মারুসিয়া ভলকভা চিৎকার করে বললে:

‘ভালো বুদ্ধি এসেছিল মাথায়, তাই না? আমাদের জিনিসগুলো ফ্যাসিস্টদের হাতে যাবে, তারা বড়াই করবে? জীবনেও নয়! এবার মেয়েরা, ঘূর্ণি নাচ! তবে আস্তে।’

‘সেই গল্পের মতো,’ বললে কে যেন, ‘কিছুটা গুলি করা যাক, তবে আস্তে, গোলমাল না করে...’

নিঃশব্দে গহ্বরটায় নেমে হাত ধরাধরি করে মেয়েরা পেয়ারের ভস্ম ঘিরে নাচ শুরুর করলে। জ্যোৎস্নায়, বড়ো বড়ো ফার আর পাইনের ছায়ায় ঘুরপাক খেল তারা, এল আর গেল, বালিয়াড়ির ওপর নড়াচড়া করল তাদের ছায়া।

‘একেবারে অপেরার মতো,’ বলে কেমন করে যেন ঘূর্মিয়ে পড়ল সিসয়েভা। নিজেরই খেয়াল ছিল না। ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ল সে, ফার গাছ তার মখমলী থাবায় ঢেকে দিল তাকে, সজাগ, সতর্ক, তাহলেও মধুর ঘূমে ঘূর্মিয়ে পড়ল সিসয়েভা, নিচে ঘূর্ণ্যমান মেয়েদের খসখস শব্দের ক্ষীণ রেশ ভেসে আসছিল।

গায়ের ওপর একটা শূকনো ছোট্ট ডাল পড়ায় ঘূম ভেঙে গেল তার। জেগে উঠল সে। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরুর করল। শনশন করতে লাগল গাছগুলোর চুড়ো। চাঁদ উঠে এসেছে আকাশের উঁচুতে। চারিদিক চুপচাপ। ‘হয়ত সবটাই স্বপ্ন?’ ভাবল সিসয়েভা, অসাড় পাদুটো ঘসে উঠে দাঁড়াল, গাছের গুঁড়িটা ধরে নেমে এল বালুময় গহ্বরে। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা গেল অগ্নিকুণ্ড ঢাকা বালুস্তরটার ওপর অসংখ্য ছোটো ছোটো পদচিহ্ন। সে বালি উষ, নরম।

নিচে বহু দূরে ঝোপঝাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে চিকচিক করছে বিরাট হুদটা। উঁচুতে কোথায় পাক দিচ্ছে বিমান।

‘ওদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা হয়েছিল,’ বললে সিসয়েভা, ‘ভেবেছিলাম কাঁদবে, অথচ সাবাস মেয়ে সব। ভারি ভালোবাসি

ওদের, তবে সে কথা কখনো বলব না, গুমর বাড়বে। ওরা ভেবেছিল সব গোপনে গোপনে সারবে। অথচ ওদের গোপন ব্যাপার আমার ম্ঠেয়। তবে আমার কাছ থেকে ওদের আবার গোপন কী? আমি ওদের কমিশার নই নাকি?’

একথা ভেবে খুঁশি লাগল তার, দ্রুত নামতে লাগল ধুধু তাঁবুগুলোর দিকে।



বরাবরের মতোই পোস্টের ওপর কাজ করছিল রুবাইন। পোস্টে যে লোহার সঁজি-ডাণ্ডাটা বিঁধিয়ে ছিল অভ্যাস বশে পরখ করল সেটা, ঝুলিয়ে রাখল, অভ্যাস বশেই ওপর থেকে চারিদিক চেয়ে দেখলে, নিচের ট্রাকটা চোখে পড়ল, তাতে একটা বাড়তি চাকা, ফাঁকা ক্যান, দাঁড়ি আর ন্যাতাকানি। সিজভ ইঞ্জিন নিয়ে পড়েছে। পাখমভ বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করছে। সবই পরিচিত দৃশ্য, বহু বার তা দেখা। দূরে উঁচু হয়ে উঠেছে কোনো একটা গুদামের ক্যাম্যুফ্লেজ করা সিস্টার্ন, হলুদ-রঙা উঁচু বেড়া, তার কোণে কোণে সান্দ্রীদের পোস্ট, বাঁক নেওয়া একটা এম্ব্যাঙ্কমেন্ট, ধূলিধূসর নিঃসঙ্গ গাছগুলোর ছায়ায় কয়েকটা ছোটো ছোটো বাড়ি, পিচ-ঢালা একটা রাস্তা শেষ হয়েছে গুদামটির কাছে, সেখানটায় রেল-ক্রসিং।

সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় হেমন্তের জানানি দিচ্ছিল, আর গোলাগুলিতে ছিঁড়ে যাওয়া এই তারগুলো না থাকলে ওর কাছে, ইলেকট্রিক লাইনের মিস্ট্রি রুবাইনের কাছে সবকিছুই মনে হত নিত্য-নৈমিত্তিক। শিস দিতে দিতে কাজ করে গেলেই হল, এই তো আর প্রথম নয়।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল নিঃসঙ্গ এক-একটা লোক, ট্রাক ছুটছে, দূরের ওই টিলাগুলোর দিকে খট্‌খট্‌ করছে মের্সিনগান, আর মাথাটা ঝট করে ঘোরালে চোখে পড়বে নীলাভ ভাপের মধ্যে শহুরে বাড়ির অরণ্য, তার ওপর চিমনি। চিমনিগুলো থেকে ভেসে আসছে রঙচঙে ধোঁয়ার লম্বা রেখা, ঠিক যেন স্কুলের ড্রয়িং, রঙ পেনসিলে খুঁকি তা রাঙিয়েছে। ‘মেয়েটি আমার শিল্পী হবে,’ ভাবলে

রুবাখিন। কাজের সময় ওর ভাবনাগুলো হয় ভারি লঘু, কেননা সমস্ত মন ব্যস্ত থাকে অন্য জিনিসে।

ব্যাপারটা কী ভাবে শুরুর হল সেটা সে চট করে বুদ্ধিতে পারে নি। প্রথমে কানে এল কী একটা বিকট হ্রস্ববর্ধমান শব্দ, তাতে ঘাড় গুঁজে আসে। তারপর প্রচণ্ড একটা গর্জন ফেটে পড়ল চারিদিকে, তার মনে হল সে উড়ে যাচ্ছে পাশের দিকে। তারপর চৈতন্য হয় তার, আকাশে উঠন্ত বিশাল এক ঘুঘু-রঙা ধোঁয়ার মেঘ আর গলার মধ্যে একটা বমি-বমি ভাবে সে টের পেল কী ঘটেছে। তারপর চিৎকার কানে এল তার। কান পেতে শুনলে ও ধরতে পারল যে চ্যাঁচাচ্ছে পাখমন্ড, মুখে হাত দিয়ে সে ডাকছে, ‘রুবাখিন, নেমে আয়, এক্ষুনি নেমে আয়!’ ডাকটা একগুঁয়ে, আতঙ্কিত।

তারপর ডাকটা চাপা দিয়ে ফের একটা প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ আওয়াজ উঠল, অন্য সমস্ত ধ্বনিকে যেন তা ডুবিয়ে দিচ্ছে, ভেদ করে তা ঢুকছে কাঁধে, পিঠে, তুফানের মতো যেন তা সর্বকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবে, চোখে পড়ল রাস্তায় পাক দিচ্ছে ধুলো, যেন মস্তো একটা আঁচড়া দিয়ে তা আঁচড়ানো হয়েছে।

না, নেমে এল না সে। এমন গোলাগুলির মধ্যে সে পড়েছে এই প্রথম নয়। তাদের মাথার ওপরে যে স্থাপদটা উড়ে এসেছে তাকে রুবাখিন দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ওর সমস্ত শরীর দিয়ে সে টের পাচ্ছিল যে সে অসহায়ের মতো শূন্যে ঝুলছে, রাস্তার এই যে পোস্টটায় সে আটকানো তারই মতো অসহায়। নিচে কি আশেপাশে আর চেয়ে দেখলে না সে, সমস্ত মন দিয়ে সে তার কাজে লাগল, যেন ওই যে জিনিসটা দ্রুত ওপরে উঠছে ওটা তার প্রাণ নেবে না। রুবাখিন জানত ওটা আবার ফিরবে, কিন্তু আরো কতবার ফিরবে সে কথা সে আর ভাবলে না।

ঘাম ফুটে উঠল কপালে, সঙ্গে সঙ্গেই শিথিল হয়ে এল পেশী, মুখের মধ্যে ধুলো বালি, কড়কড় করছে দাঁতে। ফের বিস্ফোরণের

শব্দ উঠল তার পেছনে, একটু দূরে। তার কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ল মাটি, যেন একটা কালো ঢেউ বয়ে গেছে তার মাথার ওপর দিয়ে। রুবাখিন এখন কাজ করে চলল আধ-বোজা চোখে। নানা রঙের কুয়াশা ভাসছে রাস্তায়। সেই অদ্ভুত অবস্থায় পেঁঁছেছে সে, যখন কেবল একটা জিনিসই সে দেখে, একটা কথাই ভাবে: ওকে বলা হয়েছে — ‘জলদি মেরামত করতে হবে! জলদি মেরামত করতে হবে!’ সেই মূহূর্ত থেকে তার চারপাশের সবকিছু হয়ে উঠল অবাস্তব, যেন স্বপ্ন।

গর্জনটা গোঙানিতে পরিণত হয়ে পাক দিচ্ছে মাথার ওপর। মনে হল পোস্টটা বৃষ্টি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে। সমস্ত আকাশ ভরে উঠল একটা হিংস্র গুঞ্জনে। লোহার পাতের ওপর তপ্ত ছররার মতো ফট্‌ফট্‌ করতে লাগল কান, সমস্ত দেহ ব্যথা করছে। কিন্তু কতবারই তো এমন হয়েছে। এবার কি সত্যিই শেষ বার? নাকি রুবাখিনের কেবল মনে হচ্ছে যে সে বেঁচে আছে, আসলে সে আর নেই, এই কুয়াশা আর ঘর্ষের কেবল এখনো জীবন্ত চেতনার অনুবর্তন... সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে সে ঘড়ঘড়ে গলায় কে জানে কাকে চেঁচিয়ে বললে — হয়ত-বা তার চিংকারটা হয়েছিল ঘড়ঘড়ে ফিস্‌ফিসানির মতো, যা কারো কানে পেঁঁছবে না। ও চেঁচাল: ‘নামব না!’

নিজে কী করছে সেটা ওর মনে নেই, সদৃশস্বভাবের ও বলতে পারবে না, কোনটার পর কোন কাজটা করে গেছে তার হাত, কিন্তু আশ্চর্য তার হাত দুটো যেন আলাদা একটা জীবন পেয়েছিল, নিজের কাজ তারা করে গেল, এ হাতের ওপর বিশ্বাস আছে তার, জানে নিজেদের কাজ তারা খাশাই করে যাবে। কেমন একটা সুগম্ভীর স্তব্ধতা নামল বিশ্বে, তার ভেতর পাখির স্পন্দন, মিহি ডাক কানে এল তার। শূন্যে, কোকিল ডাকছে। এই অতি সাধারণ ও আশ্চর্য কুহু ডাক সে গুণতে লাগল তৃষিতের মতো। ওর

মনে হল সে যেন বনপ্রান্তের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে তার সবুজ শীতল গোখরী, কোথায় যেন ঝিরঝিরিয়ে বইছে নদী, শনশন করছে পাইনের ডাল, আর শান্ত একটি পাখি যেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কথা কইছে তার সঙ্গে।

ও গুণে গেল কুহু ডাকগুলো। ওর সর্বাঙ্গ ভরে উঠল প্রসন্নতায়। ছয়, সাত, আট, নয়, দশ!

‘তাহলে বাঁচব! বেঁচে থাকব!’ ধুলোভরা ঠোঁট দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে সে গভীর নিঃশ্বাস টানলে।

ফের এগিয়ে এল ভয়ঙ্কর গুঞ্জনটা, মিলিয়ে গেল পাখির কাকলী, কিন্তু এখন আর তার কোনো ভয় হল না। কেমন একটা মূহুর্তের স্তব্ধতা নামল, ফের সে শূন্যে পেল কোকিলের সঞ্জীবনী ডাক, হয়ত সেটা তখন আর ডাকছিল না, ওর মনে হয়েছিল মাত্র, কিন্তু ফের নিজের কাঁধ আর হাতকে অনুভব করা, পোস্টের নরম হালকা হলদেটে গায়ে বেঁধা ডান্ডা সিঁড়িটা চেয়ে দেখার পক্ষে সে চেতনা ছিল যথেষ্ট।

কোথেকে এল কোকিলটা, কেনই বা সে এখানে, যেখানে নেই বন, নেই নীরবতা, সে কথা সে ভাবলে না। কোকিল, তার মানে ভালো, এটা শূভের লক্ষণ। বাঁচতে হবে! এই কথাটাই দপদপ করছিল তার রগে, তাতে কালো জীর্ণ ওভার-অলটার নিচে মূচড়ে আসছিল তার বুক। আবার ফিরে এল একটা গুরুগুর্জিত আচ্ছন্নতার তরঙ্গ, ধুলোর কুণ্ডলী উঠল রাস্তায়, আর কোথায় যেন দূরে ছবির মতো বসে আছে তার মেয়েটি, রঙ করছে গোলমাল করে, আকাশটা আঁকছে লালে, রাস্তাটা সবুজে। কিন্তু এত সে দূরে যে পোস্ট থেকে নেমে রওনা দিলেও ওর কাছে পৌঁছতে লাগবে গোটা দিন, হয়ত-বা বেশি।

তাজা বাতাসের আমেজ লাগল মূখে। বলতে পারবে না পোস্টের ওপর কতক্ষণ সে খেটেছে, তবে যা করবার সে করেছে,

মেরামত হয়ে গেছে লাইন। এবার মাটিতে নামা যেতে পারে।

অনেক কষ্টে অসাড় পাদুটো নেড়ে সে যখন পোস্টের গোড়াকার কাঁকরে বাঁধানো জায়গাটা ছুঁল, তখন কানে তার বাজছে কোকিলের, মিষ্টি লক্ষ্মী কোকিলের ডাক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে প্রথর আলো থেকে চোখ আড়াল করে সে চারিদিকে চাইলে। দেখলে, বাদামী হয়ে ওঠা কচি কচি মাথা রাস্তায় ঠুকে উপড়ে পড়ে আছে কতকগুলো জোয়ান গাছ। দেখলে, পড়ে যাওয়া ট্রাকটা কাত হয়ে পড়েছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে, দেখলে উপড়ে হয়ে পড়ে আছে একটা লোক, তার মাথার তল থেকে বেরিয়েছে তিনটে কালো ধারা, যেন ঝঝঝঝে রাজপথের ওপর তা আঁকা।

পোস্টটার দিকে চাইল সে, ঘা খেয়েছে সেটা, যেন লোহার চাবুকে কেউ তাকে চাবকেছে, কিন্তু চাবুকের একটা দাগও মানুষের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে নি।

একটা ডাক শোনা গেল, ‘রুবাখিন! বেঁচে আছিস তুই রুবাখিন?’

টলতে টলতে সেদিকে গেল সে। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রায় ছেঁড়াখোড়া পোষাকে ফ্যাকাশে একটা লোক, তাকে সে চিনতে পারল — আন্দ্রেয়েভ। এই সময় তার চোখে পড়ল হালকা গাড়ি, লোকে লারিয়ে নামছে তা থেকে, অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার, একজন আহত তাতে, থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে।

‘সিজভ ঘায়েল!’ প্রায় তার কানের কাছে চিৎকার করে উঠল আন্দ্রেয়েভ।

রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটার কাছে গেল, নিচু হয়ে কেন জানি তার ছিঁড়ে যাওয়া প্যাণ্টের হাঁটুর কাছটা ঘষে আঁসে করে বললে:

‘সিজভ! এই সিজভ!’

‘আর তুই রুবাখিন, কিছ হয় নি তোর, আস্তো আছিস?’ রুবাখিনের কাছে এসে ফের চেঁচাল আন্দ্রেয়েভ।

নিজের দিকে চাইলে রুবাখিন। প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে, ওভার-অলের আশ্তিন ন্যাতা-ন্যাতা হয়ে বুলছে। না, আস্তেই সে আছে... ফের নীল আকাশের দিকে চাইল সে, তাতে প্রায় গ্রীষ্মকালের মতো হালকা মেঘ, শাদা শাদা ছোটো বাড়িগুলো, যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, সড়কটা দিয়ে ছুটছে ট্রাক, রেল-লাইনে কাঁছিয়ে আসা গাড়ির ধোঁয়া।

‘আরো যেতে হবে আমাদের, কাজ শেষ হয় নি,’ কড়া করে বললে সে।

‘জানি,’ বললে আন্দ্রেয়েভ, ‘ওই একটা পিক-আপ গাড়ি।’

পিক-আপে বসে রুবাখিন চেয়ে দেখল নিঃপ্রাণ সিজভকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, লটপট করছে তার হাত, যে স্ট্রিচারটার ওপর পাখমভ ককাচ্ছিল সেটা অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে বন্ধ করা হল তার দরজা। গাড়ি ছেড়ে দিলে। শ্রুততা নামল বিশ্বে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক ছুটে গেলে যেমন হয়, তেমনি টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল রুবাখিনের বুক।

রাস্তাটার মোড় পর্যন্ত গেল পিক-আপ, এইখানে তার সীট থেকে এই প্রথম রুবাখিন এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, ‘দাঁড়াও! দাঁড়াও! গাড়ি থামাও!’ — যে ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষলে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল রুবাখিন, তারপর পা টেনে টেনে চলল একটা ছোট বাড়ির দিকে, হাতছানি দিয়ে ডাকা ছোটো ছোটো জানলাগুলো তার খোলা। দেয়াল জড়িয়ে উঠেছে লতা, আঙিনায় সবুজ সঙ্জী ভুই, কেয়ারিতে মাথা তুলেছে মরকুটে কীসব ফুল। জানলায় দেখা গেল ছোট একটি মেয়ের মাথা।

একটিও গাছ নেই বাগানে আর তার শ্রুততায় পরিষ্কার শোনা গেল কোকিলের কুহু। মাপা তালে স্থিরভাবে কুহু কুহু করে তা রুবাখিনের জন্যে দীর্ঘ জীবনের মন্ত্র পড়ছে। এটা সেই রহস্যময় ডাক, পোস্টের ওপর ভয়াবহ মূহূর্তটায় যা তাকে শান্তি

জুগিয়েছে, বিস্ফোরণে যখন কেঁপে উঠছিল মাটি, ধুলো উঠছিল রাস্তায়।

ছোট্ট মেয়েটির বেনীতে বাঁধা ফিতেটা ঠিক ওই সরু সরু আলের ওপরকার সৰ্জীগুলোর মতোই সবুজ, আর মেয়েটির পেছন থেকে ডেকে ডেকে কোকিলটা গোটা জায়গাটা ভরে তুলেছে তার বিজয়ী কুহুতে।

ভুরু কঁচকে অবাক হয়ে মেয়েটি দেখল যে ছেঁড়া ওভার-অল পরা এক দশাসই লোক ভারি পায়ে এসে আলগোছে তাকে সরিয়ে দিয়ে জানলার ভেতরে উঁকি দিলে। সরে গিয়ে, কাঁদবে কি চেঁচাবে ভেবে না পেয়ে মেয়েটি কেবল দেখতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামা ওই লোকটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাদের পুরনো বড়ো দেয়াল ঘড়িটার দিকে, নিচে যার ঝুলছে দোলক, আর ওপরে ছোট্ট একটা বাসার জানলা দিয়ে কোকিলটা হলদেটে হাস্যকর মাথাটা নুইয়ে নুইয়ে কুহু ডেকে জানিয়ে দিচ্ছে যে দুনিয়ায় এখন এগারোটা বেজেছে।

‘এটা তোর কোকিল?’

হতভম্ব হয়ে কাঁদতে ভুলে গিয়ে মেয়েটি ধীরে ধীরে বললে:

‘আমার।’

‘ওকে যত্ন করে রাখিস,’ বললে রুবাখিন, ‘জানিস না তুই কী লক্ষ্মী!’

মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সে দ্রুত ফিরে এল গাড়িতে, সবাই সেখানে অবাক হয়ে ওর রকম-সকম দেখাছিল। গাড়িতে উঠে সে বললে:

‘চল, এগুনো যাক...’

‘চেনা নাকি?’ চেক-কাটা মস্তো এক রুমালে নাক ঝেড়ে, কপাল থেকে ধুলো মুছে জিজ্ঞেস করলে আন্দ্রেয়েভ।

একটু অপেক্ষা করে বললে রুবাখিন, ‘চেনা কোকিল।’

‘যা, কী যে বলিস!’ বললে আন্দ্রেয়েভ, ‘মেয়েটাকে একেবারেই কোকিলের মতো দেখায় না। অবিশ্যি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে যেন পাখির বাসায় পাখি, তবে কোকিলের মতো একেবারেই নয়।’
গাড়ি ছেড়ে দিলে।

চালের ওপরে



মেয়েটি একেবারেই সাধারণ, লেনিনগ্রাদে অমন মেয়ে কত। এখন তাদের দেখা যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে। লাল ফোঁজী গান গাইতে গাইতে একদল চলেছে মর্যাদাভরে, আরেক দলের কাঁধে বেলচা, গাঁতি, চলেছে বরাবরের পরিচিত রাস্তাগুলোর কোণে কোণে বাঁধকার বানাতে, অন্য দল লাইন দিয়েছে সিনেমায়, দেখানো হচ্ছে সেখানে ‘গুণময়ী নববধূ’, ওদের রুক্ষ গাল, ধূর্ত চোখ, জোরালো হাত, বিশেষ কেমন একটা পরিপাটীত্ব। সহজেই রাঙা হয়ে ওঠে তারা, তবে কড়া কথা মুখে আটকায় না। অবরোধের সময় তারা যা দেখেছে, তাতে মা ঠাকুমাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ওদের সমান সমান। প্রায়ই সবাই ওরা গুলি করতে পারে বা নার্সিং বিদ্যাটা বোঝে। যাদের গায়ে সামরিক উর্দী তারা নিয়ে গরব করে বেসামরিক বাস্কাবীদের ঈর্ষা জাগায়, কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখে বাহারে টুপি আর ড্রেসের এবং অবসর পেলে একটু নেচে নিতে কারুরই আপত্তি নেই।

নাতাশাও ছিল তাই, হাজার হাজারের মতোই একজন। তার সঙ্গে আমার আলাপটা হয়েছিল হঠাৎ, মোটেই সাংবাদিক হিশেবে নয়। পকেট থেকে সাংবাদিকের খাতা পেনসিল বার করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না আমার। তাহলেও জিজ্ঞেস করলাম:

‘এ বছরটা কী করেছেন?’

‘চালে বসে থেকেছি,’ গুরুত্বসহকারেই জবাব দিলে সে, তার অনাবিল ধূসর চোখ দেখে বোঝা গেল সত্যি কথাই সে বলছে।

‘বেড়ালের মতো ও চালে ছোটাছুটি করতে ভালোবাসে,’ হেসে বললে তার বাস্কাবী।

ও বললে, ‘আমি বেড়াল নই, বেড়াল আর শহরে নেইও।
চালার ওপরে আমার পোস্ট, গত শরত থেকে আমার যা পাহারা
দেবার পাহারা দিচ্ছি।’

‘ডিউটি দিতেন দিনে না রাতে?’

‘যখন সাইরেন বাজত। আর গত শরতে বিপদ-সংকটগুলো
চলত কতক্ষণ ধরে মনে আছে? দাঁড়িয়ে আছি তো আছি, একেবারে
ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, আর যেই শব্দ হল, অমনি গরম হয়ে উঠবে
গা।’

‘কী শব্দ হত?’

‘মানে, বিমানধ্বংসের গোলা যখন উঠত আকাশে আর ‘ওটা’
ওদিকে মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করছে, তারপর যেই বোমা কি আগুনে
বোমা ফেলতে লাগল, তখন সামলে...’

‘বোমা দেখেছেন?’

‘বা-রে, কে দেখে নি? আমার ওই গুল্মটি থেকে সব দেখা
যায়, একেবারে যেন নখদর্পণে। আগে যখন বোমা-টোমা শব্দ হয়
নি, তখন চাঁদিনী রাতে চালার ওপর চিমনির কাছে বসে থাকতাম
আমরা, শহর দেখতাম, এমনকি জ্যোৎস্নায় বাইরন পর্যন্ত পড়েছি।
চারিদিক চুপচাপ, রাস্তায় কদাচিৎ এক আধটা গাড়ি; অদ্ভুত, যেন
নিজেই উড়ে যাচ্ছি শহরের ওপর দিয়ে, এমন তা রূপোলী খোদাই-
করা, প্রতিটি ছাদ, প্রতিটি চুড়ো দেখা যায় দূর থেকে। কোনটা
কোথায় তা চোখে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। আর এদিকে আকাশে
বেলুন। মাটিতে দিনের বেলায় ওগুলোকে লাগত যেন মোটা
মোটা সবুজ শঙ্কুপোকা, আর রাতে আকাশে যেন শাদা শাদা
তিমি মাছ মেঘের তলে ভাসছে। চাঁদ উঠলে কেল্লার চুড়োগুলো
উঠে যেত একেবারে তার বন্ধুর কাছে, কমলা লেবুর কোয়ার মতো
লালচে দেখায় তা, হালকা মেঘে চাপা পড়লে চুড়ো যেন অনেক

দরের একটা নীল পাল। ছাতে আমরা আড্ডা দিতাম, যেন পার্কে বেড়াচ্ছি।’

‘কিন্তু শীতকালে কেমন লাগে শহরটা?’

‘যখন বরফ পড়ত, ঠাণ্ডা, — চাল হয়ে উঠত এত পিছল যে আর কোথাও যাওয়া যাবে না, দেখতে না দেখতেই উল্টে পড়বে। তবে তখন আমি পর্বতারোহণ টেকনিক চালালাম। পাহাড় চড়তেও গেছি আমি, কাঁটামারা জ্বুতো আছে আমার। চারিদিকে তখন তুষারের কার্নিস বুলছে, যেন হিমবাহ, আর শহর হয়ে দাঁড়ায় পর্বত শ্রেণী, চারিদিকে বরফ পড়ে আছে, বাড়িগুলো কালো কালো, যেন শিলা-পাহাড়ের গা, হঠাৎ চারিদিকে ঝলক দিল বিস্ফোরণ, আগুন জ্বলে উঠল। কোথায় জ্বলছে তাও দেখতে পাচ্ছি। গা হুম্‌হুম্‌ করে। তারপর ইচ্ছে হয় ওই পাজী জার্মানটাকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দিই। কিন্তু কোথাও তাকে আর দেখা যায় না। সার্চ লাইট ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ও আর নেই। এমন গোলাগুলির শব্দ যে কানে আঙুল দিতে হয়। তারপর নিজেদেরই গোলার টুকরো এসে পড়ে চালে। সবকটা চিমনি ছড়ে গেছে, খসে পড়েছে ইঁট। আমি তখন হেলমেট পরতাম। তবে আগুনগুলো চটপট নিবিয়ে ফেলা হত, আবার সব অন্ধকার। শীত আর ওদিকে শেষ হয় না, দিনের পর দিন তা লম্বা হয়ে চলেছে, যেন উত্তর মেরু। একবার ফ্যাসিস্টরা আগুনে বোমা ফেললে। ওহ, কী ফেলাই না ফেললে! চারিদিকে বেগুনী লাল নীল আগুন, এমনিতে ভয় হয় না, তবে সাবধান, মারাত্মক! কতকগুলোকে নেবালাম, কতকগুলো নিচে ছুড়ে ফেললাম চাল থেকে, রাস্তায় জ্বলতে লাগল কী আক্রোশে। বান্ধবীদের সঙ্গে আমরা আগুনে বোমা অনেক নিবিয়েছি। একটাকে আমি বাড়িতেও নিয়ে আসি, তারপর ছুড়ে ফেলে দিই। প্রথমটা ওটা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে, তারপর গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে ওঠে। যেন মরা গিরগিটি, চুলোয় ঝাক গে! ফ্যাসিস্টরাও বুঝল যে মিছেই

ফেলছে; কেউ ওগদুলোকে ভয় করে না, বলে, ‘আগদুনে বোমা নয় ফেলুক, হাই-এক্সপ্লোসিভ না হলেই হল।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘আর বসন্তে শহরটা কেমন?’

‘কী পেয়েছেন আমার, লেখক যে শহরের বর্ণনা দেব?’ বললে নাতাশা, ‘বসন্তে আমার অমন ভালো ঠাইর হয় না, তখন জীবনের কথা ভাবতাম বেশি। বিরক্ত ধরে গিয়েছিল আমার চালায়। বন্ধুবান্ধবীরা কেউ গেছে স্বেচ্ছাসেবিকা দলে, কেউ ফোর্জে, কেউ মিলিটারিয়ায়, কেউ নার্সিংয়ে, অসুখে পড়ে কেউ ইভাকুয়েট করে গেছে শহর থেকে, আর আমার বলে, তোর দরকার আছে এখানে, তুই ইনস্ট্রাকটর। আর বসন্তের বাতাসে না কী কে জানে, চালায় আমার কেমন মাতাল-মাতাল লাগত। শহরটাকেও একেবারে চেনা যেত না। যেই বরফ গলতে লাগল, আকাশ হয়ে উঠল লালচে নীল, আর শহরটাকে যেন একটা কালো বাত্ম থেকে বার করে রোজই ঝাড়া হচ্ছে ঝাটা দিয়ে। ধোয়া-মোছা পরিষ্কার হয়ে উঠল শহরটা, দেখা যায় সমস্ত চালা, শুদ্ধ তাতে গোলাব গর্ত, আর দূরবীন দিয়ে দেখলে চোখে পড়ে দেয়ালেও গোলাব গর্ত, জানলায় কাচ নেই।’

‘কিন্তু চালে কী ভাবতেন? আপনি নিজেই তো বললেন ভাবতেন জীবনের কথা...’

‘কেবল ভাবতাম কী ছারখার হয়েছে রাশিয়া। যেমন গিয়েছিলাম মাসির কাছে কার্লিনি, এক্সকার্শনে গিয়েছিলাম সেলিগের হুদে। সর্বত্র কেবল ভাঙচুর। লেনিনগ্রাদ থেকে যেখানেই যান না কেন, কেবল ধ্বংস। পার্কের গাছপালা কাটা, লুটপাট হয়েছে সদনগুলোর, পুড়ে গেছে ছোটো ছোটো শহর, গ্রামগুলোও তাই। কেমন সব খাঁখাঁ করেছে। লোকজনকে খুন করেছে নয়ত বন্দী করে নিয়ে গেছে, নয়ত তারা পালিয়ে গেছে বনে। তাই, ভাবতাম, যুদ্ধ শেষ হলে তাড়াতাড়ি এসব ফের গড়ে তোলার জন্যে কী কাজে যাব আমি। দেখা গেল এত পেশা জানতে হবে

যে একজনের সাথে কুলবে না। স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, রেলপথনির্মাতা, ডাক্তার, টেকনিশিয়ন, শিক্ষক — সবই দরকার। এসব তো আমাদেরই, তরুণদেরই নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। ফ্যাসিস্ট নচ্ছারগদুলো যা কিছু নোংরা করে গেছে, তা পরিষ্কার করতে হবে তো নিজেদের হাতেই। আমি পার্টিজান হতে চেয়েছিলাম — ছাড়লে না, বলে চালে বসে থাক। তাই বসেই রইলাম। উড়ে এল ওদের গুপ্ত সন্ধানী বিমান। একটার লেজ থেকে ধোঁয়ার লম্বা নোংরা লেজুড় — আমার আর আনন্দ ধরে না, ওড়বার কিছু আর ওদের নেই, কীসব লজ্জা বিমানে উড়ছে। আমাদের লোকেরা যেই দাগবে, অমনি পালাবে। আমার সামনেই ওদের কয়েকটা মাটি নিলে...'

‘আপনি দেখেছেন?’

‘বা, দেখব না কেন? যখন প্রায় শতাব্দীর কাছে লড়াই চলছে, তখনও আমার চুড়োটা থেকে সবই দেখা যায়। এমন জায়গা ওটা আর এত উঁচু যে সমুদ্র শহর সবই চোখে পড়ে। কতবার দেখেছি মদ্য নিচু করে ধোঁয়াছে জার্মান বিমান তবে কোথায় পড়ল তা জানি না। প্রত্যেকবার হাততালি দিয়েছি আনন্দে। আরো যারা ডিউটি দিত তারাও আনন্দে হাততালি।’

‘তারপর গ্রীষ্মে কী হল?’

‘গ্রীষ্মে আমি প্রেমে পড়ি।’

‘চালের ওপর?’

‘না, মাটিতে। চালে কাউকে ভালোবাসি, ওটা আমার মতো কথা। ডিউটি দিচ্ছি। দেখি, বিমান, গোলা দাগা শুরুর হয়েছে, ওটা কেবল পাক দিচ্ছে এদিক-ওদিক... হঠাৎ দেখি প্যারাশুটে কে নামছে। কেবল নিচে নামছে, দূরবীন নিলাম। ঠিক, বিরাট, মোটাসোটা এক প্যারাশুটিস্ট: ভাবি, এ আবার কোন্ স্ক্যাপা, শহরে নামছে সবার চোখের সামনে। তবে কোথায় পড়ল সেটা নজর



করতে পারলাম না। তবে কাছেই কোথাও। আমার ডিউটি বদল হতেই জিজ্ঞেস করি, ‘প্যারাশুটিস্টটা নামল কোথায়?’ আর বান্ধবী বলে, ‘গাধা একটা, প্যারাশুটিস্ট আবার কোথায়, চল তোকে দেখাই।’ গলিটা দিয়ে ছুটে গেলাম একটা বাড়িতে, চেনা-জানা নাবিকেরা সেখানে। বলে, ‘সাবধান মেয়েরা, আর বেশি এগিয়ে না।’ — ‘কেন?’ — ‘জার্মানরা প্যারাশুটে করে টর্পেডো ফেলেছে, পড়েছে ছোট্ট একটা বাড়ির চালে। তবে প্যারাশুটে থাকায় তার ভারে কেবল চালটা ভেঙে পড়ে আছে ওপর কোঠায়। একজন স্পেশ্যালিস্ট গেছে সেখানে, নৌবহরের একজন কম্যান্ডার, অনেকক্ষণ ধরে ওটার পেছনে লেগে আছে, কেননা কায়দা করা কঠিন। ওটা চৌম্বক টর্পেডো, চালের সমস্ত লোহার কড়ি, সমস্ত ছাতটাকে টেনে নিয়েছে, বেঁকে গেছে চালাটা, দেখে হাসি পায়। তবে ভারি খচ্চর, ফেটেও যেতে পারে। বলা তো যায় না! সময় বেঁধে দম দেওয়া আছে।’ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখি আর কাঁপি। নৌবহরের ওই বীর লোকটার চেহারা কল্পনা করি মনে মনে — সুপুরুষ, লম্বা-চওড়া চেহারা, পাতলা-রঙের চুল, নীল-রঙের চোখ — একা সে ওই দানবটার সঙ্গে লড়াই করেছে। একেই বলে বীর!.. দাঁড়িয়ে আছি, চলে আর যেতে পারি না। সাংঘাতিক অস্থির হয়ে আছি আমরা।

‘হঠাৎ শুনিনি, ‘চুকেছে! এবার ওটাকে সরানো যেতে পারে। কম্যান্ডার তার কাজ শেষ করেছে, ওটার চার্জ খুলে নিয়েছে। যাচ্ছে জিরিয়ে নিতে।’ শুনেনি ছুটলাম সামনে। সবাই চ্যাঁচায়: ‘যাচ্ছ কোথায়?’ আমি কান দিই না। দেখি এক নাবিক, শান্তশিষ্ট, বেঁটে, হয়রান চেহারা, নিজের হাত দুটো দেখছে। আর হাত ছড়ে ছড়ে গেছে, রক্ত চোঁয়াচ্ছে। ঘড়িটা দেখে আমার দিকে চাইল। আমি কোনো দ্বিধা-সংকোচ না করে বললাম, ‘কমরেড কম্যান্ডার, আমি আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারি। আমি ওটা জানি।’

ও হেসে বললে, ‘ধন্যবাদ, ও কিছদ্ না, বিয়ের আগেই সেরে যাবে। এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি আরো ওইরকম একটার বিষদাঁত ভাঙতে হবে।’ এই সময় তার জন্যে গাড়ি এল। সেও চলে গেল। আর আমি ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি, আর বোকার মতো কাঁদি। মনে হয় জীবনে কখনো ওকে ভুলতে পারব না। কিন্তু এখন যে সবার লড়ার সময়। বেশ লড়ব। হয়ত হঠাৎ আবার কোথাও দেখা হয়ে যাবে। তখন আমার মনের কথা সব ওকে বলব। আর এখন নিজের লড়াইয়ের পোস্টার্টিতে থাকতে হবে, আর কিছদ্ না। অবিশ্যি আমার পোস্ট থেকে, চাল থেকে ছোকরা-ছুকরীরা সবাই কে কোথায় চলে গেছে, কিন্তু আমার উপায় নেই। আমি ইনস্ট্রাকটর। আমার কাজের জায়গা নেবার মতো লোক ঠিক করেছি। দ্বিতীয় বছরও আমার যা রক্ষা করার করব। কী রক্ষা করছি সেটা বলব না — ওটা গোপন সামরিক ব্যাপার। যুদ্ধ শেষ হোক, চাল থেকে নেমে আসব, মাটিতে ফিরব কাজে। তবে একটা সান্ত্বনাও আছে। যখন আমাদের বিমানগুলোকে দেখি, মনে হয়: ওরাও তো নামছে না আকাশ থেকে, দিন রাত আমাদের পাহারা দিচ্ছে, আমার চেয়ে ওরা আরো উঁচুতে, মাটি থেকে অনেক দূরে।’

‘আপনি তো দেখিছ বীরঙ্গনা নাতাশা।’

‘ধেং, আমাদের লেনিনগ্রাদের লোকেদের বিরক্ত ধরে গেছে বীর সাজতে। একেবারে সাধারণ লোক, সত্যিকারের বীর হতে হলে আমাদের আরো কত সামর্থ্য, চেষ্টা, সাহস দরকার, জানেন তো। এখন দরকার শত্রুকে খেদানো, তারপর দেখা যাবে কে অন্যদের চেয়ে সেরা, ততদিন পর্যন্ত জানেন তো নিজেদের কত তালিম নিতে হবে। একবার ঘ্যাঙানি জুড়েছিলাম, আমার চেনা একজন নাবিক বলে, ‘ঘ্যাঙানি রাখ, আমার পোস্ট ডেকে, তোর চালায়। চালাটা তোর ডেক, তোর জাহাজ তুই রক্ষা করছি, এমনভাবে তা চালা

যাতে সঠিক পথে গিয়ে পেরঁছস বিজয়ে।' ভারি ধমক দিয়েছিল
আমায়। সেই থেকে ঘ্যাঙানি ছেড়েছি। দাঁড়িয়ে থাকি, গুঁইগুঁই না
করেই কাজ করে যাই, শৃদ্ধ চেষ্টা করি যাতে কাজটা আরো ভালো
হয়...'

৯

নিজামী



আজারবাইজানের এক মহাকাবির নাম নিজামী। তাঁর পুরো নামটা খুব জমকালো, জয়ন্তীমন্দ্র: শেখ নিজাম-উদ্-দিন আব্দু মোহম্মদ ইলিয়াস ইব্ন-ইউসুফ গঞ্জোভী, কিন্তু নিজে তিনি ছিলেন নিরহংকার সহজ লোক। জন্মেছিলেন আটশ' বছর আগে, গাজিচাই

তীরে, প্রাচীন গাজে নগরে।

রক্তাক্ত রাজারা তখন দেশের পর দেশ ছারখার করত। কিন্তু কবিকে কেনা বা প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনে ভ্রষ্ট করা সম্ভব ছিল না। গালিচার বদলে ছেঁড়া কম্বলে বসে থেকেছেন কবি, রত্নপেটিকার বদলে সামনে থাকত তাঁর পুঁথিপত্র আর কালি, পাশে থাকত তাঁর পথ চলার লাঠিটা। গালিচা জীর্ণ হয়ে গেছে সুলতানদের প্রকোষ্ঠে, ভেঙ্গে পড়েছে রাজপ্রাসাদ, রত্নভান্ডার উধাও হয়ে চলে গেছে নানান দেশে, কিন্তু দুনিয়ায় রয়ে গেছে কাব্য — মানব প্রতিভার মৃত্যুহীন ভান্ডার। এইভাবেই সুলতান আর দৌলতদারদের পরাজিত করেছেন নিজামী, পরাস্ত করেছেন কালকে।

অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে আমরা তাঁর জন্মদিন পালন করি। হার্মিটেজের ঠান্ডা হলগুলোয় ভাষণ হল, ধ্বনিত হল প্রশস্তিবাণী। সব শেষ হবার পর আমি এলাম ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের এক চুপচাপ কামরায়। নিজামী যেরকম ঘরে বসে তাঁর কবিতা লিখেছেন, এটাও বোধ হয় তেমনি। প্রাচ্যের শৌখীন জিনিস বলতে ছিল একটি ছোট্ট গালিচা আর উষ্ট্রাকৃতি একটি ছাইদানি। তাকে ধুলোভরা অজস্র বই। গৃহস্বামীর গায়ে ফিল্ড-শার্ট, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। কেটলি গরম করার জন্যে পুরনো পত্রিকাগুলো দিয়ে তিনি চুল্লি ধরালেন।

ব্যাণ্ডেজ থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর কালো চুলের দিকে চাইলাম আমি, বিশ্বাসঘাতক পাকা চুলগদুলোও সেখানে লুকিয়ে আছে। প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলোয় ঝলক দিল তাঁর শার্টের কলারের ওপর দুটি সবুজ চোঁকো। লেফট্‌ন্যান্ট ছিলেন তিনি। জখম হন লেনিনগ্রাদের অদূরে। দু'সপ্তাহের ছুটি পেয়েছেন। প্রাচ্য বলতে তিনি পাগল, রুশ কবিতার মতোই ভালোবাসেন ইরানী কবিতা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আবৃত্তি করে যেতে পারেন সুরেলা পঙ্তিগদুলো, লেনিনগ্রাদের কামরায় যা কেমন অদ্ভুত শোনায়।

আলাপ হল কবিতা নিয়ে, নিজামী নিয়ে, যে তরুণ বিজ্ঞানীরা তাদের শাস্ত জ্ঞানকক্ষ ছেড়ে ঠাই নিচ্ছে ট্রেণে, তাদের নিয়ে, একালের মহাকাব্য, মানবিক সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করা আমাদের শত্রু, সুদূর আজারবাইজান এবং পুনরপি নিজামী নিয়ে।

গৃহস্বামী চেয়েছিলেন আগুনের শিখার দিকে, কেটলিকে তা চাটছে, পড়ছে পুরনো পত্রিকার পাতাগদুলো, কঁকড়ে যাচ্ছে অগ্নিগর্ভ অক্ষর, কালো হয়ে উঠছে ছবি। হেমন্তী রাতের ঠান্ডা লাগা চাপা গলায় বললেন:

‘নিজামী বেঁচেছিলেন বীভৎসতা আর রক্তপাতের যুগে,’ একটু চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর ফিকে হেসে যোগ করলেন, ‘আমাদের মতো। কিন্তু নিজেদের জনগণের শক্তিতে, তাদের সুকঠিন সত্যে তিনি কখনো সন্দেহ করেন নি...’

‘আমাদের মতো,’ বললাম আমি।

‘তিনি জানতেন,’ বলে চললেন করোলেভ (প্রাচ্যানুরাগীর নাম নিকোলাই ফিওদরোভিচ করোলেভ), ‘নিজামী জানতেন যে দু'নিয়াকে এগিয়ে দেয় নৃশংস জল্পাদেরা নয়, ভালো লোকেরা। সাসানীদের রাজা আনুশিরভানের কথা কিছু জানেন?’

লোকটা সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না।

‘নিজামী তাঁর কাহিনী বলেছেন তাঁর ‘রহস্যের ধনাগারে,’ বলে

চললেন করোলেভ, ‘শিকারের নেশায় আনুশিরভান একবার অনুচরদলকে ফেলে অনেক দূরে চলে যান। সঙ্গে ছিল কেবল একজন উজীর। রাজা-উজীর এসে পেঁাছিলেন ছারখার হওয়া একটা গ্রামে। চারিদিক খাঁখাঁ করছে, সর্বত্রই ভাঙা বাড়ির স্তুপ, বসবাসের জায়গা নেই, লোক নেই। চোখে পড়ল কেবল একটা ভাঙা বাড়ির দেয়ালে বসে দুই প্যাঁচা কী যেন বলাবলি করছে। নিজর্ন ভগ্নস্তুপের মধ্যে প্যাঁচার এই উচ্চ চিৎকারে ভয় পেলেন সাসানী রাজা। উজীরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী বলছে ওরা?’ পাখির ভাষা জানত উজীর। বললে, একটা প্যাঁচা তার মেয়ের বিয়ে দেবে অন্য পেঁাচার সঙ্গে, কিন্তু কন্যাপণ হিশেবে চাইছে এই ভাঙা গ্রাম এবং পাশের আরো দুটো গ্রাম। অন্য প্যাঁচাটা বলছে তা সে সাগ্রহেই দিতে রাজী, কেননা আনুশিরভান ষতদিন বেঁচে আছে, ততদিন লোকে ফকির আর গোলাম হয়েই থাকবে, এ তিনটে গ্রাম ছাড়াও পাওয়া যাবে আরো শত শত নতুন ভাঙা বাড়ি আর গ্রাম। এই বলেছিল উজীর। আমাদের কাছে তমসার একটা টুকরো, ধবংসের ভস্ম পেঁাছে দিয়েছেন নিজামী। সন্ধ্যাবে তিনি লিখেছিলেন, ‘চুপ কর রে নিজামী, গল্প গেল ছিঁড়ে, কলজে তোর অনেক দিনই রক্ত ঝরো ঝরো...’

চুপ করে রইলেন করোলেভ, চাইলেন নেভা নদীর দিকে, শূন্যে আছে তা হেমন্তের কুয়াশায়।

বললেন:

‘নয়া আনুশিরভান আরো ভয়ংকর। গোটা রাশিয়া, সারা বিশ্বকে সে ধবংস করতে চায়। নিজামী তাঁর স্বকালের পিশাচকে যেভাবে এঁকেছিলেন, সেভাবে এই পিশাচটাকে আঁকার শক্তি কেন নেই আমাদের শিল্পের? একালের মহাকাব্যের কথা বলছিলেন আপনি। এখনো সেটা দেখছি না। খুবই পরিতাপের কথা...’

বললাম, ‘কিন্তু সে মহাকাব্য লেখা হবে। সময় যাবে, হিটলার

‘আর তার গোটা মানবদেহী দঙ্গলটাকে ধিক্কৃত করবে বড়ো বড়ো কবি ও শিল্পীরা। দীর্ঘদিন পৃথিবী মনে রাখবে এই জল্লাদ অধিক জল্লাদ নয়! আনন্দের ভানকে। তারপর লোকে ভুলে যাবে তার নাম, যেমন এই সাসানী রাজাকে আমরা ভুলেছি।’

‘ইরানীতে আপনাকে কবিতা শোনাও। নিজামী ওই ভাষাতেই লিখেছিলেন।’

বললাম, ‘শোনান, তবে আমি কিছু বদলাব না...’

‘তর্জমা করে দেব।’

আবৃত্তি করলেন তিনি গম্ভীর উচ্চৈশ্বরে, প্রায়াক্কার ঘরখানায় একটা অদ্ভুত আনন্দ পেলাম শব্দগুলো শুলে, কখনো তা ঝন্ঝনে, যেন দেয়াল থেকে খসে পড়ল ঢাল, কখনো মন্থর, যেন স্তপের নদী, আবার কখনো গমগমে, যেন ধস নেমেছে। আবৃত্তি করলেন হাঁটুর মাঝখানে হাত রেখে, ছন্দের তালে তালে সামান্য একটু দুলে। আমাকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি তাঁর দেয়ালে নিবন্ধ, একটা ছোট্ট, রঙচঙে পুরনো গালিচা টাঙানো সেখানে। আবৃত্তি শেষ হলে তিনি মাথার ব্যাণ্ডেজটা একটু ঠিক করে নিয়ে তর্জমা শুরুর করলেন... কী একটা নৈশ লড়াইয়ের ব্যাপার। কাব্যের একাংশমাত্র শুনিয়েছেন তিনি।

বললেন, ‘এবার শুনুন, এটা নিজামী অনুকরণে। এ পাতায় নিবন্ধ দৃষ্টি দেখবে এই লিপি: এ যুদ্ধ তখন যাতে দুনিয়া হয় ছয়, আসমান আট।’

বললাম, ‘একটু দাঁড়ান, তার মানেটা কী?’

‘তার মানে, দুনিয়ার গোটা স্তরটা উঠে গিয়ে রচনা করল আকাশের অষ্টম স্তর, আর দুনিয়ার একটা স্তর কমে গেল। আরো শুনুন। যুদ্ধ চলল ভোরে, যখন গাছের পেছন থেকে অরুণাভা দেখা দিয়েছে, লড়াইয়ের বজ্রমেঘে ঢাকা পড়ল দুপুরের সূর্য, লড়াই চলল যখন অন্ধকার নেমেছে প্রাসাদের বাগিচায়, দেখা যায়

না মিনার। একটি মিনার ভেঙে পড়ে গেল লড়াইয়ের অন্ধকারে, তার জন্যে এত কষ্ট হল যে আমি কাঁদলাম, অশ্রু নামল গাল বেয়ে। কিন্তু গালের ওপরকার রক্ত আর ময়লার চাপ তার পথ আটকালে। চোখ আমার হয়ে উঠল রক্তাক্ত, কিন্তু দুঃখমনের কালো মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কেননা চোখে আমার ঘৃণা, অন্ধকারেও তাদের মুখ ঠাহর হচ্ছিল। ঠাহর হচ্ছিল কেননা সে মুখ অন্ধকারের চেয়েও কালো। অস্প্রাঘাতে তাদের আমরা সংহার করতে লাগলাম অসংখ্যে। গাঁওয়ে উঠে তারা হাঁটু গেড়ে, মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। হাত ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মেরে চললাম আমরা, আর রাত তাদের প্রসব করে চলল অবিরাম। হাজার হাজার মশালের শহরটা জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত লড়ে চললাম আমরা, আর তখন শূন্য নিজেদের রক্ত নয়, আমার স্বদেশভূমিকে লাঞ্ছিত করতে আসা দুঃখমনদেরও রক্ত দেখতে পেলাম। নয়াটি বর্বারকে সেদিন আমি বধ করি, ওরা পড়েছিল হাঁ করে, যেন অবাক হয়ে গেছে নিজের মৃত্যুতে। আর মুখ আমার রক্তে আর আঁধারায় ভেসে গেলেও কলজেয় আমার গোলাপী জলের ইন্দারা। শেষ যাকে বধ করি সে একজন অফিসার। দেখলাম লোকটার উর্দীতে এস-এস চিহ্ন, উল্লাস হল যে দুনিয়ায় জঙ্গাদের সংখ্যা একটি কমল...’

অংশটুকু এইখানেই শেষ।

বললাম, ‘কী আশ্চর্য মিল, কবিতায় এস-এস উর্দী পরা নিহতের কথা। কোন শতকের লেখা?’

‘বিশ শতকের প্রথমার্ধে। ১৯৪১ সালের শরতে। বর্ণনাটা গাংচিনার লড়াইয়ের, যেখানে আমি জখম হই। গাংচিনা পুড়েছে আমার চোখের সামনেই।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘এত ভালোবেসেছিলেন শহরটাকে? শূন্য স্মৃতির সম্বলে ওরকম কবিতা লেখা যায় না।’

বললেন, ‘এই শহরেই আমার জন্ম। আপনি বলবেন, আরো

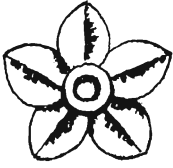
সুন্দর সুন্দর শহর আছে? নিজামীর কথায় আমি জবাব দেব। তিনি বলেছেন, কবির বীর্ষ প্রেমে। সেই প্রেমের উদ্দেশ্যেই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর মহত্তম রচনা, লায়লী-মজনুদর জীবনের মতো অপূর্ব তাঁর কাব্য। যে দেশের লোক প্রেমে বিশ্বাস করে তেমন সব দেশেই পেঁছবে এই কবিতা। তাই আমাদের দেশেও তা এসেছে। কেমন ছিল লায়লী? সত্যিই কি অমন পরমাসুন্দরী? মহাকবি সাদী তার চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। লিখেছেন: লায়লীর প্রতি মজনুদর উদ্দাম ভালোবাসার কথা রাজার কানে গেল। লায়লীর রূপ দেখার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু দেখে তার মনে হল কিছুই না, হারেমের শেষ বাঁদীটাও তার চেয়ে রূপসী। সেটা টের পেয়ে মজনু বললে, ‘রাজা, লায়লীকে দেখতে হয় মজনুদর চোখ দিয়ে।’ আমি লড়েছি আমার প্রেমের জন্যে, আমার জন্মভূমি শহরের জন্যে, প্রতিশোধও নেব।’

জানলার দিকে চাইলেন তিনি। নিচু, ভারি, কালো কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছে, ঝাপসা দেখা যাচ্ছে ইসাকি গির্জার কায়া, কালো হয়ে উঠেছে মাস্তুল আর চিমনিগুলো।

সেই মদহুর্তে এই প্রায়াক্ষকার ঘরখানায় আমি টের পেলাম যে আমরা সবাই এক মহৎ প্রেমের বশীভূত, তার জন্যে নিজের জীবনও আমাদের কাছে তুচ্ছ। আজ সেটা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন আমাদের দূরগত অতিথি প্রাচীন নিজামী। আমাদের শহরে তিনি এসেছেন সংঘাতের ঝঞ্জনার মধ্যে, আমরা তাঁকে বরণ করে নিলাম আমাদের বন্ধু, আমাদের লড়াইয়ের সহযোগী ও সহযোদ্ধা ব’লে।

আর মৃতের স্মরণে প্রাচ্যে যা করে, আমরা পান করলাম তাঁর স্মৃতিতে। পান করলাম একশ’ গ্রাম ভোদকা, কে জানে কোথেকে সেটা সংগ্রহ করেছিলেন করোলেভ। পান করলাম নিজামীর জন্যে, মজনুদর চোখের জন্যে, যা মৃত্যুহীন।

শীতের রাতে



রাতের অন্ধকারে কলঘরের দেয়ালগুলো কালো হয়ে উঠল, যেন মেরু মহাসাগরের তুষারাবৃত পাহাড়। তুহিন লোহালকড়, পিপে, ধাতুমল ছড়ানো গোটা জায়গাটা মনে হল মরে গেছে। নিশ্চল হয়ে যাওয়া তরঙ্গধারার মতো চারিদিকে তুষারের ঢিপি। জানুয়ারির রাতের অন্ধকার একটি বাতিতেও বিদীর্ণ হয় নি।

অন্ধকার আর তুষারের মধ্যে এই নিস্তব্ধ আঙিনাটায় যদি কোনো নতুন লোককে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে বলবে যে এসেছে লোকালয় থেকে বহু দূরের কোনো এক তুহিন নির্জনে। আসলে কিন্তু এটা এক অতিকায় কারখানার আঙিনা।

আর ছোট দরজাটা খুলে ভেতরে তাকালে মনে হবে যেন এক স্ট্যালাকটাইট গুহা। ওটা কলঘর। গোলার ফুটোগুলো দিয়ে দেখা যায় কালো আকাশ, দেয়াল আর চাঁদোয়া পাতলা হিমামানীতে ঢাকা, নিখুঁত করে আড়াল করা বিজলী বাতিতে অল্প একটু করে জায়গা সামান্য আলোকিত, আর ভালো করে নজর করলে দেখা যাবে বিরাট হলটার নানান জায়গায় গিজ্‌গিজ্‌ করছে লোক। কাজ করছে তারা।

গায়ে তাদের হরেকরকমের পোষাক, ক্ষীণ আলোয় অন্ধুত ছায়া পড়েছে তা থেকে। শীর্ণ মুখগুলোর তীক্ষ্ণ আদলে অনভ্যস্ত লোকে ভয় পেয়ে যাবে, কিন্তু পর্তেখন এদের সবাইকে চেনে, জানে এই অপ্রাকৃত দৃশ্যটা হল রাতের শিফট, এসবই তার কাছে অভ্যস্ত।

শীত সেঁধোচ্ছে তার মেঘচর্ম ওভারকোট ভেদ করে। তুহিন লোহাগুলো থেকে আসছে ক্ষীণ ছটা, যেন চটা পড়া তপ্ত ইম্পাত।

চারিদিকেই বাদামী, ধূসর, কালচে, পাঁশুটে রঙের ঢিপি। ওগুলো ঢালাইয়ের ছাঁচ তৈরির মাটি, শান্তির সুসময়কার ঠাট্টার সুর লাগিয়ে ষেগুলোকে পতেখন উদাত্ত কণ্ঠ বলত ঢালাইয়ের পবিত্র মাটি।

ছাঁচের এই মাটি বানানো এখন একটা বীরত্বের কাজ। নির্দিষ্ট পরিমাণে ওগুলো মেশানো হয় আধা-অন্ধকারে আর বিভিন্ন অংশের সঠিক সংযোজনের ওপরই নির্ভর করে ঢালাই। সেই ঢালাইয়ের ওপর নির্ভর করছে গোলা, গোলার ওপর শহরের প্রতিরক্ষা, শীত রাত্রির এই কৃষ্ণ অপরিমেয়তায় যে শহরকে কেবল আন্দাজ করা যায় মাত্র।

দিনে কারখানা পর্যন্ত ভেসে আসছিল দূর থেকে একটানা চিৎকারের শব্দ। শোনা যাচ্ছিল কি ভাবে আগু ফ্রণ্টে প্রতি-আক্রমণ চলেছে।

দিন রাত দরকার গোলার। খোদ উত্তর মেরু যদি তার সমস্ত তুষার-ঝঞ্ঝা আর শীত নিয়ে বাসা পাতে কারখানার আঙিনায়, তাহলেও দরকার গোলার।

আর দরকার ছাঁচের মাটি বানানো। ফোরম্যান ও ডিজাইনার পতেখন যখন গিয়ে পেঁাছিল বাদামী ঢিপিগুলোর মধ্যে, তখন সেখানে মাথা নুইয়ে একটি প্রোটা কর্ণিক দিয়ে বসে বসে মাটির চাপড়া বোঝাই করছিল একটা স্তূপ থেকে আরেকটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পতেখন দেখল কী মন্থর একগুঁয়েমিতে সে নতুন ঢিপি গড়ে তুলছে।

চোখ তুলে তার দিকে চাইল মেয়েটি, কিন্তু কিছুই না বলে তাকাল পাশে, বন্ধুকে হাত জোড় করে একটা লোক সেখানে কঁজো হয়ে একটা তক্তায় গুটিসুঁটি মেরে শূন্যে আছে। পতেখনের মনে হল বোধ হয় অঘোরে ঘুমচ্ছে। কিন্তু সেই মদহৃদে চোখে পড়ল মেয়েটার হাতের কর্ণিক কাঁপছে। নিচু হয়ে সে বললে:

‘পাশা মাসি, তিমোফেরেভিচ হয়রান হয়ে গেছে, নেতিয়ে পড়েছে।’

পাশা প্রথমে চাইলে কড়া ক’রে, তারপর ঠাণ্ডা ধাতব ধুলো মাখা মৃদুখানা তার নরম হয়ে এল, কিছুদ্ধক্ষণ থেমে বললে:

‘নেতিয়ে পড়েছে তিমোফেরেভিচ, ঘাঁটিও না, শান্তিতে থাকুক।’

‘তাহলে ওর বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো পাশা মাসি। নাকি শক্তি নেই? এখানে আবার জমে না যায়, রাস্তার মতো...’

খপু করে পাশা মাসি তার হাত ধরে এমন টান দিলে যে পর্তেখনকে উবু হয়ে বসতে হল তার পাশে। তখন একেবারে তার মুখের কাছে মৃদু এনে ঠাণ্ডায় পাথর হয়ে যাওয়া ঠোঁটে সে বললে:

‘তুই রুশী? জবাব দে।’

‘নিশ্চয় রুশী,’ বললে পর্তেখন, ‘কী হল তোমার পাশা মাসি?’

‘রুশী, তা ভালো, তুই বুদ্ধি, বেশি বলতে হবে না। আমার উনি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল, অথচ কেবলি ঘোরে, কাজ করে। আমায় বলে, ‘প্রাণ পুড়ছে পাশা, প্রাণ পুড়ছে। নে তাড়াতাড়ি কর।’ করব কী করে, হাত যে চলে না। খিদেয় নিজেই টলছে। বলে, ‘খুবই খারাপ বোধ করছি গো।’ বলি, ‘ও কথা বলো না বুদ্ধো, একটু শূন্যে স্নুস্থ হয়ে নাও।’ বলে, ‘না, স্নুস্থ আর হব না। দায়িত্বের মাটি যে। আর তুই তো জানিস না কত চাই, কি ভাবে মেশাতে হয় — তুই পারিস না। শিখে নে, আমি যা করছি করে যা, নজর করে দ্যাখ, দেখে রাখ...’

কেঁদে ফেলল মেয়েটা। উবু হয়ে বসে বসেই পর্তেখন দেখল, চোখের জল মুছলে পাশা, লোহা-লোহা মৃদুখানায় রয়ে গেল ফিকে কয়েকটা দাগ।

‘ও যা করলে, করে গেলাম। ও কিন্তু ওর নিজের জেদ ধরেই আছে, একই কথা বলছে। বললে, ‘বেশ, এবার মনে রাখ।’ বলে

গিয়ে শুল তো ঐ শুল। ওই শুল, প্রাণ আমার।’ বলে হাতের কর্ণিক না ছেড়েই মেয়েলী ঢঙে ফুঁপিয়ে উঠল, ‘যা হুকুম করেছে, খেটে যাচ্ছি...’

শায়িত লোকটার দিকে ফিরল পতেখন। পাশা মাসি তার আস্থিন ধরে টানলে:

‘বলে, ‘প্রাণ আমার পড়ছে।’ আমারো প্রাণ পড়ছে বাছা। বললাম, ‘ঘুমোও তিমোফেয়েভিচ, কাজ করবার করেছে, এবার আমি তোমারটা করে দেব, দুজনের জন্যে খাটব।’ দেখ, কতকটা করেছে, কিন্তু তাহলেও কতটুকু আর। আমার কাছেও কম, শীতে আমায় কাহিল করবে না।’

উঠে মৃতের কাছে গেল পতেখন। বন্ধুকে মাথা নুইয়ে শূয়ে আছে তিমোফেয়েভিচ, দাড়িতে বরফ জমেছে, হাত দুখানা আড়াআড়ি দড়ি দিয়ে পরিপাটী বাঁধা।

পতেখন বললে, ‘আমায় কিছু আর বলতে হবে না পাশা মাসি, বদ্বতেই পারছ কথায় — আর কী ফল...’

‘কথায় আর কী ফল,’ পুনরুত্তর করলে পাশা মাসি, কর্ণিক তার চলতে লাগল আরো দ্রুত, ‘যা বাছা, কাজ কর গা, আমি ওর সঙ্গে থাকছি, যে কাজ দিয়েছে করব। গোলমাল করব না। যা, যা, আমায় একা থাকতে দে...’

কলঘরটার ঢালাও অন্ধকার তুহিনতা দিয়ে যেতে যেতে পতেখন ভাবলে, কেমন বললে ও, ‘দায়িত্বের মাটি’। হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছে বড়ি, ‘দায়িত্বের মাটি’। লেনিনগ্রাদের, জন্মভূমির, অপরাজিতার মাটি।

পাহাড়ের ছেলেমেয়ে



গন্ধনিব পাহাড়ের ওপরে একটা সবুজ কুঞ্জের মধ্যে ডেরা পেতেছিলাম আমরা। নিচে নামকরা একটা আউলের ধ্বংসাবশেষ। ওপরে সাক্ষ্য পাহাড়ের স্তব্ধতা। প্রত্যেকেই আমরা ছোটো ছোটো ধুনি জ্বালালাম, শিক-কাবাব করা যাবে যে যার রুচি মতো। শিগগিরই ধুনিগুলো জ্বলে শেষ হল, নিচের উপত্যকার ওপর ভেসে রইল ঘৃণ-রঙা মিঠে-মিঠে ধোঁয়া। অঙ্গারগুলো ঢেকে গেল আঁচের নীলাভ ধিকিধিকিতে। নিজেদের বানানো লম্বা সরু সরু শিকে শোঁ-শোঁ করতে লাগল মাংস। হাত পুড়িয়ে, খুঁশির আলাপ জমিয়ে খাওয়া শুরুর করলে পাহাড়ীরা।

আমার ধুনির কাছে বড়ো বড়ো কালো চোখে খানিকটা উপহাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বসেছিল একটা ছোট মেয়ে। নাম ওর রেজেদা হলেও খাঁটি পাহাড়িনী সে, তারই জন্মভূমির পাহাড়ে চারণ-ক্ষেত্রের শূচি-কঠোর ফুলের মতো। ভারি ভালো লেগেছিল দেখতে কেমন অনায়াসে ডিঙিয়ে যাচ্ছে সে ফেনায়িত স্রোত, লাফিয়ে যাচ্ছে পুরনো হাঁটা-পথের পাথরের ওপর দিয়ে, অকরুণ গন্ধনিবের গোটা নিসর্গটাই যেন তার উদ্ভিন্ন কৈশোরের অপরূপ প্রেক্ষাপট। বয়স তার মাত্র দশ, কিন্তু সত্যিকারের একটা গাভীৰ্ব ছিল তার মধ্যে, একটা স্বাধীন অথুন্ড চরিত্রের যা পূর্বলক্ষণ। পাহাড় আমি কী ভীষণ ভালোবাসি তা সে জানত, ছেলেমানুষের মতো তা নিয়ে সামান্য ঠাট্টাও করত। আমাদের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তার কাছে আমি ছিলাম এক আগন্তুক মাত্র, কালই যে দাগেস্তানের উপত্যকা আর খাদ, কান্তার ফেলে

চলে যাবে সুদূর উত্তরে, তার অচেনা কুয়াশা-ঘেরা ঠাণ্ডা কোন লেনিনগ্রাদে।

শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। কেটে গেল আট বছর, তার মধ্যে ওর খবর পেয়েছি কদাচিৎ, শেষ পর্যন্ত একেবারেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

তারপর অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের শীতকাল। রাস্তায় বরফের টিপি জমেছে উঁচু হয়ে, বিস্ফোরণের স্পন্দনে জানলার কাচ ভাঙা, তুহিন বাতাসের ঝাপটায় বরফ উড়ে আসছে তাতে, ঘরের ভেতর লম্ফ ধোঁয়াচ্ছে, এমন সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লম্বা ময়লাটে রঙের একটি মেয়ে, ছিপিছিপে, হালকা, ঢুকল রেজেদা।

বললে, ‘আপনার ঘরখানা একেবারে পাহাড়ে গাঁয়ের মতো। জানলায় বরফ, ঘরে লম্ফ, ফেল্টের আলখাল্লা, ঠাণ্ডা,’ হেসে উঠল সে, ‘তবে ঠাণ্ডা এখন সবখানেই।’

প্রাথমিক সাধারণ কথাগদুলোর পর জিজ্ঞেস করলাম, ‘রেজেদা, লেনিনগ্রাদে আপনি করছেন কী, এলেন কী করে?’

‘পড়তে এসেছিলাম, এখন কাজ করছি হাসপাতালে। যা সাধ্য করি। আমাদের গোটা পরিবার লড়ছে। যে যেখানে ছিল সমস্ত পুরুষ লড়ছে নানান ফ্রন্টে। আর আমি ঠেকোছি এই ঘেরাও লেনিনগ্রাদে। মায়ের সঙ্গে থাকি একটা ফাঁকা বাড়িতে, ওখান থেকে ইভাকুয়েট করে গেছে সবাই, ফলে জায়গা আমাদের অনেক...’

‘কিন্তু আপনি দক্ষিণের লোক, এমন শীতে কষ্ট হচ্ছে না?’

‘এখন কষ্ট কথাটাই আর ওঠে না। এখন সবাইকেই খাটতে হবে, সব সইতে হবে, নইলে চলবে না। আর আপনার কাছে এলাম কেন জানেন? আমাদের ফটক বন্ধ হয় না, তার ভেতর দিয়ে আঙিনায় ঢোকা যায়, আর আঙিনার বেড়ার তক্তাগদুলো সব খুলে নিয়েছে... আর ওপাশে গ্যারাজ আর পেট্রল-ট্যাঙ্ক। বন্ধুতেই তো পারছেন, কী না ঘটতে পারে। কিছু দিন আগে আমরা নিজেরাই

দেখেছি বিমান আক্রমণের সময় হাউই ছুড়ে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে।
আমার মনে হয় একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।’

বললাম, ‘ব্যবস্থা নেওয়াই দরকার। গদ্বুর্দ্দচিত্ত পাহাড়িনীকে বেশ
চিনতে পারছি। কিন্তু সামরিক বাড়িতে আপনি আছেন কেন?’

‘আমার স্বামী যে ফ্রণ্টে, সামরিক ডাক্তার।’

‘সে কী! বিয়ে করেছেন? কতদিন?’

একটু বিব্রত হয়ে বললে, ‘বেশি দিন নয়। আমার স্বামী শূদ্ধ
ডাক্তার নয়, প্যারাশর্দ্দটিস্টও। প্যারাশর্দ্দটিস্টদের সঙ্গে সে ঝাঁপও
দেয়, আবার চিকিৎসাও করে। তাতে ভারি সদ্দ্বিধে, তাই না?
লড়াইয়ে সে সর্বত্র থাকতে পারে ওদের সঙ্গে, ওদের মতোই ঝাঁপ
দেয়। ব্যাজ আছে তার। নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে সত্তর বার।’

‘সাহসী লোক আপনার স্বামী! পাহাড়ী?’

‘হ্যাঁ, আমাদের এলাকার লোক, পাহাড়ী, সাহসীও, আমাদের
পরিবারে ভীরু কেউ নেই। এখন যে কোথায় কে জানে। তবে
হাত গুটিয়ে বসে থাকবার লোক তো সে নয়।’

আমাদের দূর্জনকার চেনাপরিচিতদের নিয়ে, বন্ধুবান্ধব আর
পাহাড়গুলোকে নিয়ে কথা হল অনেকখন। তারপর সে লেনিনগ্রাদের
তুহিন রাস্তায় বেরিয়ে গেল সেই উড়ু-উড়ু পাহাড়ী চলনে, যেভাবে
সে হাঁটত গুর্নবের চুড়োয়।

তারপর আমাদের দেখা হয়েছে কেবল মাঝে-মাঝে, শহরে ওর
সুর্কঠিন জীবনযাত্রার কথা জানলাম ক্রমে ক্রমে, এই শহর, যেখানে
নেই আলো, নেই জল, নেই চ্যালাকাঠ, যার রেশনকে বলা যায়
বীরযোগ্য, কিন্তু তাতে করে রেশনের পরিমাণ বাড়ে না।

দিন রাত খাটত মেয়েটা। রাত-ডিউটি, গতর-খাটা মেহনত, এ
সবে কাহিল হয়ে পড়ত সে, কিন্তু লেনিনগ্রাদ ছেড়ে যেতে চাইত
না। আবহাওয়ার নিস্করুণ মেরুসুর্দলভ খামখেয়ালে, কণ্টে অভ্যস্ত
লোকেরাও ভেঙে পড়ত, কিন্তু ও বলত:

‘আমি শক্ত মেয়ে, ফ্রণ্টের লোকেরাও তো খুবই কষ্ট সহিছে।’

ঠাট্টা-তামাশা করত সে, মন-মরা হত না কখনো, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যেত যে খুবই কষ্ট হচ্ছে ওর। রোগা হয়ে গেল সে, মদুখানা হয়ে উঠল কঠোর, শুধু ওর বড়ো বড়ো কালো চোখদুটো বলক দিত আগের মতোই। একদিন বললে:

‘শুনুন, আমি আর মা টিন-বন্দী এক কোঁটো মাংস আর কিছু চাল জমিয়েছি। আসুন আমাদের বাড়িতে, গুর্নবের গল্প করা যাবে, আর আপনার সেই শিক-কাবাবের কথা, জীবনে তা ভুলব না, একেবারে সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। আসুন লাল ফোঁজ দিবসের উৎসব করা যাক।’

যেসব চিঠিপত্র পেয়েছে তার কথা বললে সে, শহরে তা পৌঁছত কঁচিৎ-কদাচিৎ। দাগেস্তুানে ওকে ফিরে যেতে ডাকছে। বাছা বাছা ঘোড়ায় চেপে, বাছা বাছা হাতিয়ার নিয়ে সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে সেখান থেকে, লোকে তাদের এগিয়ে দিচ্ছে যেন বিয়ের বরষাত্রা। বুনীনাঙ্ককে ফল-মূল তরিতরকারী রাখার আর জায়গা নেই। ফলন হয়েছে অচেন। স্বামীর কাছ থেকে খবর পায় নি অনেক দিন। প্রথম দিন থেকে সে লড়ছে, যোদ্ধা হয়েই সে জন্মেছে। বিশ্রাম কাকে বলে সে জানে না। চিঠি লেখারও সময় নেই।

লাল ফোঁজের দিবস আমি উদ্‌যাপন করি অন্য শহরে, কর্মসূত্রে যেতে হয়েছিল সেখানে। লেনিনগ্রাদে যখন ফিরলাম, রাস্তা তখন পরিচ্ছন্ন, সবুজ হয়ে উঠছে গাছগুলো। বরফের শেষ চাঙাগুলো ভেসে যাচ্ছে নেভা নদী দিয়ে। লাদোগা হ্রদ থেকে আসছে শীতল বাসন্তী বাতাস।

ফ্রণ্টে তখন এক হিংস্র স্তব্ধতা, মাঝে মাঝে তা বিদীর্ণ হচ্ছে দুই তরফ থেকে গোলাবর্ষণের উদ্দাম দমকে। মে মাসের রোদ্দুরে উষ্ণ একটা মাঠে আমি বসেছিলাম এক কমরেডের সঙ্গে। নিচে রূপো হয়ে উঠেছে হ্রদটা। বার্চ আর পাইন গাছ থেকে আসছে

মধু-মধু গন্ধ। ঝোপগুলোর ওপর পাক দিচ্ছে প্রজাপতি। তাজা খবরের কাগজ এল, অর্মান নীরবতা নামল, সবাই ডুবে গেল পড়ায়।

হঠাৎ কমরেডটি বললে:

‘হ্যাঁ, একেই বলে ডাক্তার। একসঙ্গেই ডাক্তার আর প্যারাশুটিস্ট। তার ওপর আবার পাহাড়ী। প্যারাশুটে ঝাঁপ দিয়ে লড়তে চলল প্যারাশুটিস্টদের সঙ্গে...’

‘আরে?’ চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, ‘এ যে রেজেন্ডার স্বামী!’

কমরেড বললে, ‘দাঁড়া, শোন, ভারি ইনটারেস্টিং। চিকিৎসাকেন্দ্রটা যখন বসানো হচ্ছিল তখন জখম হয় সে। জ্ঞান ফিরে ভয়ানক জখম অবস্থাতেই অপারেশন করতে শুরুর করে। বাহাদুর বটে...’

বললাম, ‘গাড়িমসি না করে চটপট বল। তারপর?’

‘আমি যে পড়ছি,’ বললে কমরেড, ‘হ্যাঁ, সত্যি বীর। শোন, রক্তাক্ত দেহে সে একের পর এক ছয় জনের ওপর অপারেশন করে, এমন সময় নিয়ে আসা হল তার বন্ধুকে, তাকে সে কথা দিয়েছিল বিপদ ঘটলে নিজে সে তাকে সাহায্য করবে। নিজের শেষ শক্তি সঞ্চয় করে সে বললে, ‘হাত আমার কাঁপবে না রে, তোকে যে কথা দিয়েছিলাম ভাই!’ চমৎকার অপারেশন করে সে...’ এইখানে থেমে গেল কমরেড, অস্ফুট হাহাকার করে কাগজটা দিলে আমায়, ‘নিজেই পড়...’

পড়লাম: ‘ভয়ংকর এই স্বস্তিলাভে ঝাঁকুনি খায় তার অতিপ্রচেষ্টাপীড়িত দেহবন্দ। হাত থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট খসে পড়ে তার, টলে উঠে পড়ে যায় তার প্রাণহীন দেহ। বীর ডাক্তার, নিজের প্রাণ দিয়ে সে এ দিন সাতটি জীবন বাঁচিয়েছে...’

বার্কাটা আর পড়লাম না। কাগজ সারিয়ে রাখলাম। বেচারি রেজেন্ডা। সারা দিনটা কেবল মনে পড়ছিল ওর কথা। ঠিক করলাম শহরে ফিরেই ওকে খুঁজে বার করব।

পেঁছলাম বিশাল এক শূন্য বাড়িতে, পরিত্যক্ত বাসগৃহের নির্বিকার স্তব্ধতা তাতে। কাচ-ভাঙা জানলাগুলো ভোঁতা-ভোঁতা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফাঁকা ময়দানে, বাতাসে ধুলোর ছোট্ট একটা কুণ্ডলী উড়ছে সেখানে। বাড়িতে কেউ ছিল না। কে একজন জমাদার বললে, শেষ বাসিন্দা দুজন মেয়ে চলে গেছে বহুদিন। সদর দরজা বন্ধ। যে গ্যারাজটা নিয়ে রেজেদার অত দৃশ্চিন্তা ছিল, তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মোটরগাড়ি। রেজেদাকে পাওয়া গেল না। করবার আর কিছই নেই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম আপন মনে, এলাকাটায় গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছিল, গোলা ওড়ার করুণ শিসেও মন থেকে তার চিন্তা গেল না। বাড়ি ফিরে পেলাম এক গাদা পুরনো চিঠি, বসন্তের সার্টিঙের পরেই এসে পেঁছেছে। শাদা ধূসর হলুদ খামগুলোর মধ্যে ছিল রেজেদার ছোট্ট একটা চিঠি।

জন্মভূমি দাগেস্তান যাবার পথে ছোটো একটা শহরে তাকে আর তার মাকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। যাত্রার বিবরণ দিয়েছে সে, তারপর লিখেছে: ‘এই জন্যে আমরা গর্বিত যে আমাদের দেশটাই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে মানুষের জন্যে এত যত্ন নেওয়া হয়।’

ওর কথা ভেবে আনন্দ হল, তার জন্মভূমির পাহাড়গুলোতে সে ফিরছে। শুধু অবাক লাগল যে স্বামীর কথা কিছই লেখে নি। কী ঘটেছে সেটা সে এখনো জানে না, নাকি তার প্রকৃতিগত সংঘর্ষে সে তার দুঃখকে রেখেছে কঠিন শাসনে, চাপা রেখেছে তার বৃকের গভীরে? কিন্তু প্রাণ যার অত তেজী, অত যার আত্মবিশ্বাস, তা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদ সে ছেড়ে গেল কেন?

পাহাড়ী ডাক্তার আব্দুসসঈদ ইসায়েভের বীরোচিত মৃত্যুর কথা আবার পড়লাম কাগজটা থেকে, হঠাৎ কতকগুলো পঙক্তি চোখে

পড়ল, আগের বার কেমন করে যেন তা চোখ এঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখন তা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল।

স্ট্রচারবাহক আহতদের ভিড়ে ও যখন আহত হয়ে শব্দেছিল কুটিরটায়, তখন সে তার বউয়ের কথা বলেছিল, থাকে সে লেনিনগ্রাদে, সেখান থেকে চলে যেতে চায় না, বলেছিল, ছেলে হবে তার।

কঠোর কোমল রেজেদা! ও কথা সে আমায় বলে নি। জন্মভূমির পাহাড়ে সে ফিরে গেছে সন্তানের জন্ম দিতে, ছোট্ট পাহাড়ীকে সে মানুষ করে তুলবে, হয়ে উঠবে সে স্বদেশের নিভাঁক সান্দ্রী, যেমন ছিল মস্কোরক্ষাকারী তার বীর পিতা, আমাদের দেশের মুক্তিপ্রিয় জনগণের মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে লেনিনগ্রাদের জন্যে যেমন লড়েছে তার নিভঁয়া মা।

হ্যাঁ, ধন্য হবে দাগেস্তানের পাহাড়, বরফ-ঢাকা তার চুড়ো, কুয়াশা ছড়ানো নীল তার উপত্যকা, ধন্য তার হৃদয় ও প্রাণে বীর্ষবান অপরূপ সব ছেলেমেয়ে!

‘এখনো বেঁচে’



কারখানা থেকে সে ছাড়া পেত কদাচিৎ।
কিন্তু ছোটো একটা জমায়েতে বক্তৃতা দেওয়া
দরকার, নিজের কাজের কথা বলতে হবে।

‘বলা-টলা আমার আসে না,’ বললে সে
গদ্বরু দিগেই।

ওকে বলা হল, ‘যা, যা, তুই আমাদের
আগদ্বয়ান লোক, অল্প কথায় বলবি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী হয়েও
কি ভাবে পঞ্চম শ্রেণীর কাজ করে দিস, কি ভাবে লেদ চালাতে
শিখলি, এইসব আর কি।’

জমায়েতটা বেশিক্ষণ চলে নি।

‘লড়াইয়ের দিন-কাল,’ বললে সে ভারি ক্লি গলায়, যেন কতকালের
শ্রমিক। এমন কি লোকের মূখে হাসিই ফুটল যখন সে জলদে
বললে, ‘আমার বিভাগে পুরনো মজুরদের মধ্যে আছি কেবল
দু’জন — আমি আর স্তেপানভা। সবাই চলে গেছে ফ্রন্টে, নয়ত
অসুখে পড়েছে, কিংবা মারা গেছে অথবা ইভাকুয়েট করেছে।
স্তেপানভা আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। ওর বয়স উনিশ-কুড়ির মতো,
আমার পনের-ষোলো...’

জমায়েতটা তার ভালোই লাগল, অনেক ভালো ভালো লোক
বক্তৃতা দিলে তাতে, প্রত্যেকেই তাদের পেশা নিয়ে, অবরোধের
দিনগুলো আর শীতকাল আর কত বিপদ সহিতে হয়েছে তা নিয়ে
জানবার মতো কথা বললে অনেক।

ছোট একটা নদীর তীরের রাস্তা দিয়ে আপন মনে আস্তে
আস্তে হাঁটছিল সে, গাছগুলোর গায়ে এর মধ্যেই সবুজ উত্তরীয়
উঠেছে, রাস্তাটা যেন ধুয়ে পরিষ্কার করা, শহরটা দেখে আর
কিছুতেই শীতকালের মন-মরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না।

একটা বেণিতে বসে সে তৃপ্তির সঙ্গে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল।

সারা শীতটা ওর নিজের কথা ভাবার সময় ছিল না, কিন্তু এখন ওই জমিয়েতটার পর, যা কিছু সে শুনল তাতে একরাশ স্মৃতি জেগে উঠল তার মনে। নিজেকে সে দেখলে তার আপন গায়ের, আঙিনায় বালতি নিয়ে হাঁটছে বোনটা; ভাইয়ের দেহ দেখলে সে, ছোটো জন কলখজের ঘোড়ার পিঠে, আরেকজনের গায়ে ফিল্ড শার্ট, পায়ে কাঁটা লাগানো হাইবুট, তখন সে ফিরেছিল ফোঁজ থেকে। এখন লড়ছে জার্মানদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে চিঠিপত্র আসছে না। বোঝা যায় তার মতো ওরাও দেশরক্ষায় খাটছে দিন রাত। মনে পড়ল লেনিনগ্রাদের প্রথম মাসগুলোর কথা, শিক্ষানবিসি, তারপর লেদ ঘর, প্রকাণ্ড হলটার ঠান্ডায় লোহার চাঁছুনি ছিটকানো, গজ-গজ ঠক্ঠক্ করা লেদযন্ত্রগুলো প্রথম দেখে কী অবাকই না সে হয়েছিল।

সবই ভালো লেগেছিল তার, সবই দিব্যি চলেছে, তাকে বলতেও হত না, হাত যেন আপনা থেকেই টের পেত কি ভাবে কী করতে হবে। সে ছিল কাজের ভক্ত। কেমন যেন অবাক হয়েই সে দেখত কি ভাবে তার হাত থেকে বেরিয়ে আসছে তারই বানানো যন্ত্রাংশ। আর ওটা যে তারই বানানো তা ভেবে গর্বে বুক ভরে উঠত তার। কিছুতেই কারখানা ছাড়বে না সে, তার সঙ্গীরা গায়ের বাড়ি ফিরে গেছে, সে যাবে না, শহর সে ছাড়বে না। কী বিরাট শহর, যতই হাঁটা যাক, প্রত্যেক বারই কিছু না কিছু নতুন চোখে পড়বেই। এ শহরকে সে দেখেছে যেন সিনেমার এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যখন যুদ্ধ শুরুর হয়েছে, রাতের পর রাত জ্বলেছে ঘরবাড়ি, বোমা পড়েছে, সার্চ লাইটে আলো হয়ে গেছে আকাশ, অবিরাম গর্জন করে গেছে বিমান-বিধ্বংসী কামান। পাথর ছড়ানো ভগ্নস্তূপের তল থেকে লোক টেনে বার করতে সেও হাত লাগিয়েছে।

কাজটা ছিল কঠিন, বিপদের কাজ। তার সঙ্গেই কাজ করত ওই ভালো মানুষ ফোরম্যান পারফেনি ইভানোভিচ, যে তার, তিমোফেই স্কবেলেভের একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছিল ‘এখনো-বেঁচে’।

ব্যাপারটা এই। পারফেনি ইভানোভিচ আসে তাদের ছাত্রাবাসে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেমন চলছে। কেমন থতোমতো খেয়ে যায় তিমোফেই, কথা গুলিয়ে বসে। তা ‘কেমন আছ’ এই প্রশ্নের জবাবে সে ভেবেছিল বলবে ‘ভালোই আছি’, কিন্তু কেমন ঘাবড়ে গিয়ে গোলমাল করে বলে ‘এখনো বেঁচে আছি’।

সবাই হেসে ওঠে। তারপর পারফেনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তাদের। খবরাখবর করতে এসে সে রহস্য করে জিজ্ঞেস করত, ‘তা আমাদের ঐ ‘এখনো-বেঁচে’ বেঁচে আছে তো?’ ‘বেঁচে আছে,’ বলে সঙ্গীরা তার কাছে টেনে আনত তিমোফেইকে।

উচ্ছল বাসন্তী বাগিচার মৃদুখোমৃদুখি বৌগিখানায় বসে সে পদ্রনো কথা ভাবছিল। শীতে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায় কারখানা। তুষার স্তূপের মধ্যে দিয়ে সে জল বয়ে আনত পিপেয়, ক্যান্টিনে খেত বুনো মদ্রো, ঘুমত মেঘ চর্মের কোট চাপা দিয়ে, পদ্রনো কোনো কাঠের বাড়ি ভেঙে লকড়ি বানাত। তারপর ফের কাজ শুরুর করলে কারখানা, ও যা বলত, ফ্রণ্টের জন্যে ‘গোপন জিনিস’ বানাতে লাগল। নিজেই সে জানত না কী করে সে টিকে রইল। তাপ নেই, খাদ্য নেই, তাহলেও চমৎকার সঙ্গে গেল সে সবকিছু, তারপর বসন্তের প্রথম উষ্ণ আমেজ বইতেই একেবারে চাপা হয়ে উঠল।

সে শীতে কুড়ুল হাতে তাকে দেখলে চোখ পর্যন্ত মাফলার-ঢাকা পারফেনি ইভানোভিচ জিজ্ঞেস করত, ‘তা কী? এখনো বেঁচে আছিস ভাই?’

ঠাণ্ডা বসা গলায় সে জবাব দিত, ‘এখনো বেঁচে। তাছাড়া করব কী?’

‘স’য়ে যা কসাক, সর্দার হবি!’ বলত পারফোর্নি ইভানোভিচ।

সর্দার হোক না হোক, লেদ ঘরে ও হয়ে উঠল সবচেয়ে কুশলী শ্রমিক, কয়েকজন জোগাড়েও মিলল তার।

বেঁগিতে বসে থাকার সময় এইসব কথা তিমোফেই’র মনে পড়ল কেমন ভিড় করে। এইসব ভাবনায়, তাদের প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে ক্লান্তি লাগল তার। ভাবনা রেখে সে দেখতে লাগল গাছপালা, নদী, পথচারীদের। অদ্ভুত এই জীবন। নিজের দিকে চাইল সে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী তার পোষাক, নিখুঁত কাজ করে, সময়ের পরোয়া করে না, মাঝে মাঝে একটানা দু’দিন ধরে খেটে যায়, নিজেকে তার মনে হল সুখী, অথচ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই বসে আছে জার্মানরা, বাতাসে পাহারাদার বিমানের গুঞ্জন, কিংবা হঠাৎ দূর্বোধ্য ক্ষিপ্ৰতায় এসে পড়তে লাগল গোলা।

তার কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বাসন্তী পোষাক পরা সব লোক, একটা ছেলে মাছ ধরছিল, কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারছিল না।

ছেলেটা রোগা, চোখা নাক, গায়ে ধূসর একটা কুর্ত। প্রথমটা আনমনার মতো মাছ ধরা দেখছিল তিমোফেই, কিন্তু তারপর ছেলেটা যখন উঠে, ছিপ কাঁধে নিয়ে শিস দিয়ে সবুজ বেঁগিটার দিকে আসতে লাগল, তখন ঠিক যেন একটা ঘুঁষি লাগল তার পাজরায়। ছেলেটা যতই তার কাছে এগিয়ে এল ততই স্পষ্ট করে তার চোখে পড়ল গালের ওপর মস্তো একটা বাদামী দাগ, যেন কর্ফির একটা ধারা জমে গেছে সেখানে।

ছেলেটা তার সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় তিমোফেই বললে:

‘এই, একটু দাঁড়া।’

ছেলেটা ফিরে দাঁড়িয়ে তিমোফেই’র আপাদমস্তক লক্ষ করে বললে:

‘কেন?’

‘যদি তোর তাড়া না থাকে, তাহলে একটু বস না,’ বললে তিমোফেই।

‘তাড়া তেমন নেই,’ বলে ছেলেটা বসল বোঁগিতে।

নীরবে তিমোফেই তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তাতে বিরক্তি ধরে গেল ছেলেটার। বললে:

‘আমি কি ছবি নাকি? কিছু বলতে হয় বল, নইলে চললাম...’

‘কী তুই চটপটে,’ বললে তিমোফেই, ‘আমার কিন্তু ভাবতে সময় লাগে।’

‘চটপট করে ভাব!’

হেসে উঠল ছেলেটা, তিমোফেই তখন জিজ্ঞেস করলে:

‘আচ্ছা, শীতকালে তুই থাকতিস কোথায়?’

‘কোথায় থাকতাম?’ শিস দিয়ে উঠল ছেলেটা, ‘এখন সেখানে একটা ই’দুরও থাকে না। বোমা পড়ে বাড়িটা একেবারে লোপাট। নিজে আমি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।’

‘আরে তাই তো জিজ্ঞেস করছি,’ খুঁশ হয়ে উঠল তিমোফেই, ‘চারতলা বাড়ি, ঝুলবারান্দা ছিল, কোণে ওইখানে...’

‘ঠিকই। তুই-ও সেখানে থাকতিস ব’দ্বি? নাকি চেনা কেউ ছিল?’

তিমোফেই বললে, ‘না, আমি থাকতাম না। তোর নাম কী?’

‘শুঁরা নিকিতিন...’

‘আচ্ছা শুঁরা, কী এখন তুই করছিস, পড়ছিস নাকি?’

‘মা মারা গেছে, বাবা ফোঁজে, আছি মাসির কাছে। ভাবছি

কাজ করব, কিন্তু কী কাজ, কোথায়, কিছুর জ্ঞান না, এখনো ছোটো...’

‘বয়স কত?’

‘পনেরো হবে।’

‘ছোটো আবার কী, মোটেই ছোটো নোস। যদি চাস তোকে কাজে লাগিয়ে দেব।’

‘তুই?’ সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলে শূরা, চোখ দিয়ে সে গিলতে লাগল তিমোফেইকে।

‘তাছাড়া আবার কে?’ সগর্বে বললে তিমোফেই, ‘এক্ষুনি আমি তোকে একটা চিরকুট লিখে দিচ্ছি একটা লোকের কাছে।’

‘আর তুই নিজে কী করিস?’

‘আমি ভাই লেদ চালাই, তুই-ও চালাবি। এখন বয়স-টয়সের কোনো মানে হয় না। শীতের ধকলটা কাটালি কেমন?’

‘কাটল, একটু গরম হতেই ছুটছি, জোর পাচ্ছি পায়ে...’

‘বটে, তাহলে কাজ করতে পারবি। সাঁকোর ওখানকার কারখানাটা চিনিস?’

‘চিনি।’

‘ওইখানেই আমি কাজ করি। এক্ষুনি তোকে চিরকুট লিখে দিচ্ছি।’

তার গর্বের ধন নোট-বইটা বার করল সে, পেনসিলের শিস থুতু দিয়ে ভিজিয়ে বড়ো বড়ো হরফে সে লিখলে: ‘পারফেনি ইভানোভিচ দা, শূরা নিকিতিনকে কাজ দিতে হবে আমার কাছে। কেন সব আপনাকে বলব, সেও বলবে।’

শূরাকে সে চিরকুটটা দিলে। অবাক হয়ে সে বললে:

‘এ তুই কী সই করেছিস ‘এখনো বেঁচে’? সে আবার কী?’

‘ওটা গোপন ব্যাপার। পারফেনি ইভানোভিচের সঙ্গে ওটা

আমাদের এক গল্প সংকেত। ভয় নেই, তোকে ডোবাব না। তবে দেখিস, আসবি তো? ধাপ্পা দিবি না?’

‘ধাপ্পা দেবার কী আছে? নিশ্চয় আসব! লেদ মেন্সনের কাজ বাবা আমায় কিছুটা শিখিয়েছিল। আচ্ছা, তুই আমায় থামালি কেন বল তো? আমায় চিনিস নাকি?’

‘খানিকটা চিনি,’ হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে বললে তিমোফেই, ‘আমি থাকি কাছেই, অনেকবার তোকে দেখেছি...’

‘তুই-ও আমার কেমন চেনা-চেনা, মাইরি বলছি কেমন চেনা,’ বললে শূরা, ‘শুধু মনে করতে পারছি না। কী জানিস, বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ার পর থেকে প্রায়ই মাথা টন্টন্ করে আমার। কোথায় যেন তোকে দেখেছি, সত্যি দেখেছি...’

‘তা দেখেছিস নিশ্চয়,’ একটু এড়িয়ে গিয়ে বললে তিমোফেই, ‘কাছাকাছি থাকি, দেখবি না কেন। তাহলে আসিস কিন্তু।’

পারফেনি ইভানোভিচকে কোথায় পাওয়া যাবে তা বদ্বিষয়ে বললে তিমোফেই।

‘আসব,’ বিদায় জানিয়ে, ছিপটা দুর্লিয়ে শূরা চলে গেল নদীতীরের রাস্তা দিয়ে।

তিমোফেই চেয়ে রইল সেদিকে, ভেবে পেল না কেন গোড়াতেই কথাটা সে ফাঁস করল না। প্রথমটা তার সন্দেহ হয়েছিল, এ কি সেই ছেলেটা, কিন্তু নাম আর গালের দাগটায় সে নিঃসন্দেহ হয়, এ সেই।

একদিন শীতের রাতে ভারি তুষার মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশ থেকে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু হয়। যে দলটায় সে কাজ করত তাদের ডাক পড়ে সদ্য ভেঙে পড়া একটা বাড়িতে। বোমাটা পড়েছিল একেবারে মাঝখানে, এখন অন্ধকারে কুচকুচ করছে জড়াজড়ি করা অসংখ্য লোহার কড়িবরগা সমেত কী এক অপ্রাকৃত কংকাল, আলো নিয়ে লোকে আবর্জনা সরাচ্ছে, চাপা পড়াদের খুঁজছে।

প্রথমটা তিমোফেই কাজ করছিল ভগ্নস্তূপের ওপরটায়। পরে তার ডাক পড়ল নিচে, জেলার স্টাফ কমিশার লণ্ঠনের আলোয় তাকে মন দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলে, নিচের তলায় চাপা পড়া একটা ছেলেকে সে খুঁড়ে বার করতে রাজী আছে কিনা। কালো একটা গর্তের কাছে এল তারা, দূর থেকে একটা ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছিল সেখানে। খুবই সংকীর্ণ ফুটো, বড়োদের পক্ষে তা দিয়ে নামা অসম্ভব। হেলমেট পরলে তিমোফেই, নিলে করাত, হাতুড়ি, ছেনী, কুড়ুল, টর্চলাইট।

ফুটো দিয়ে নামল সে। ও নিশ্চিত জানত, ছেলেটাকে নিয়ে সে উঠে আসবে। কিন্তু অন্যদের সন্দেহ ছিল। ধ্বংসস্তূপটা বসে যেতে শুরুর করল। ওপরকার কাজ বন্ধ করার হুকুম দিলে কমিশার, লোকে ভিড় করে এল নিচের ফুটোটার কাছে। সেখানে হাঁটাহাঁটি শুরুর করলে তারা, পায়ের নিচে মসমস করছিল বরফ, কথা বলছিল তারা চাপা গলায়, কেবল কমিশার থেকে থেকে হাঁক দিচ্ছিল ফুটোটার।

বুক ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে তিন ঘণ্টা তিমোফেই এগুলো ফুটোটা দিয়ে, কীসব তার, পেরেক, চুচলো ইন্টের খোঁচা খেয়ে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটার কাছে পৌঁছল সে, চিত হয়ে শূন্যে সে ছেলেটার ওপরকার ইন্টগুলো সরালে, হাতটা খোলসা করে দিলে, এগিয়ে দিলে জলের ফ্লাস্ক। শক্তি আর ছিল না। টর্চ জেবলে চারপাশের অবস্থা সঠিক মনে করে রাখল। তারপর ফিরে এল। যখন ওপরে উঠল তখন জলে ভেজা ইন্দুরের মতোই সে ঘামে সপসপে।

দম নিয়ে ফের সে ছেলেটাকে টেনে আনতে গেল। এইভাবেই সে খেটেছে আরো ছয় ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত ছেলেটাকে টেনেই আনে সে। যখন ওকে টেনে তোলা হল, ক্লান্তিতে তিমোফেই কথা পর্যন্ত বলতে পারিছিল না। শূন্য তার কানে এল ছেলেটার চারপাশে লোকেদের গুঞ্জন, কে যেন তার কাঁধে চাপড় মেরে বললে:

‘শক্ত ছেলে তুই বাছা, বাহবা!’

শ্বদুনেছিল, ছেলেটার নাম শ্বদুরা নিকির্কিতন। জিরিয়ে নিয়ে সে যখন এগিয়ে গেল, ছেলেটাকে তখন হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে স্ট্রেচারে চাপানো হয়েছে, টর্চের আলোয় তার চোখে পড়ল ফ্যাকাশে একখানা মুখ, গালে কফি-রঙা দাগ। এটা ওর মনে থেকে গেছে। তারপর আরো কাজ ছিল, আরো অনেককে বাঁচাতে হবে, তাই শ্বদুধু দেখেছিল অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটা মোড় নিচ্ছে।

আর আজ সুস্থ শ্বদুরা নিকির্কিতন ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল তার কাছ দিয়ে। তাকে সে না থামিয়ে পারে নি।

...কয়েক দিন কাটল। ইণ্টারভ্যালের সময় তিমোফেই’র ডাক পড়ল কলঘরের দপ্তরে। চোঁকাটে পা দিতেই দেখল পারফেইন ইভানোভিচকে, দাঁতে তার একটা মোটা হাতে পাকানো চুরুট। তিমোফেইকে দেখে সেটা সে নামিয়ে একগাল হাসলে। বললে:

‘এখনো বেঁচে আছিস বড়ো! নে, ভর্তি করে নে।’

‘ধন্যবাদ পারফেইন ইভানোভিচ,’ বললে তিমোফেই, ‘তা বটে, এখনো বেঁচেই আছি। ভর্তি করে নিচ্ছি।’

এই সময় দপ্তর ভর্তি লোকের সামনেই শ্বদুরা বললে:

‘আর তুই চেপে গেলি কেন যে তুই স্কবেলেভ? আমি তোকে চিনতেই পারি নি, মাপ করিস, মাইরি! শীতকালের সময় থেকে তুই আমি দ্ব’জনেই খুব বদলে গেছি। অথচ তুই আমায় চিনতে পারলি, আমি পারলাম না। রাস্তায় তুই আমায় চিনলি কেমন করে বল তো?’

গালের কফি-রঙা দাগটা দেখেই যে চিনেছে, সেকথা বলতে তিমোফেই’র লজ্জা হল। জড়োসড়ো হয়ে গেল সে, জবাবে কী একটা বিড়বিড় করে বোঁরিয়ে এল দপ্তর থেকে। তার পেছ পেছ এল শ্বদুরা আর পারফেইন ইভানোভিচ।

তারপর যখন কলঘরে ঢুকল ওরা, দেখা গেল লোহার ছটা আর

ঝলক দেওয়া ঠাণ্ডা, আলোকিত হলটা, তখন তিমোফেই বললে
শুধুরাকে:

‘যা হয়েছে, হয়েছে, সেসব এখন অতীত... এখন আমরা ভাই
কাজ করব দু’জনে মিলে!’ এই বলে সে কত’া আর ওস্তাদের
কায়দায় তার ছোট্ট শক্ত হাতখানা রাখলে লেদযন্নের ঠাণ্ডা ইস্পাতের
ওপর।



বাড়িখানা অবিশ্বাস্যরকমের লক্ষ্মীছাড়া।
বোমাবর্ষণ হয়েছে বাড়িটা, তার ফলে উড়ে গেছে
শার্সি আর কাঠামোগুলো, গোলাবর্ষণও হয়েছে,
তাতে চিলেকোঠায় আর ওপরতলায় আগুন ধরে
গিয়েছিল কোথাও কোথাও। শীতে তা আবর্জনার
ভরে ওঠে, ভেঙে যায় জলের কল, স্নানের আর
মুখ ধোয়ার ঘরে বিছিয়ে যায় ঘুঘু-রঙা বরফ, আধাআধি
আবর্জনার সঙ্গে মিশে বারান্দায় উঁচু হয়ে ওঠে তুষারকণার স্তূপ,
দেবে দেবে যায় মেঝেগুলো, কেননা কাঠ চেলা করা হত ঘরগুলোর
মধ্যেই, দেয়ালগুলোর ধোঁয়ার দাগ, চারিদিক থেকেই কেমন একটা
ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে আমেজ।

নিজেরাই উৎসাহ ভরে হয়রানির তোয়াক্কা না করে নিজেরাই
ওটা তারা মেরামত করে নেয়। ইভান নিকোলায়েভিচকে কেউ জোর
করে টেনে আনে নি এই গতরখাটুনিতে, হঠাৎ তাকে কেউ মজদুর
হতে বললে নিজেই সে অবাক হয়ে যেত — সার্জন সে। বাড়িখানার
এমন হাল ফেরানো দরকার যাতে সেখানে হাসপাতাল খোলা যায়।
এমনিতে বাড়িটা ভালো, মজবুত, কিন্তু তার সুব্যবস্থা করতে
তাকতের দরকার। সবাই টলে টলে পড়েছে, বিশেষ করে কমিশার,
দিন রাত তার বিশ্রাম ছিল না।

লোক গিজগিজ করছে বাড়িটায়। এখানে ছুতোর মিস্ত্রি, ওখানে
রঙ-মিস্ত্রি, কিন্তু কেউ তারা ছুতোর নয়, মিস্ত্রি নয়। সবাই
তারা হাসপাতালের কর্মী — ডাক্তার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবিকা, স্ট্রেচার-
বাহকেরা আশ্তিন গদাটিয়ে ঘসছে, ধুচ্ছে, র্যাঁদা চালাচ্ছে, রঙ লাগাচ্ছে,
পরিষ্কার করছে। খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছিল
শহরের কোলাহল: শীতের পর প্রথম ছাড়া ট্রামগাড়ির ঘটঘট,

মোটরের হর্ণ, পাহারাদার বিমানের দূরাগত ইঞ্জিন-গুঞ্জন, কামানের হুঙ্কার।

আপাদমস্তক শাদা চুন লাগা এক পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করল ইভান নিকোলায়েভিচ:

‘আচ্ছা, ডাক্তার কাতোনিनকে পাওয়া যাবে কোথায়?’

তার কাছে হৃদিশ পেয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে উঠল প্রথমে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে, তারপর ঠাণ্ডা কালো রেলিং দেওয়া ছোটো সিঁড়িতে এবং অবশেষে ছাদে। ছাদটা চওড়া সমতল, শেষ দিকটায় একটা মণ্ড। অনেকখানি জুড়ে শহরটা ভালো দেখা যায় এখান থেকে। লাল লাল ছাদের সমুদ্রের ওপর উঁচু হয়ে উঠেছে এক-একটা শলাকা-চুড়া। দিগন্ত জুড়ে বসন্ত, শ্যাম-নীলাভ। গোটা ছাদ ভরা তুষারস্তুপের আবর্জনা, তা থেকে বেরিয়ে আছে যত রাজ্যের তত্ত্বা আর জঞ্জাল।

নোংরা সবুজাভ এই বর্মটাকে গাঁইতি দিয়ে ভাঙিছিল ডাক্তার কাতোনিন, ঘা খেয়ে শিস দিয়ে উড়িছিল বরফের টুকরোগুলো। ডাক্তার ফিরে চাইলে না, ইভান নিকোলায়েভিচও নীরবে তার শক্তিশালী ভঙ্গিগুলো লক্ষ করে গেল। সিধে হয়ে দাঁড়াল কাতোনিন, বরফে গাঁইতি বিঁধিয়ে, দুই হাত চাপড়াতে চাপড়াতে মুখ ফেরাল। একটুও অবাক না হয়ে ইভান নিকোলায়েভিচের দিকে তাকিয়ে বললে:

‘মজার কাজ ভায়া, একেবারে হারামি। কিন্তু তাড়াতাড়ি এই বিদিকিচিচিরি ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলতে হবে। এখানে থাকতে হবে, খাটতে হবে আমাদেরি তো...’

থুতু দিয়ে তালু ভিজিয়ে সে ফের খনি মজুরের খ্যাপামিতে বরফের চাঙড় ভাঙতে লাগল। পিঠের পেছনে হাত রেখে ইভান নিকোলায়েভিচ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কখনো তার দিকে, কখনো নিচে প্রসারিত শহরটা, দেখতে লাগল এমন মন দিয়ে যেন এই প্রথম

দেখছে। অথচ এই ছাদে সে জীবনে এসেছে অনেক বার। এক সময় রেস্টোরাঁ ছিল এখানে, সরগরম, কোলাহলমুখর...

কোনো দিকে না চেয়ে, আঁড়ি না ভেঙে এবার খেটে যেতে লাগল কাতোনি। পা টিপে টিপে ছাদ থেকে চলে গেল ইভান নিকোলায়েভিচ। কপালের ওপরকার দাগগুলো ফুটে উঠল আরো তীক্ষ্ণ হয়ে, কেমন একটা স্নায়বিক দমকে কেঁপে কেঁপে উঠল কাঁধ।

পরের দিন সে গদুদামে এল। যন্ত্রপাতিগুলো যেখানে থাকত সেই কোণের দিকটা অনিশ্চিতের মতো দেখিয়ে গদুদামদারকে বললে:

‘দাও তো আমায় ওইটে... ওই যে কী বলে শাবল, নাকি বেলচা, না আঁচড়া, মানে বদ্বতে পারছ — ছাদটা পরিষ্কার করতে হবে...’

‘কিন্তু আপনার হাত, ডাক্তার,’ বললে গদুদামদার, ‘আপনার কি উচিত হবে? আপনাকে ছাড়াই আমরা চালিয়ে নেব।’

‘কী?’ চেঁচিয়ে উঠল ইভান নিকোলায়েভিচ, ‘আমার হাতের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। সেটা আমি ভাবব। আপনার মাল দিন। কমিশারের সঙ্গে আমি কথা কয়ে নিয়েছি, সব ঠিক আছে।’

কাঁধে শাবল আর হাতে বেলচা নিয়ে সে লম্বা পাড়ি দিলে ছাদের উদ্দেশ্যে। সেখানে সে কাতোনিনের উল্টো দিককার কোণটা বাছলে।

এখানে উঁচু হয়ে ছিল একটা ধূসর স্তূপ, রাজ্যের রকমারি জিনিস এখানে জমে আছে। এমন কি চেয়ারের একটা ভাঙা পায়োও উঁচিয়ে আছে জেলির মধ্যে হাড়ের মতো। শাবলটা নিয়ে শূরু করলে সে ধীরেসুস্থে, প্রথমে খুব ব্যথা লাগল হাতে। বেমক্কা ঘা মেরে মেরে ভারি হাঁপিয়ে পড়ল সে।

তখন স্তূপটার ওপরে উঠে সে এল। শাবল দিয়ে স্তূপটার গায়ে ধাপ কেটে ওপরে উঠে বেলচা দিয়ে তুষার হিমানী আর

আবজ্ঞানা ছুড়ে ফেলতে লাগল। দ্ব’ ঘণ্টা কাজের পর তার বেলচায় কঠিন কী একটা জিনিস ঠেকল, এক পাশে পড়ে যাওয়া তুষারস্তূপের তল থেকে দেখা গেল একটা মাথা।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সে উবু হয়ে বসে পড়ল, মর্মরের মাথাটাকে দেখতে লাগল যেন এক অলৌকিক আশ্চর্য। সত্যিই: জমাট আবজ্ঞানায় এক অবর্ণনীয় স্তূপের তল থেকে তাকিয়ে আছে এক সুন্দর নারী মূখ — অপরূপ, ঈষৎ অহংকৃত, মাথার ওপর কবরী — সত্যিই সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

‘বটে!’ কপাল মূছে সে বললে, ‘বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তা আর কী হয়েছে, চালিয়ে যাই।’

কিন্তু এবার পাথরের মতো শক্ত যে আবজ্ঞানা স্তূপের মধ্যে মূর্তিটা তলিয়ে ছিল তা ভাঙতে, বরফ ফাটাতে, তুষারকণা সরাতে লাগল সে সাবধান হয়ে। নিচে নেমে আসত সে, খেত, আলোচনায় বসত, কথা কহিত কমরেডদের সঙ্গে, কিন্তু খেয়াল হত যে ছাদের ওই মূর্তিটার কথা সে ভাবছে বড়ো বেশি। প্রতিদিন সে যেতে লাগল ছাদে, একদিন বেলচা হাতে এক স্ট্রেচার-বাহক তার বদলী হতে এলে সে শাবল নেড়ে রেগে বলে উঠেছিল:

‘কাজ সকলের জন্যেই যথেষ্ট আছে হে। ডাক্তার কাতোনিনের কাছে যান। এটা আর্মি একাই সামলাব।’

তবে নিজেই একদিন সে বরফের ঢিপি থেকে নেমে গেল ডাক্তার কাতোনিনের কাছে, সন্তর্পণে তার আস্থিনে টান দিলে।

‘কী ব্যাপার ইভান নিকোলায়েভিচ?’ জিজ্ঞেস করলে কাতোনিন।

‘আপনার সঙ্গে ছোট্ট একটা আলোচনা আছে।’

‘কিন্তু আজই তো সন্ধ্যা আলোচনা বৈঠকের কথা আছে...’ শব্দরুদ্ধ করেছিল কাতোনিন।

কিন্তু ইভান নিকোলায়েভিচ তাকে থামিয়ে দিলে:

‘না, না, আলোচনাটা দরকার এইখানে, এই দ্ব’পা এগিয়ে, আসুন-না...’

কাতোনিन তার সঙ্গে ইভান নিকোলায়েভিচের কোণটায় গিয়ে দেখল নোংরা তুষারস্তূপের তল থেকে বেরিয়ে এসেছে অপদূর্ব এক দেহকাণ্ড, পড়ে যাওয়া দেওয়ালের পটে তা দেখাচ্ছে অঙ্কিত শাদা।

‘আপনার কী মনে হয়, কার মর্দতি?’ জিজ্ঞেস করলে ইভান নিকোলায়েভিচ, ‘দেখছেন তো, অনিচ্ছায় পুরাতাত্ত্বিক হয়ে বসেছি।’

‘আমার মনে হয় এটা ভেনাস, ইভান নিকোলায়েভিচ,’ বোন্ধার ভাব করে বললে কাতোনিন, এমন কি দ্ব’পা পিছিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে দেখতেও লাগল।

‘আমারও তাই মনে হয়,’ বললে ইভান নিকোলায়েভিচ, ‘চিরকাল বইপত্রে পড়ে আসছি যে ভেনাসের জন্ম ওই তরঙ্গে, সমুদ্রের ফেনায়, আর এখানে, ঈশ্বর জানেন কী থেকে, আর তার জন্মদান করছেন কোনো এক জিউস নন, শাবল হাতে এক বৃদ্ধ সার্জন, তবে জন্ম দিচ্ছে ঠিকই। দেখুন শিগগিরই কাজ সারছি...’

‘আপনার কেমন চটপট এগুচ্ছে,’ ঈর্ষার সুরে বললে কাতোনিন, ‘তবে আপনার এখানে সত্যিই ভেনাস রয়েছে, আমার জায়গাটায় তেমন কিছ্ নেই।’

সেদিন ইভান নিকোলায়েভিচ ক্লাস্তিতে কিছু মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে তলার পর তলায় ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াল, ক্ষিপ্ত মেরামত চলছিল সেখানে, সবকিছুতেই তার ভারি মনোযোগ দেখা গেল। মেঝের ফাটলগুলো ভরাবার জন্যে কী একটা জিনিস বানিয়েছিল দ্ব’জন নার্স, কাজ করতে করতে লাল হয়ে উঠেছে, তাদের কাছে থেমে সে উপদেশ দিলে ওপরটায় রজন লাগাতে। একজন পরিচারিকাকে থতোমতো খাইয়ে সে তার হাত থেকে মস্তো এক তুলি নিয়ে রঙ করে দিলে দরজার কাঠামো, বললে:

‘এইভাবে টান দিতে হয়। ওপর থেকে টেনে সমানভাবে মিলিয়ে দিতে হয়, নইলে দেখুন, আপনার ডোরাগুলো কেমন দাঁড়িয়েছে। সমান হওয়া দরকার, সমান।’

টাটকা রঙ-করা একটা কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

‘খাশা কাজ দেখাছি, সুন্দর, আগাগোড়া ফিরোজা। কার মাথায় খেলল এটা?’

আলতা-রঙা গালের একটি তরুণী স্বেচ্ছাসেবিকা ঝঙ্কৃত গলায় জবাব দিলে:

‘অন্য রঙ ছিল না কমরেড ডাক্তার, ফিরোজা রঙই লাগাতে হল...’

‘আরে না না, খারাপ বলাছি না,’ বললে সে, ‘বরং দিব্য হয়েছে। বড়ো কথা, যেন পরিচ্ছন্ন হয়...’

সন্ধ্যায় সে ডাক্তারদের ছোট্ট ক্যান্টিনটায় খাবার সময় বললে:

‘আশ্চর্য ব্যাপার, বসন্তের কাজ একেবারে ঠিক স্বাস্থ্যবাসের মতো। দেখুন-না, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে কী ভালোই না লাগে। লোকের মনে ফুর্তি এসেছে, মুখগুলো আর সবজেটে নয়, হুটোপুটি করেছে বাচ্চাগুলো, সামলে না চললে উল্টে পড়তে হবে ওদের রোলার-স্কটের ধাক্কায়, হাসি ফুটেছে মেয়েদের মুখে, এমন কি ভগ্নস্তূপগুলোও শীতকালের মতো অমন বিছঁছঁির লাগে না, বাতাসের কথা তো বলাইই না... এই সেদিন, ওই যেখানে একটা ব্যুরো না কী ছিল, সিলিং নানারকমের সোনালী নক্সা, সেখানে দাঁখি এক বড়ি উঠে গেছে সিলিং পর্যন্ত, একটা গোল টেবিল পেতেছে, তার ওপর একটা ছোট টেবিল, তার ওপর একটা মই — ন্যাকড়া দিয়ে খোদাইগুলো মুছেছে। একেবারে সার্কাস...’

দিনকে দিন গুঁছিয়ে উঠল বাড়িটা। বেশ চোখে পড়ছিল যে সাফাইয়ের কাজ ভালোই হয়েছে। টাটকা রঙ-করা ছোট ছোট টেবিল

পাতা হয়েছে খাটের কাছে, ঝক্‌ঝক্‌ করছে ধোয়া-মোছা জানলা, স্নানাগার ফিরে পেয়েছে তার আগের ধবলিমা, ওয়াশ-স্ট্যান্ডগুলোয় ফোঁসফোঁস করছে জল, সবাই খুঁশি, মনে পড়ে যায় পোড়ো বাড়িটার ভয়াবহতায় তারা কেমন আঁতকে উঠেছিল প্রথমে।

ইদানীং অনিদ্রায় ভুগছে সার্জন। বসন্তে বরাবরই তার ঘুম ভাঙে সকাল-সকাল। এখন একেবারেই ঘুম গেল। ভোর পর্যন্ত শব্দে থেকে সে উঠে পড়ল, খালি পেটে সিগারেট না খাবার জন্যে নুন দিয়ে এক চিলতে রুটি চিবুল, তারপর সিগারেট পার্কিয়ে চলে গেল ছাদে।

রেলিঙের ওপর বসল সে, পা ঝুলিয়ে বসে রইল বাচ্চাদের মতো। উষার গোলাপী আলোয় রাঙা ভেনাসের দিকে চেয়ে থাকল সে, যা সে নিজে খুঁড়ে তুলেছে। শেষ আবর্জনাগুলো সে সাফ করেছে কিছূ আগেই, এখন মূর্তিটা তার পাদপীঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তেমনি শান্তিতে, মানুষ-মূর্তি সবার প্রতিই সমান নির্মম এই ভয়ঙ্কর শীতটার আগে যেমন সে ছিল।

বিশাল শহরটা অবগাহন করছে স্বচ্ছ আলোর অগ্নি-সমুদ্রে, দিগন্ত-প্রসারিত অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্য থেকে যেন আবির্ভূত হয়েছে কী এক আলোকোদ্যোগ। শহরটা এত নবীন, এত পরাক্রান্ত, এত বসন্তময় যে গতির একটা অদম্য পিপাসা বোধ করল ইভান নিকোলায়েভিচ, রেলিং থেকে আলগোছে নেমে সে বড়ো বড়ো পা ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল ছাদে। কেবলি সে ফিরে ফিরে এসে দাঁড়াচ্ছিল মূর্তিটার কাছে, কেবলি তার মনে হচ্ছিল মূর্তিটা এই বৃষ্টি হেসে উঠবে তার হাস্যকর অনুভূতি, তার বেটপপনা, লোকে যখন ঘুমুচ্ছে তখন তার এই শশব্যস্ত পদচারণায়।

কিন্তু সকালটা এত অপরূপ যে সে বসল, হাটল, সিগারেট খেল আর ভাবতে লাগল জীবনের কথা, এই শহর, এই যুদ্ধ, টেবিলে রক্তাক্ত যাদের সে বাঁচিয়েছে, শাবল বেলচা গাঁইতি নিয়ে কি ভাবে

সে নোংরা, আবর্জনা, তুষারের ভেতর খেটেছে, ভাবতে লাগল সেই সব কথা।

মর্দতিটার সামনে দাঁড়িয়ে সে মৃদু স্বরে বললে:

‘জানো, মানুষ কত শক্তিশ্বর, তার স্বাধীন সংকল্পের চেয়ে পরাক্রান্ত দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কী তার প্রতিভা — গড়েছে এমন একটা শহর, এমনি একটা মর্দতি! আর কোথাকার কোন তুচ্ছ ইতরেরা এইসব ধ্বংস করতে চায় — হারামজাদা! দেখুক না চেষ্টা করে! দেখব কে জেতে।’

‘নিজের হাতের কাজ দেখছেন তন্ময় হয়ে,’ পেছনে শোনা গেল কমিশারের পরিচিত কণ্ঠস্বর, ‘সুন্দর মর্দতি, মজে গেলেন নাকি ডাক্তার? এত সকাল-সকাল উঠেছেন যে?’

কমিশারের পাশাপাশি হাঁটছিল ডাক্তার, কমিশার তাকে তার ভাবাবেগের মূহূর্তে দেখে ফেলেছে বলে কেমন অপ্রতিভ লাগছিল তার, সহৃদয় উপহাসটাকে উড়িয়ে দিয়ে সে বললে:

‘দূর, দূর, মজবার আবার কী আছে, কাঁধটা ওর বাঁকা, হাতখানাও জায়গা মতো নেই...’

‘তাহলে আপনি একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিলেন ইভান নিকোলায়েভিচ?’

‘বটেই তো, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই,’ বলে কমিশারের হাত ধরে ছাদ থেকে চলে গেল ইভান নিকোলায়েভিচ। কমিশারেরও মেজাজ খুব শরীফ, কেননা মেয়েদের দ্ব’ সপ্তাহ আগেই সে নতুন হাসপাতালটা চালু করতে পারবে।

বৃদ্ধ যোদ্ধা



ভারি বৃড়ো সে, দৃষ্টিশক্তি একেবারে ক্ষীণ।
সবাই দাঁড়িয়ে ছিল খোলা জানলাটার কাছে, সেও
এল কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। বললে:

‘কী ব্যাপার বল তো বাপু?’

‘ওই অনেক দূরে শহর থেকে ঘন ধোঁয়া
উঠছে আকাশে। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড এক

শাদা ধোঁয়ার মেঘ। সূর্যাস্তের আলোয় কিনারাগুলো ওর গোলাপী।
এখন ধোঁয়া হয়ে উঠছে নীল। উঠে গেছে একেবারে মধ্য আকাশ
পর্যন্ত।’

জিজ্ঞেস করলে, ‘আগুন লেগেছে? জার্মানরা?’

জবাব এল, ‘হ্যাঁ।’

তখনো আলস্যে গোলা দেগে চলেছে বিমান-বিধ্বংসী
কামান।

...সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা সে মানচিত্র নিয়ে বসে থাকত। সে ছিল
পূরনো সামরিক শিক্ষক, ভূগোলবিদ, উদ্ভাবক, অনেক মানচিত্র ছিল
তার কাছে। সেগুলোর রেখার বৈচিত্র্য, ভূসম্পদের আঁক, ভূসংস্থারে
খামখেয়ালে ভারি তৃপ্তি পেত সে। এইসব নীল রেখা আর বাদামী
ছোপ, সবুজ আর হলুদ জায়গাগুলোর ভেতর দিয়ে সে দেখতে
পেত বিরাট, দৃপ্ত, স্বাধীন, বর্ধিষ্ণু এক পরাক্রান্ত দেশের জীবন।
বছরের পর বছর এ মানচিত্র কেমন বদলেছে সেটা সে
জানত।

কিন্তু এখন সে দেখাছিল লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠের মানচিত্র,
পীড়িতের মতো কঁচকে গেল তার কপাল, দৃষ্টি হয়ে উঠল
গোমড়া, মিটমিটে।

মেসিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ শোনা গেল কাছেই।

ও বললে, ‘না, এ যে হতে পারে না। না, এ অসম্ভব।’

অস্থির হয়ে আতশ কাচটা সে মানচিত্রের ওপর রেখে বড়ো বড়ো পা ফেলে পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

‘কিন্তু কার হাতে দিচ্ছ শহরটা? হিটলারীদের হাতে! নির্বোধ, উদ্ধত, রক্তপিপাসু, নারীশিশুহন্তা ফ্যাসিস্টদের হাতে! হ্যাঁ, হ্যাঁ,’ আপন মনে গজগজ করলে সে, ‘জার্মান জেনারেলরা, আত্মতৃপ্ত এই পদতুলগদুলো সংগঠক খারাপ নয়, লড়তে পারে... লড়তে পারে?’ পরমহুতেই চেঁচিয়ে উঠল সে, ‘হঠকারী সব, ওদের সমস্ত পরিকল্পনা হল ডাকাতে ধাম্পা, মতলব কেবল লোকের চোখ ধাঁধানো, নিরস্ত্র করা, হত্যাযজ্ঞ করা... সেটা হতে দেব না! আমাদের ধাম্পা দিতে পারবি না... ঠকাতে পারবি না রুশ জনগণকে। লেনিনগ্রাদ তোরা পারি না।’

বিছানায় শুল সে, কিন্তু চোখে আর ঘুম নেই। শহরের চারপাশে যে লড়াই চলছে তাতেই তার গোটা হৃদয় আচ্ছন্ন। চোখ বজ্রতেই এই শান্তিপূর্ণ উপকণ্ঠগুলোর ছবি ভেসে উঠল তার মনে, তরুণ কম্যান্ডার হিশেবে একসময় সেখানে সে সামরিক মহড়ায় যোগ দিয়েছিল। নিরিবিলা এই সব জায়গাগুলো এখন একের পর এক নিশ্চিহ্ন হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ধোঁয়ায়, আর ভাবতেও ভয় লাগে, শত্রুর ট্যাঙ্ক হয়ত এর মধ্যেই ভেদ করে এসেছে শহরের সীমানায়। তা যদি হয়... তাহলে হাত বোমা ছোড়ার শক্তি তার এখনো আছে, জিজ্ঞেস করবে না সে, ওরা কত জন, চোখে সে কম দেখে তা ঠিক, জিজ্ঞেস করবে কেবল কোথায় ওরা? না, এ হতে পারে না, পবিত্র রাস্তা আর চক দিয়ে হেঁটে যাবে জার্মানরা — তা হবে না। কখনো না!

সাইরেন বাজলে রক্ষাশ্রয়ে যেত না সে। বাড়ির ওপর বাতাস কাঁপত, চালে এসে পড়ত স্প্লিন্টার, থরথর করত

জানলা, বাড়ি দুলত যেন ওটা কাঠের এক লতামণ্ড, ও কিন্তু কেবল বলত:

‘ওড়ো, ওড়ো-না, শিগগিরই ঘাড়টি ভাঙবে...’

দীর্ঘায়ত হয়ে চলল লড়াই। একেবারে লেনিনগ্রাদের প্রাচীরের কাছেই ঘাঁটি গাড়লে শত্রু। শীত এল। বাড়িটা হয়ে উঠল ঠান্ডা আর অন্ধকার। লোহার ছোটো চুল্লিতে মৃদু শব্দে পড়ত কাঠের স্যাঁতসেঁতে চিলতে। দিন-দিনই বৃদ্ধের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। পূরনো, দলামোচড়া লেপের তলে শূয়ে থাকত সে, আর তার গোটা জীবন ভেসে উঠত তার চোখের সামনে। দীর্ঘ, শ্রমপ্লুট, চিত্তাকর্ষক জীবন সেটা, আর এতগুলো বছর এত দুঃখকষ্ট সহিতে না হলে সে হয়ত আরো অনেক দিন বাঁচত। কিন্তু এখন দুর্বলতায় হাত-পা তার অচল, ছোট চুল্লিটার জন্যে কাঠও তাকে ফেড়ে দেয় অন্য লোকে, বলতেও লজ্জা হয় — এই বাচ্চাদের যুগ্য কাজটাতেও সে ভারি কাহিল হয়ে পড়ে।

ভাবত সে কেবল শহরটার কথা, যা মহান, অদ্বিতীয়, অপূর্ণ।

ভাবালুতার মূহূর্তে অশ্রুমান জীবনের কথা ভেবে যখন খুবই বিষণ্ণ লাগত, তখন সে তার টেবিলের দেরাজ থেকে একটা সোনার ঘড়ি বার করে হাতে ধরে রাখত। ঘড়িটা তার পুরস্কার। মিলিশিয়ার উচ্চ কোর্সে পড়াবার জন্যে এটা সে পায়। এখানে সে পড়িয়েছিল অনেক দিন, বহু তরুণ কুশলী দুঃসাহসী মিলিশিয়া কম্যান্ডারকে সে শিখিয়ে তোলে... কখনো তার মনে পড়ত তাদের হাসি-হাসি মুখ, যৌবনসুলভ উদ্দীপনা, মুখরিত আলাপ, কখনো সে নিজেকে দেখত যুবক, ঘোড়ার পিঠে সে চলছে পাহাড়ে, ফেনায়িত স্রোতে, ককেশাসের চূড়োয় — সদা-উৎসুক মানচিত্রকার, পরিব্রাজক, পার্বত্য যুদ্ধের ঐতিহাসিক... কতিদিনকার কথা...

ভারি দুর্বল হয়ে পড়ল সে। সুপ খাবার সময় চামচটা ধরতেও কষ্ট হত তার। মেয়ে তাকে খাইয়ে দিত, ফ্রন্টের খবরও শোনাত সে।

‘পিছন হটে আসছে, কেবলি পিছন হটেছে,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত সে, প্রায় অন্ধচোখে যন্ত্রণায় তাকাত মেয়ের দিকে।

‘বুড়ো বেশি দিন টিকবে না,’ বলত ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা।

...সেই বিশিষ্ট দিনটায় মেয়েরা যখন নিজের নিজের ঘরে স্টোভ জ্বালাচ্ছে, বৃদ্ধের মেয়ের কানে এল অদ্ভুত সব ধ্বনি। বুড়োর ঘর থেকে এল করাত চালাবার আওয়াজ, কুড়ুলের শব্দ, তারপর গান... হ্যাঁ, কেউ গান গাইছিল সেখানে। শব্দগুলো ধরা গেল না, তবে ও গানে শব্দ ছিল কিনা সন্দেহ। ও এক আত্মবিস্মৃত তৃপ্তির অস্ফুটোচ্চারণ।

সবাই জানত যে বুড়ো শুষে আছে তার জীর্ণ লেপের তলে, চুপচাপ, হতোদ্যম, ক্ষীণ।

দরজার কাছে গেল তার মেয়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা খুললে না। যখন খুললে, দেখা গেল তার বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা কী একটা তত্ত্ব কাটছে করাত দিয়ে, গান গাইছে। হ্যাঁ, গাইছিল সেই। গাইছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ, আর রোগা, চওড়া কাঁধের ওপর একটা পুরনো ছেঁড়া ওভারকোট থাকলেও তাকে দেখাচ্ছিল ধর্ম্যাচার্যের মতো মহিমময়।

‘কী হল তোমার বাবা?’ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়ে, ‘উঠে এলে যে? করাত চালাচ্ছ কেন? তোমার যে কষ্ট হবে।’

মেয়ের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সে পরিষ্কার উচ্চৈঃস্বরে বললে:

‘আজকের রেডিও শুনলি?’

মেয়ে বললে, ‘না তো, কী খবর দিলে?’

হঠাৎ বুড়ো এক হাতে করাত আর অন্য হাতে তত্ত্বাটা নিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল:

‘শুনিস নি তুই, শুনিস নি। সারা দুনিয়া শুনল আর তুই শুনিস নি। মস্কোর কাছে জার্মানরা হেরে ভূত, একেবারে বেহেড! হতচ্ছাড়া হঠকারী সব! আমি আগেই বলেছিলাম, ওরা পারে কেবল ডাকাতের কায়দায় লড়তে। এ কি আর একটা রণকৌশল হল? এ হল কেবল ধৃষ্টতা, গদ্গুডামি। ওরা বেদম মার খেয়েছে রে, ব্লুঝি... লেনিনগ্রাদ ওরা জীবনেও দেখতে পাবে না। এইসব শুনলে লাফিয়ে উঠলাম। লাফিয়ে উঠলাম চেঁচাব বলে: বিজয় জিন্দাবাদ! শূয়ে শূয়ে তো আর ও কথা চিৎকার করে বলা যায় না রে।’

মুহূর্ত



এমনসব মুহূর্ত আসে যখন চারপাশের প্রকৃতি দেখা দেয় তার সঞ্জীবনী শক্তির সমস্ত মহিমায়, সমস্ত দ্যুতিতে, অফুরন্ত ঐশ্বর্যে, তার সমস্ত অনন্যতায়, তার অসংখ্য উন্মোচনের একটিতে, যা সেই মুহূর্তে মনে হয় একমেবাদ্বিতীয়ম এবং কেবল নিজের কাছেই প্রতিভাত।

সে অভিজ্ঞতার জন্যে দরকার নেই মহাসাগর তীরের কোনো সুগম্ভীর পাম-নিকুঞ্জ, দরকার নেই কোনো কালিন্দী মেঘে ঢাকা অতিপ্রাকৃত পাহাড়। আমাদের স্বদেশভূমির স্বকীয় নিসর্গদৃশ্যের একাংশ হলেই তা যথেষ্ট। আপনাকে নয় ঘিরে থাকুক নিরহংকার বাচ্চ, কিংবা বিস্তৃত মাঠ, যার ওপর নিচু হয়ে নেমেছে হৈমন্তী-কুহেলীর আকাশ, হোক সেটা শহর, পার্ক, গাছপালা ভেদ করে যেখানে এসে পেঁাছচ্ছে ট্রামের ঘণ্টি, মোটরের হর্ণ — তা সত্ত্বেও গভীর সেই মুহূর্তের দেখা পেতে পারেন আপনি।

সৃজনী উন্মোচনের, বর্ণ ও বাণীর মিড়ের শেষ গভীরতার সন্ধানী শিল্পীগুরুদের তন্ময়তায় হঠাৎ দেখা দেয় সত্যিকারের অনন্য সেই মুহূর্ত, একটা পুরনো শব্দ দিয়ে আমরা যাকে বলি অনুপ্রেরণা।

জীবনের ঊষালগ্নের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ তেমন মুহূর্ত, সামনের দীর্ঘ পথটার প্রধান জিনিসটা কী তা নিয়ে সবেমাত্র ভাবিত কোনো তরুণ প্রাণের জীবনে বিরল তেমন মুহূর্ত কখনো কখনো দেখা দেয় সর্বোচ্চ জয়জয়ন্তী ও সর্বোচ্চ অমোঘতায়। হয়ত তাকেই আমরা বলি বীরকীর্তি।

এই উপলক্ষে সামান্য একটি ছোটো মেয়ের কাহিনী শোনাও, নাম তার জেন্যা স্তাস্দ্যক।

পড়ত সে ইশকুলের নবম শ্রেণীতে, স্বাস্থ্যের কারণে সে একই ক্লাসে পড়ে থাকে আরো এক বছর। এই থেকেই বোঝা যায় যে শরীরটা তার বীরাজনার মতো নয়। এবং সত্যিই টিপিপক্যাল শহুরে মেয়েদের মধ্যে সেই বোধ হয় সবচেয়ে অলক্ষণীয়। মাথায় সে লম্বা নয়, চেনাপরিচিতরা যা বলত, দেহটা তার ঠুনকো, পাতলা সুগঠিত মৃদু, রঙটা মেদুর বিবর্ণ, বড়ো বড়ো নীল চোখ, দীর্ঘ আঁখি পক্ষ্ম।

কারো চোখে পড়তে চাইত না সে, নিজের দৈহিক অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে ছিল খুবই সচেতন: সে খোঁড়া। এই খঞ্জতায় সবচেয়ে সে বিরত বোধ করত — তাতে কষ্ট পেত সে, ক্রমাগত ঐ খঞ্জতার কথাই মনে হত। তাই তার বয়সোপযোগী আমোদ-প্রমোদ থেকে সে ছিল বঞ্চিত। ছুটতে পারত না সে, নাচতে পারত না। খুঁড়ী — কিশোরী মেয়ের কানে কথাটা শ্রুতিমধুর নয়।

তবে ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজের ব্যাপারে তার ভালো নৈপুণ্য ছিল — স্বেচ্ছাসেবিকা নার্সের তালিম নিয়েছিল সে। থাকত সে লেনিনগ্রাদের কাছে এক ছোটো উপনগরীতে, ঝিরঝিরিয়ে সেখানে বইত ছোটো একটা নদী, বাড়িগুলোও ছোটো ছোটো, কেবল কেল্লার মতো পুরনো প্রকাণ্ড একটা কারখানাই ছিল কোলাহলমৃদু নব জীবনের উৎস। ক্রমাগত অঙ্গবৃদ্ধি হয় তার, বেড়ে ওঠে প্রসারে ও উচ্চতায়, তার অবিরাম শব্দে ভরে উঠত চারিপাশের অনেকটা জায়গা।

শ্রম-জীবনের মাপা তালে ভরা এইরকম একটা ছোটো শহরেও লোকে স্বপ্ন দেখে বৃহত্তম শহরের চেয়ে কম নয়। বসন্তের সন্ধ্যাগুলো সেখানে পূর্ণ হয়ে উঠত তরুণদের আলাপ হাসি

গানে। সবচেয়ে হিংস্র এক ঝঞ্ঝার আকস্মিকতায় রুদ্ধ বীভৎস ঘটনাবলি শহরটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে ছাত্রীটির জীবন কোন পথে যেত বলা যায় না।

হিটলারী চমুদা আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করার প্রথম দিনেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের সঙ্গে জেন্যারও শুরুর হয় ব্যারাক জীবন।

দিনগুলো কাটত যেন এক-একটা দুঃস্বপ্ন। বিরাম নেই কামান গর্জনের। নোটখাতা, ইশকুল, বেরিয়ে বেড়ানো, সাক্ষ্যবাসর — মনে হত এসব কত সদ্‌দুরের ব্যাপার। বাতি নিবে গেল, সন্ধ্যায় ইতিমধ্যেই আগত শরতের বৃষ্টিঝরা, বিমর্ষ নিষ্প্রদীপ নিশার তমসায় ডুবে যেত শহরটা।

আর এই সেদিনও যে হাত থেকে কালির দাগ যেত না, সেই হাতে সে ব্যাণ্ডেজ করে যেত আহতদের, সারা গায়ে রক্ত মেখে শুনত তাদের গোঙানি আর বিড়বিড়ানি, ব্যাণ্ডেজের কাপড় কাটত, জল খেতে দিত তাদের, সান্ত্বনা জানাত, এমন কি যারা খুব বেশি ভেঙে পড়েছে তাদের ধমকও দিত, আর নিজেকে মনে হত শহরের ওপরকার ঘূর্ণিঝড়টায় উড়ন্ত এক বালুকণা।

মাঠে, খানা-খন্ডে সে এর আগে কখনো রাত কাটায় নি, শূন্যে থাকে নি ভেজা কাদার ওপর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের হাত-ব্যাগটা খসখসে ওভারকোটের ওপর চেপে ধরে হাত গরম করে নি আশ্বিনের ভেতর ঢুকিয়ে। এখন তার দিন কাটতে লাগল কেবল তার পরিবেশটা নিয়েই। বাকি জগতটার অস্তিত্ব হারিয়ে গেল তার কাছে। সে জগত আলোকিত, উষ্ণ, আনন্দময়। আর যেটা এল, সেটার মধ্যে সে দেখল কেবল ক্রেশ আর কঠোরতা, তাতে ভয় পেত সে, শক্তি তার কম। কিন্তু চলে যেতে, দূরে কোথাও চলে যাবার আর্জি জানাতে সে পারে নি।

তাড়াহুড়োয় খোঁড়া, সরু সরু ট্রেণগুলোয় খোঁড়াত সে, হোঁচট খেত, বুক ছেঁচড়ে যেত জলে ভাসা মাঠের ওপর দিয়ে, ভিজ়ে যেত, ঠাণ্ডায় হিহি করত, কিন্তু গোপন আনন্দে বুক তার কেঁপে উঠত যখন যন্ত্রণায় শাদা হয়ে যাওয়া ঠোঁটে আহতেরা ফিস্‌ফিসিয়ে বলত, ‘ধন্যবাদ বোর্নিট।’ কিংবা, ‘আরে কতটুকু মেয়ে রে তুই।’ একটু বড়োরা তাকে বলত সিস্টার।

এইসব সৈন্য আর কম্যান্ডার, বন্দুক থলে বোমা ঝুলিয়ে যারা দিন রাত তার চারপাশে যাতায়াত করছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ সে কিছুই বুঝে উঠতে পারত না। কাছাকাছি গোলা ফাটলেই সে ভয় পেয়ে যেত, তাতে কান ভোঁ-ভোঁ করত তার, নেতিয়ে পড়ত পা।

গহবরের গায়ে গাল ঠেকিয়ে, উবু হয়ে যেমন সে বসেছিল সেই অবস্থাতেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। গহবরটার নিচে তার ব্যাগ, গ্যাস-নিরোধ মুখোস, আর কটোরা, যাতে করে কিছু সেক্স আলু দেওয়া হয় তাকে। ঘুমতো সে ব্যান্ডেজ বাঁধার ফাঁকে, স্বপ্ন দেখতো ইশকুলের উৎসবের, সব তার সঙ্গী সাথীরা জুটেছে সেখানে। প্রচুর ফুল চারিদিকে, কে যেন হাউই ছাড়তে লাগল, আকাশে লাল সবুজ ফুলঝুরি, তারপর উঠল প্রকাণ্ড এক কমলা-রঙের চাঁদ, সবাই তখন গেল স্টেশনে। পতাকা আর ফুলে স্টেশনটা এমন সাজানো যা আগে কখনো হয় নি, অনেক লোক এল ট্রেনে, সবাই রঙ্গ-রসিকতা, হাসাহাসি করছে। তারপর কোথায় যেন উড়ে গেল সে, স্বপ্নের ভেতর নিজেরই তার কেমন হাসি পেল, মনে পড়ল আয়ার কথা: ‘আরো কত বড়ো হবি!’ কিন্তু ফুলে ঢাকা ট্রেনটা হঠাৎ অসংখ্য কালো কালো মোটরে ভেঙে গেল, ঘর্ঘর শব্দ করে তারা তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে চাপা দিতে চাইল তাকে, তাদের ভেতর সে ছুটোছুটি শুরু করল, ভেবে পেল না এটা ঠাট্টা নাকি এই কালো কালো খেঁকুরে যন্ত্রগুলো তাকে সত্যিই চাপা

দেবে? তাদের ঘর্ষার আওয়াজ এতই জোরালো হয়ে উঠল যে ঘুম ভেঙে গেল তার।

এক মৃদুহৃৎ সে ঠাহর করতে পারল না কোথায় আছে। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে, চারিদিকে দ্বন্দ্বাদ্ আওয়াজ, গোলা ফাটার শব্দের সঙ্গে মিশছে মেসিনগানের দমকা খট্‌খটানি। ঘুমের সময় হাতখানা ছিল দেয়ালের সঙ্গে চাপা, এখন তা অসাড় হয়ে গেছে। সুই ফুটছে হাতটায়। নিজেকে তার মনে হল ভারি নিঃসঙ্গ, ভারি অসহায়, ঠান্ডা কাদা-ভরা গহবরের নিচে পরিত্যক্ত। রাতটায় ঠান্ডা ও শঙ্কার আভাস। সে টের পেল চারিদিকে লুপ্তিকিয়ে রয়েছে লোকে, নানান লোকের গলা আর হরেকরকমের শব্দের মধ্যে থেকে সে শুধু এইটুকু বুদ্ধল যে জোর লড়াই শুরু হয়েছে। এই সময় হাঁক শোনা গেল: ‘জেন্যা, ব্যাণ্ডেজ করে দে!’

বান্ধবীর সাহায্যে গহবরে আহত লোকটা এল তার কাছে। নীরবে এসেই সে একটা কালো বস্তুর মতো লুপ্তিকিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করে সে দেখল যে লোকটা স্টেনগান চেপে ধরে আছে হাতে, অন্ধকারেও প্রায় চক্‌চক্‌ করছে তার চোখ। সে জানত এটা দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা চাপার চেষ্টা। কেঁপে উঠল সে, তারপর পুরুপূরির সজ্জান হয়ে ইদানীং কালে আয়ত্ত করা একটা জোরালো ভঙ্গিতে আহতকে গহবরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল। জখম হয়েছিল লোকটার কাঁধে, ওভারকোটটা ভেজা, চ্যাটচেটে, তার ছোঁয়া লাগার ভয় না করে লোকটাকে আধো-আলিঙ্গন করে সে ব্যাণ্ডেজের কাপড় টেনে নিলে। স্টেনগানটা সে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখলে নিজের কাছে, তাতে কাজে অসুবিধা হবে না, অথচ হাতের কাছেই রইল, আহতকে স্থানান্তরিত করার সময় অন্ধকারে ওটাকে আর খুঁজে মরতে হবে না।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হলে লোকটা সশব্দে নিঃশ্বাস টানলে কিন্তু কিছু বললে না। কেবল ডান হাতটা অবিরাম নড়াছিল যেন সে

নিঃসন্দেহ হতে চাইছে যে ওটা এখনো সক্রিয়, যেন ভয় পাচ্ছে
যেকোনো মূহুর্তেই বৃদ্ধি ওটা তার বাঁ হাতের মতোই হয়ে যাবে,
আঙুল দিয়ে ছুঁতেও যা ভয় করে।

কিছু একটা বলবার জন্যে জেন্যা আহতের কাদা-মাথা, ঘামে-
ভেজা মুখখানার একেবারে কাছে মুখ নামিয়ে বললে:

‘ওখানে অবস্থাটা আমাদের কেমন?’

‘খারাপ।’ হঠাৎ সুস্পষ্ট গলায় লোকটা বললে, ‘খারাপ’,
আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে সে চুপ করে গেল।

‘সে কী, বলছ কী?’ উদ্বেগে বলে উঠল জেন্যা।

এই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কেমন বিহ্বল বোধ করল সে। এ কথা
তার জানা ছিল যে আহতেরা তাদের সদ্য অভিজ্ঞাত ঘটনার
প্রভাবে সর্বদাই ভাবে অবস্থাটা খারাপ। গোলাগুলির দাপট অসম্ভব
বেড়ে উঠল। মনে হল যেন এই অন্ধকার নোংরা নৈশ মাটির ওপর
দরদর ধারায় নেমে এসেছে আগুনের বৃষ্টি।

কিন্তু হাউইয়ের আলো আর অগ্নিকাণ্ডের আভাষ তার চোখে
পড়ল যেখানে গোলা ফাটার তান্ডব চলেছে সেখান থেকে ফিরে
আসছে কালো কালো সব মূর্তি, তার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে
তারা, সৈঁধেছে পাশের গর্তগুলোয়, তারপর অদৃশ্য হচ্ছে কোথায়।

বৃদ্ধটা মূচড়ে উঠল তার। গর্তটার ধারে গিয়ে মাথা তুললে
সে, তারপর প্রায় উঠে এল ওপরে, চেয়ে দেখতে লাগল অন্ধকারে।
লোকগুলো আসছে সোজা তার দিকেই, আসছে গুঁড়ি মেরে ঘাড়ের
মধ্যে মাথা গুঁজে। প্রথম যে লোকটা তার গহবর পর্যন্ত এসে
পৌঁছেছিল, সে দেখতে লাগল ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে কিনা।

‘কী হচ্ছে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল জেন্যা, ‘যাচ্ছেন কোথায়
আপনি কমরেড?’

সৈনিকটি দাঁড়িয়েছিল ওপরে, তাতে যেন আরো ঢাঙা
দেখাচ্ছিল তাকে, বললে:

‘আর এখানে তুমি কে?’

‘আমি স্বেচ্ছাসেবিকা। সাবধান, খাল আছে,’ বললে জেন্যা, ‘কী হচ্ছে ওখানে?’

‘ওখানে,’ বন্দুকটা কেমন অদ্ভুতভাবে দুলতে লাগল তার হাতে, ‘দফা রফা। জার্মানরা গোলা দাগছে, বেঁচে আর কেউ নেই...’

‘কিন্তু আপনাদের কম্যান্ডার কোথায়?’ ওর গ্রেট কোর্ট চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে জেন্যা।

‘কম্যান্ডাররা সব ঘায়েল,’ ভাঙা গলায় বললে সৈনিকটি, তারপর নিচু হয়ে চাপ দিলে তার ছোট্ট আতপ্ত হাতে, ‘আটকাস না, এই তুই, ছেড়ে দে, পালা এখান থেকে, মারা পড়বি...’

বলেই এক লাফে সে পাশের ট্রেণে ঝাঁপিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

‘ব্যাপার কী?’ নিজেকেই জিজ্ঞেস করলে সে, ‘পালাচ্ছে সবাই, পালাচ্ছে। তাদের পেছা পেছা আসছে জার্মানরা। এখানেও আসবে, ওই সৈনিকটার মতোই ডিঙিয়ে গিয়ে পড়বে পাশের ট্রেণটায়, তারপর আরো এগুবে, এগুতে এগুতে শহরে, তখন সব শেষ...’

কাঁছিয়ে এল পুরো একটা দল। হাউই-এর আলোয় দপদপ করা এই মূর্তিগুলো দেখে রাগে ব্যথায় জেন্যার সর্বাস্ব কেঁপে উঠল। রাতের গোটা এলাকাটায় চোখ বুলিয়ে নিলে সে, এমন বিকট আর গোমড়া, এমন বিশাল যে এর কাছে সে একটা অকিঞ্চিৎকর তৃণমাত্র, গোলার প্রথম বিস্ফোরণে তার সবচেয়ে ছোট্ট স্প্লিন্টারেই সে পুড়ে যাবে।

আর হঠাৎ তার মনে হল এই মৃত্যুশ্বসিত রাত, আতঙ্ক জাগানো এই অন্ধকার বিস্তার, বন্দুক নামিয়ে ছুটন্ত এই বড়ো বড়ো লোকগুলো, আর অদৃশ্য ওই হিংস্র শত্রু, হাউই ছুড়ে যারা

অন্ধকারকে আলো করছে, সগর্জনে অবিরাম গোলাগুলি দেগে চলেছে ভয়ঙ্কর—এদের সবার চেয়েই সে শক্তিময়ী।

কী যেন একটা চেপে ধরলে তার হৃৎপিণ্ড, কিন্তু ভয় নয় সেটা, যন্ত্রণা নয়। অনদ্ভূতিটা তার সেই স্বপ্নে উড়ে যাওয়ার মতো, নিজেরই হাসি পেয়েছিল তার। ‘আরো বড়ো হব আমি!’ শক্ত হয়ে উঠল পা, ছোটো ছোটো হাত মূঠো বেঁধে উঠল। অদ্ভুত কী একটা কারণে তখনো কাঁপছিল সে, কিন্তু কিছুই এসে যায় না। গোলাগুলি চলছে, মাথার ওপর শিস দিয়ে যাচ্ছে স্প্লিণ্টার, কিছুতেই তার এসে যায় না, ছোটো সে, দুর্বল — এসে যায় না, কম্যান্ড করতে পারে না সে, কিছুই এসে যায় না। এটা সেই মূহূর্ত যখন চূড়ান্ত উন্মাদনায় সে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন। কী জানত সে জীবন সম্পর্কে, এই ছোট প্রাক্তন ইশকুলছাত্রীটি? আর হঠাৎ সে হয়ে উঠল জ্ঞানদা, অমোঘা, ক্ষমাহীনা, গর্বে ভীষণা। এবং নির্মাণ। স্টেনগান চেপে ধরে সে একেবারে সিধে হয়ে দাঁড়াল তাদের সামনে যারা প্রায় তার কাছে এসে পড়েছিল। পিছিয়ে গেল তারা।

‘দাঁড়াও!’ এমন সরু, এমন তীক্ষ্ণ গলায় সে চিৎকার করে উঠল যে ওরা থেমে গেল। অন্ধকারে ট্রেণ বরাবর অল্প এক ঝাঁক গুলি চালালে সে।

‘দাঁড়াও!’ চোঁচিয়ে সে ছুটে গেল তাদের দিকে, যারা থেমে গিয়ে বুকতে পারছিল না কী চায় এই ছোট মেয়েটা, বিস্ফোরণ-দীর্ঘ মাঠের ওপর যে খোঁড়াচ্ছে। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওরা। মদুখগুলো তার চোখে পড়ছিল না, কিন্তু টের পেল বহু চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর পেছনে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে আরো একদল লোক।

‘দাঁড়াও!’ আরো একবার বললে সে, ‘পালাছ? ফেরো বলছি! চলো আমার পেছনে! দেখব তোমরা কেমন বীর! নাও, এগোও! ঘুরে দাঁড়াও!’

স্টেনগান নিয়ে সে দাঁড়িয়ে, খেয়াল নেই কী বলছে, কী করছে। তার সমস্ত ভরসা সে সাঁপে দিয়েছে সেই বৃহৎকে যাতে তার সমস্ত সত্তা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর এই যে সৈন্যগুলো ভয়ানক হাঁপাচ্ছিল, তারাও বাধ্যের মতো ঘুরে দাঁড়াল বলে তার মনে হল। তাদের সঙ্গে সে ফিরে চলল সেইখানে যেখানে শোঁ-শোঁ করে ছুটছে গুলি, উড়ছে গোলা।

পরের দলটায় পৌঁছল তারা। খাটো মতো দেখতে একটা সৈন্যের কাঁধ চেপে ধরল সে, থুতনিতে তার হাস্যকর অল্পবয়সী দাড়ি।

‘কোথেকে আসছ তুমি। কোথায় তোমরা ছিলে?’

‘ওইখানে,’ হাত দিয়ে ডান দিকে দেখাল সে।

‘ফেরো সেখানে! এরাও তোমার সঙ্গে ছিল? ফিরে যাও সবাই। জলদি!’

আপত্তি করলে না তারা। বিশৃঙ্খলের মতো ফিরল ওরা, স্টেনগান হাতে মেয়েটি তাদের চালনা করতে লাগল, মুখে প্রায় যেন একটা হাসি। তবে সে নিজেই জানত না যে সে হাসছে, অন্ধকারে অন্য কারো চোখেও তা পড়ে নি।

একের পর এক নতুন নতুন দলকে সে ফেরালে। পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চগুলোয় তাদের ফিরিয়ে এনে সে জিজ্ঞেস করছিল:

‘এইখানে ছিলে? এইখানেই থাকবে। এক পা পিছু হটা চলবে না।’

‘পিছু হটলেই মেরে ফেলব,’ একথা সে বলে নি, কিন্তু নিশ্চিতই সে জানত যে গুলি করবে, কিছতেই সে থামবে না, বিশৃঙ্খল ক্লিষ্ট বিমর্ষ এই লোকগুলোর সাধ্য নেই তার প্রতিরোধ করে, সাহস নেই দাঁড়ায় এই ছোট ক্ষীণ ইশকুলছাত্রীটির শক্তি আর সংকল্পের বিরুদ্ধে, ভেজা গ্রেট কোটে যার কণ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে, দ্রুত চলায়, নিদারুণ উত্তেজনায় যার গলা ছড়ে যাচ্ছে কলারে।

সম্ভবত পত্রিকার বিবরণে যা বলা হয়, চারিপাশটা ছিল সেইরকম নারকীয়। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। একবার তার পাশেপাশে যে সৈনিকটি হাঁটছিল সে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়, তাদের মাথার ওপর এমন গর্জন ফেটে পড়ে যে মনে হয় খুলি চৌঁচর হয়ে যাবে, কিন্তু পরের মুহূর্তেই মেয়েটি খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, আর যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিল সে অপ্রতিভভাবে বলে:

‘মাপ করো, বেদম ধাক্কা দিয়েছিলাম, নইলে আস্তা থাকতাম না। চোট লাগে নি তো?’

ও কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায়। ট্রেনগুলো ঘুরে যায় সে, ব্যান্ডেজ করে দেয় আহতদের, নজর রাখে যাতে আর কেউ পিছু না হটে, জিজ্ঞেস করে কত টোটা আছে, যেখান থেকে গোলা আর হাউই আসছিল, অন্ধকারে গুলি চালায় সেদিকে, আড়াল নেয় গোলার গর্তে, মাটি আঁকড়ে বুক ছেঁচড়ে চলে ঠান্ডা ঘাসের ওপর দিয়ে, হাত আঁচড়ে যায় কীসব শক্ত জিনিস আর পাথরে। রাতের আর শেষ নেই।

গোলা ফাটছে অবিরাম। ভাঙা ভাঙা ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ শব্দে ফাটছে মাইন। সামনে তার নানা রঙের ঝলক দিয়ে ছুটছে ট্রেনার বুলেট।

পরিখার আধো-অন্ধকারে ভয়ানক ফোঁসফোঁস করছিল একটা ছোকরা। তাকে সে জিজ্ঞেস করলে:

‘ব্যারালিয়নের হেড-কোয়ার্টার কোথায় জানো?’

‘কিসসু ওটা জানে না,’ জবাব দিলে অন্য একটা স্বর, ‘কিন্তু কেন কমরেড কম্যান্ডার?’

জবাবটায় ভারি অবাক লাগল তার। তাকে কিনা বলছে কমরেড কম্যান্ডার! দিনের বেলায় তাকে যখন পরিষ্কার আলোয় দেখবে, তখন নিশ্চয় প্রচণ্ড হেসে উঠবে লোকগুলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিলে:

‘আপনি জানেন?’

‘জানি, তবে এখন সেখানে যাওয়া কঠিন...’

‘আপনি চলে যান সেখানে, আমার চিরকুট নিয়ে যাবেন, বুদ্ধেছেন?’

‘বুদ্ধেছি কমরেড কম্যান্ডার, দিন, লিখে দিন,’ বললে সৈনিকটি।

নিজের নোট-বই বার করে সংক্ষেপে সে লিখলে, একজন কম্যান্ডার দরকার, যোগাযোগ না থাকায় লোক পাঠানো হচ্ছে চিরকুট দিয়ে।

টিপির ওপারে সৈনিকটি অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে, ঠাণ্ডা, সূচীমুখ হাওয়া বইছিল। বুদ্ধে আসছিল চোখ। হাতে পায়ে ক্লান্তি। প্রথম মূহূর্তের মাতাল উন্মাদনা অনেকক্ষণ কেটে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল মাটিতে পড়ে ঘুমোয়। তাহলেও দূর হাঁটুর মাঝখানে স্টেনগান নিয়ে বসে রইল সে, গর্জনে বধির হয়ে চেয়ে রইল সামনে, নির্বিকারভাবে শূন্যে লাগল আশেপাশে ধাক্কা খেয়ে গিঙয়ে উঠছে গুলি।

তারপর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে মূঠো চেপে হাই তুলে সে দেখতে গেল তার ট্রেণটা। সৈন্যেরা কেউ শূন্যে আছে, কেউ বসে, তিন মাথা এক করে, ফিস্ ফিস্ করছে, কাশছে, গুলি চালাচ্ছে, মাঝে মাঝে ক্ষীণ গোঙানি শোনা যাচ্ছে আহতদের।

...সামনে তার এসে দাঁড়াল কম্যান্ডার—লম্বা, বেল্ট-আঁটা, কোমরে ঝুলছে পিস্তল, গ্যাস-নিরোধ মুখোশও আছে, মূখটা চওড়া, চোখ কোঁচকানো, যেন যা দেখছে তাতে বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

ট্রেণের বাঁক ঘেঁষে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়ানো ছোট মূর্তিটার দিকে কড়া চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে সে, ‘কে এখানকার কম্যান্ডার?’ বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি, তার মনে হয়েছিল এই বুদ্ধি ভীত মেয়েটি বলে উঠবে: ‘ভয় লাগছে আমার, বাড়ি যাব, মার কাছে।’

কিন্তু ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে মেয়েটি বললে:

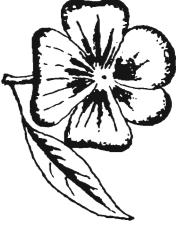
‘এখানে আমি কমান্ডার!’

টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানিয়ে সে দ্রুত পরিষ্কার করে বললে:

‘ব্যটালিয়ন কমান্ডারের নির্দেশে আমি এখানকার দায়িত্ব নিতে এসেছি। চিরকুটটা আপনি পাঠিয়েছিলেন?’

‘আমিই,’ আরো মৃদু স্বরে বললে মেয়েটি, ‘চলুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিই।’

মেয়েটা



ফ্ল্যানেলের পোষাক পরা গিন্মি অন্ধকারে ওর
সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

‘এই! কে এখানে?’

‘আমি, পলিয়া,’ সিঁড়ির ওপর বসে ছিল
মেয়েটি।

‘ছুটছিঁস না কেন? সাইরেন বাজছে। এক্ষুনি
বোমা পড়বে তোর মাথার ওপর।’

‘তার জন্যেই বসে আছি,’ শান্তভাবে বললে পলিয়া।

‘বসে আছিঁস মানে, শেলটারে চলে যা।’

‘আমার কাজই তাই। যাও মাসি, যাও। নইলে তোমার মাথাতেই
পড়বে।’

‘যাবই তো। আর এটার, ইস কী সাহস, বসে আছেন
সিঁড়িতে...’

‘সাহসের কথা নয় গো, আমার কাজ নজর রাখা।’

সিঁড়িতে বসে বসে পলিয়া একদৃষ্টে চেয়ে ছিল আকাশের
দিকে, সার্চ লাইটের আলোক-রেখা পরস্পর কাটাকুটি করে উঠছে
সেখানে, হাউই ফেটে লাল ঢেলা হয়ে ঝুলছে, ট্রেসার বুলেটের
সোনালী স্ফুতোয় রেখায়িত হয়ে উঠছে আকাশের নীল গম্বুজ,
আর সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে উজ্জ্বলমান বিমানের দমকে দমকে
হিংস্র গুঞ্জন। আর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে পলিয়া অপেক্ষা করতে
লাগল সেই ভয়াবহ গর্জন, বিস্ফোরণ, আগ্নেয় বলকের, যা এক্ষুনি
শুরু হবে, আর তাকেই প্রথম সেখানে ছুটে গিয়ে স্থানীয়
প্রতিরক্ষার হেড-কোয়ার্টারে খবর পাঠাতে হবে বোমাটা কোথায়
পড়েছে।

সরু সরু কাঁধের ভেতর মাথা গুঁজে, চোখ বন্ধে সে শুনছিল ক্রমবর্ধমান গর্জন। রাস্তা দিয়ে ভেসে এল বিস্ফোরণের মাথা-ফাটানো আওয়াজ। তপ্ত একটা ঝাপটা লাগল কানে, বন্ধে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল পলিয়া, ছুটল যেখানে সবোন্নত ধসে পড়েছে দেয়াল, ধোঁয়ার মেঘ তখনো মিলিয়ে যায় নি। রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে টার্টকা ধ্বংস। বিদীর্ণ দেয়ালের খাঁজগুলো কুচ্-কুচ্ করছে মাথার ওপরে, রাস্তাটা ভরে উঠেছে ভগ্নস্তূপ, ভাঙা কাচ, কীসব অকল্পনীয় আবর্জনায়। পরের মূহুর্তেই সে পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে জানাল ক্ষতির পরিমাণ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল ভগ্নস্তূপের অন্ধকারে, চিংকার, কাতরানি, কান্না আসছিল সেখান থেকে।

এই চলেছে দিনের পর দিন। তার চেয়ে দ্রুত অকুস্থল খুঁজে বার করতে পারত না কেউ, পারত না অমন আত্মভোলার মতো খাটতে, আহতদের অমন সেবা করতে, টলায়মান দেয়াল, পড়ো-পড়ো কর্দিবর্গা, বিকৃতমুখ মানুষদের মধ্যে অমন রাতভোর কাটাতে। বিশেষ করে বাচ্চাদের উদ্ধারে তার জুড়ি ছিল না।

মাঝে মাঝে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মূছে সে গ্রাণদলের কাজ দেখত বসে বসে, যেন তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। লন্ডভন্ড বাড়ি, অন্ধকার শহর, লোকের হাতে ছোটো ছোটো টর্চের ঝলক — এসব তার কাছে মনে হত নির্ভর, অলীক, অবাস্তব।

অথচ কী রাত ছিল আগে — শান্তিময়, প্রাণোচ্ছল, আলো-জ্বলা ট্রাম, গান, নাচ, যৌবন... হ্যাঁ, এসবই ছিল। সবই হবে। কিন্তু এখন...

‘বা-রে, বসে আছি কেন!’ নিজের মনেই চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠে সে, ফের হাত লাগায় ইন্টপাথর সরাতে, গাঁইতি-বেলচা নিয়ে খাটতে।

আশ্চর্য্য সন্নিহিত হয়ে ওঠে সে, সংকল্পে অটল, স্নায়ু তার কাঁপে না। কিছুর্তেই আর অবাধ লাগে না তার।

একবার ছুটে গিয়ে সে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখে ভেঙে পড়া তলাগল্লোর ওপরে যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, পরনে তার মাত্র অন্তর্বাস, পাঁচতলায় দৈবাৎ টিকে থাকা একটা কোণের ভাঙা দেয়াল ঘেঁষে আছে সে। ডাইনে বাঁয়ে দেয়ালের খানিকটা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন প্রস্তরমূর্তি, যেন নিষ্প্রাণ। একদৃষ্টে পলিয়া তাকিয়ে রইল তার অন্তর্বাসের শাদা ছোপটার দিকে। তার তখন একমাত্র ভাবনা কি করে ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করা যায়, কী করতে হবে।

আরেকবার আলুথালু চুলে বুকুে শিশু আঁকড়ে সোজা তার দিকে ছুটে আসে একটি মেয়ে। বিস্ফোরণে আতঙ্কিত, শিশুটির প্রাণশঙ্কায় উদ্ভ্রান্ত মেয়েটি ওইভাবেই গোটা শহর ছুটে যেতে পারত। পলিয়া তাকে জাপটে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে:

‘এই তো, বাস!’

‘কী বাস? কী বাস?’ বিড়বিড় করে মেয়েটা।

‘বাস,’ বলে পলিয়া, ‘আর ভাবনা নেই। ভয় পাবার মতো কিছুর আর ঘটবে না। বসে জিরিয়ে নাও। একটু শান্ত হও...’

শান্ত করে তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায় পলিয়া।

ঠুনকো এই মেয়েটি, বড়ো বড়ো চোখ যার সহজেই অবাধ হয়, কত আহত জখম অঙ্গহীনকেই না সে টেনে এনেছে, কত লোককে সান্ত্বনা দিয়েছে, খুঁশি করেছে, যতসই সরস মন্তব্যে হাসিয়েছে পর্যন্ত।

‘শিগগিরই জয়ন্তী পালন করবি পলিয়া,’ বলত বান্ধবীরা, ‘যত লোককে বাঁচিয়েছিস, সংখ্যায় সংখ্যায় তা একশ’ পূর্ণ হতে চলেছে।’

বোমাবর্ষণের পর এল গোলাবর্ষণের পালা। আওয়াজ তার অমন কান-ফাটানো নয়, কিন্তু অন্ধকারে, মাথার ওপর উড়ন্ত গোলার শিস আর স্প্লিণ্টারের গোঙানির মধ্যে রাস্তা থেকে আহতদের তুলে আনা তেমন সহজ ছিল না। তাহলেও তুলে এনেছে সে, গন্ডা গন্ডা আহতদের বয়ে এনেছে পিঠে করে।

বিছঁছঁরি সেই ঠাণ্ডা ঝোড়ো সন্ধ্যোটার আগুনে হামলা চলছিল প্রচণ্ড। বালি-ভরা বাক্সগুলোর আড়ালে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল পলিয়া, মাথার ওপর স্প্লিণ্টার এসে বিঁধিছিল বাড়িটায়। ইন্টের গন্ডো ঝরে পড়িছিল, রাস্তায় লাফালাফি করছে পলেন্সারার টুকরো, ভাঙা কাচ। তারপর কে যেন কাতরে উঠল প্রায় কাছেই। রাস্তাটা ফাঁকা, বিরল দ্বু'চার জন পথচারী মাটিতে শূয়ে আছে, উঠে ছুটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে, নয় ফের শূয়ে পড়ছে রাস্তায়।

উৎকর্ণ হয়ে উঠল পলিয়া। কাতরানিটা সত্যিই কাছে। সন্তর্পণে সে ছুটে গেল সেদিকে। নতুন একটা গোলার অগ্নিশিখায় আলো হয়ে উঠল রাস্তাটা। শূয়ে পড়ল সে। গোলাটা পড়ল ফুটপাথে, বিস্ফোরণের আওয়াজে কান ভোঁ-ভোঁ করল অনেকক্ষণ। টিপ্‌টিপ্‌ করিছিল বুক। বাড়ির কাছে পড়ে থাকা একটা ছোকরাকে দেখতে পেল পলিয়া। আগে কোথায় যেন সে তাকে দেখেছে? আরে তাই তো, বসন্তে, ফুটবল ম্যাচে। পান্না-রঙা মাঠ। চারিদিকে হাসি। নানা রঙের গোঞ্জি। যোঁবন। সূর্য। জমজমাট বাজনা, উষ জব্বলজব্বলে দিন, আকাশে হালকা মেঘের কুন্ডলী, আর এই ছেলোটি। সঙ্গীরা তার উদ্দেশে চেঁচাচ্ছিল:

‘এই, এই হাফব্যাক, রুখে!’

এখন সে পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। স্প্লিণ্টার লেগেছিল তার উরুতে, সেখানে পলিয়া হাত দিতেই সে কঁকিয়ে উঠল আরো জোরে। তার ব্যান্ডেজ করতে করতে পলিয়া বললে:

‘এই হাফব্যাক, রুখে! শুনতে পাচ্ছ?’

চুপ করে রইল ছেলেটা, পলিয়া তাকে উঠিয়ে দাঁড় করাল। কিন্তু হাঁটতে সে পারছিল না, প্রায় নেতিয়ে পড়ল পলিয়ার ওপর। লম্বা লম্বা রক্তিম কুপাণে বিদীর্ণ তমসার মধ্যে দিয়ে তাকে সে টেনে আনল।

কিন্তু সম্ভবত ওই গোলাটায় রাস্তাটা, সবকিছুই আধাআধি হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞান হারায় পলিয়া। নরম ঘেসো মাঠের ওপর শূন্যে ছিল সে, অচেনা এক কণ্ঠস্বর তাকে বললে: ‘এই হাফব্যাক, রুখে!’ কিন্তু হাসতে পারল না সে, নড়তেও পারল না, কেন জানি ভাবলে, ‘এটা আমার আটানব্বই নম্বর জখম,’ এবং জ্ঞান হারাল। কিন্তু পাশে যে নীরবে শূন্যে ছিল তার হাতটা সে ধরেই রাখল।

তারপর লোকে যখন ঝুঁকে এল তাদের ওপর, তখন পরিষ্কার গমগমে গলায় পলিয়া বললে:

‘ওকে নিয়ে যান, ও ঘা খেয়েছে উরুতে...’ কথাটা সে শেষ করতে পারে নি।

‘পা,’ কে যেন বললে অন্ধকারে, ‘মেয়েটা জখম হয়েছে পায়ে।’ সেটা তার কানে যায় নি। নরম সবুজ মাঠের ওপর কাকে যেন সে বলছিল:

‘ঠাণ্ডা লাগছে, কী সবুজ ঠাণ্ডা ঘাস!..’

সে রাতে সে আর কিছু দেখে নি...

...কিন্তু বেঁচে ছিল সে। যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন সত্যিই রোদ-ঢালা নরম দিন, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড়ো বড়ো সবুজ পাইন গাছ।



দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, রেগে ফোঁসফোঁস করছে, কিছুটা বিবর্ত।

‘অনেক কণ্টে খুঁজে বার করেছি, এই অন্ধকারে নিজের বাড়িই চেনা দায়।’ টুপি থেকে বরফ ঝেড়ে বললে সে, ‘এটা কি প্রসূতিসদন?’

ওকে বলা হল, ‘হ্যাঁ, কী ব্যাপার?’

‘কী ব্যাপার?... ওই গলিতে একটা মেয়ে প্রসব করছে, এই ব্যাপার...’

‘কিস্তু আপনি কে?’

‘আমি রাস্তার লোক। রাতের শিফট থেকে ফিরছি। তাড়াতাড়ি চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। কান্ড বটে! যাচ্ছি, দেখি মেয়েটা... আমি ছাড়া কেউ কোথাও নেই... কিস্তু আমি তো আর ধাই নই।’

সঙ্গে সঙ্গেই ইরিনা, স্ট্রচারবাহক আর রাস্তার লোকটা রওনা দিলে তুষারস্তুপ দিয়ে। ভয়ানক অন্ধকার। বাড়িগুলোকে মনে হয় পাহাড়। একটি বাতি নেই কোথাও। পাক দিচ্ছে তুষার-ঝঞ্ঝা, বাতাসে উড়ছে তুষার-ধূলির কুণ্ডলী; মনে হয় যেন রাস্তা দিয়ে ছুটছে গদুপ্তসন্ধানীদের ছায়া—স্বচ্ছ, হিমেল, ক্ষিপ্ত।

তুষারস্তুপের কাছে পিঠো-পিঠি বসে পড়ল ওরা। মোড়ের ওপাশ থেকে সরু গ্রন্থবর্ধমান গদুজনটা কাছিয়ে এল, বিস্ফোরণের আওয়াজ ফেটে পড়ল রাস্তায়। একটা বাড়ি থেকে জমাট-বাঁধা তুষার ঝরে গিয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল নিচে।

‘মাগো! ওকে আবার ঘায়েল না করে!’ বললে ইরিনা।

‘না, মেয়েটা আছে অন্যদিকে, ওইখানে,’ বললে লোকটা, ‘ওই আলোটার পেছনে খুঁজুন গিয়ে। আমি চললাম। নইলে যা শব্দ করছে আজ। নিজেই ঘায়েল হতে কতক্ষণ।’

প্রসবের বিশেষ বিদ্যা ইরিনার ছিল না। তার কাজ ছিল কেবল আসন্ন-প্রসবাদের ভর্তি করে নেওয়া, কিন্তু এখন এই গোলা-দাগার রাতে যেতে হচ্ছে তাকে, খুঁজে বার করতে হবে মেয়েটিকে, যে করেই হোক সাহায্য করতে হবে। কারো ভরসায় থেকে লাভ নেই। কেউ সাহায্য করতে আসবে না। নিশ্চুতি রাত। তুষার-ঝঞ্ঝা, শৈত্য, গোলাগর্লি। মাথার ওপর দিয়ে শনশন গমগম শব্দে উড়ে যাচ্ছে কেবলি নতুন নতুন গোলা। স্ট্রেচারবাহককে নিয়ে একটা তুষারস্তুপ থেকে আর এক স্তুপে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল ইরিনা, মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে শুনছিল।

কাতরানিটা আসছিল ডান দিক থেকে। সেই দিকেই ছুটল ওরা। সত্যিই লোকটা যা বলেছিল, এঁটে বন্ধ করা দেউড়ির কাছে বরফের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে মেয়েটা। মেয়েটার সামনে বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল ইরিনা, আর তপ্ত কম্পমান হাতে মেয়েটা তার হাত চেপে ধরল।

হ্যাঁ, প্রসূতিসদনে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়ার আর সময় নেই: প্রসব করছে মেয়েটি। প্রসব করছে বিস্ফোরিত গোলার ঝলকে উদ্ভাসিত অমানিশায়, বরফের ওপর। চারিদিকে চেয়ে দেখল ইরিনা। সর্বকিছুই একটা ভ্রুকুটিত কম্পমায়ার মতো। বরফ এসে পড়ছে কলারের নিচে, বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা লাগছে মুখে, হিম হয়ে এসেছে হাত, বুক এমন টিপটিপ করছে যে তার আওয়াজটাও শোনা যাচ্ছে। মনে হল লেনিনগ্রাদ আর নেই, আছে কেবল শত্রু গোলার গর্জন তলে তুষার-ঝঞ্ঝা আছড়ে পড়া এক আরণ্যক অন্ধকার নির্জনতা। এঁটে বন্ধ করা এই দেউড়িতে করাঘাত করে কোনো ফল নেই, লাভ নেই কাউকে ডাকাডাকি করে—রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, সকালের আগে পর্যন্ত হয়ত একটা লোককেও দেখা যাবে না সেখানে।

আর এইখানে, এই তিমিরে ঝড়ে লুটানো এই খোলা জায়গাটায় জন্ম নিচ্ছে নতুন জীবন। বাঁচাতে হবে তাকে, ছিনিয়ে আনতে হবে শীত, অন্ধকার, কামানের কাছ থেকে। বিস্ফোরণ আর গোলাগুড়িলর শব্দ আর কানে যাচ্ছিল না তার। মেয়েটিকে সে সাহায্য করলে এমনভাবে যেন ব্যাপারটা ঘটছে একটা ঘরে, বরাবর যেমন হয়...

...উঁচু করে শিশুটিকে তুলে ধরলে সে, যেন অন্ধকারে পড়ে থাকা গোটা মহানগরীকে দেখাতে চাইছে। উষ্ণ, রোরদ্যমান পুঁটলিটাকে সে তার ফার কোটের তলে বুকে আঁকড়ে বয়ে নিয়ে চলল। যে বরফ ভেঙে সে চলল তাতে মানুষের পায়ের ছাপ এখনো পড়ে নি।

তার পেছন পেছন স্ট্রচারবাহকের গায়ে ভর দিয়ে প্রকাণ্ড এক আলুথালু পাখির মতো পা টেনে টেনে আসছিল প্রসূতি। কেবলি তুষারস্তুপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল সে, পোড়া-পোড়া ঠোঁটে ফিস্‌ফিস্‌ করছিল:

‘আমি নিজেই যেতে পারব...’

আর স্ট্রচারবাহক নিজেই ক্লান্ত, ক্লেশার্ত, কেবল একটা কথাই বলছিল সে:

‘এই তো, এসে পড়লাম বলে, আর বেশি দূরে নয়...’

ঝড় তাদের মুখের ওপর ছুড়ে ছুড়ে মারছিল মূঠো মূঠো শব্দকনো তুষার। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের পরে কোথায় যেন ঝরে ঝরে পড়ল কাচ। চলল তারা রাত্রি, শৈত্য, গোলাবর্ষণকে পরাজিত ক’রে বিজয়ীর মতো।

মা জেনেছিল যে তার মেয়ে হয়েছে। থেকে থেকে সে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল ইরিনার দিকে, যেন থামাতে চাইছিল তাকে, তারপর আবার হাত নামিয়ে নিচ্ছিল।

প্রসূতিসদনে এসে পৌঁছল তারা। মেয়েটিকে যখন খাটে শোয়ানো হয়েছে, তার চারপাশে ছোটোছোটো করে লোকে, তখন

ইরিনাকে ডাকল সে, তারপর কঠোর, প্রায় রুঢ় স্বরে ফিস্‌ফিসিয়ে
সে বললে:

‘তোমার নাম কী?’

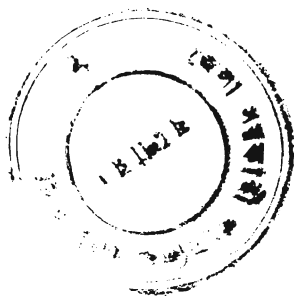
‘নাম নিয়ে কী হবে?’ জিজ্ঞেস করলে ইরিনা।

‘জানতে চাই।’

‘আমার নাম ইরিনা, কিন্তু কেন?’

‘মেয়েটার ওই নাম রাখব। তোমায় মনে করে রাখুক। ওকে
তুমিই বাঁচালে... প্রাণ থেকে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি...’

তিন বার তাকে চুম্ব খেলে মেয়েটি... মৃদু ফিরিয়ে ইরিনা
কেঁদে ফেললে, নিজেও জানত না কেন।



পথে দেখা



নিজের ভাবনায় ডুবে বরফ-ঢাকা ফুটপাথের ওপর দিয়ে দ্রুত হাঁটছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে চাইছিলেন যুদ্ধের দিনের অন্ধকার, সাক্ষ্য, শীতাতর্ বাড়িগল্লোর দিকে। কখনো কখনো হাঁটায় ঢিল না দিয়েই পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ভগ্নস্তুপ। শূণ্য চওড়া দেউড়ির একটা বাড়ির কাছে অনিচ্ছাতেও একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এটা শিশু থিয়েটারের ভবন। কত হৈচৈ, সোরগোল, ফুর্তিবাজ শশব্যস্ততা আর উল্লাস-ধ্বনিই না শুনেন্ছে এর দেয়ালগুলো। কত জ্বলজ্বলে উচ্ছ্বসিত চোখ তাকিয়েথেকেছে মঞ্চে, কী করতালিই না উঠেছে শিশু-দর্শকদের হাতে, আর শিশুদের এই সাড়ায় কী দামই না দিয়েছে বয়স্করা, অপরূপ এই রঙ্গমণ্ডের প্রতিভাবান অভিনেতারা।

এখন সবই শূন্য, বিষন্ন। কেবল অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠে বিজ্ঞাপনের ছিন্নাংশ, বরফ-ঢাকা রঙচঙে কাগজের কিছু টুকরো। চমকে উঠে প্রযোজক গতি বাড়ালেন। এখানকার অভিনেতাদের ছবি ভেসে উঠল তাঁর মনে — এই সেদিনও তারা জমিয়ে হাসিঠাট্টা করেছে, বড়ো বড়ো আয়নার সামনে বসে রঙ মেখেছে মুখে, প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করেছে বড়ো শহরের ছোটো ছোটো মানুষগুলির মতোই সমান তন্ময়তায়।

কোনো কোনো অভিনেতা চলে গেছে, আবার কেউ... একটা কঠোর স্পষ্টতায় তাঁর মনে পড়ল দু'জনের কথা, ফ্রণ্টে তাঁর রিগেডেই ছিল তারা। কী সহজ হয়ে গেছে জীবন! ঘিঞ্জি ডাগ-আউটের মধ্যেই অভিনয় জমাতে পারে তারা, আর রক্ষ মুখে কঠোরদর্শন সৈন্যেরা তাদের শিল্পকলার কদর করেছে। অভিনয় করেছে তারা ট্রাকের ওপর, তুষারাবৃত বিস্তৃত প্রান্তরে, কয়েক মিটার চওড়া ডাগ-আউটে,

সুন্দর হাসিখুশি লোক ছিল তারা, সোজা-সাপটা হৃদয়, সোজা-সাপটা তাদের উপাধিও—সেমেনভ, এমেলিয়ানভ... গেছে তারা যোগাযোগ পরিথার ওপর মাইন ফাটার শব্দ, গোলাবর্ষণের কান-ফাটানো গর্জনের মধ্যে দিয়ে, রণক্ষেত্রের আগদুর্ঘাটিতে ছুটে যেতে কোনো বিপদেই থমকায় নি তারা।

শান্ত এক শীতের সকালে একসঙ্গেই তারা মারা যায়, আর অন্যান্য শিল্পীরা কলারতীদের লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলায় অভিনয় চালিয়ে যায় তাদের ছাড়াই।

প্রযোজক নিজেই দেখেছেন দুটো কালো ঝড় এসে কি ভাবে গ্রাস করেছে তাদের, কি ভাবে লাল হয়ে উঠেছিল সেখানকার বরফ। হ্যাঁ, সবই ভারি সহজ হয়ে উঠেছে এই অন্ধকার শহরটার মতো, একদিন যা ঝলমল করত আলোয়। মহীয়ান এই সন্ধ্যার, অন্ধকার ভবনগুলোর, নির্জন রাস্তার সহজিয়া, সমান সহজ জীবন আর মৃত্যু।

হঠাৎ গতিবেগ বাড়ালেন প্রযোজক, সামনে যে লোকটা যাচ্ছিল সে টলে উঠে বাতাস খামচাতে শব্দ করছিল, ডুবন্ত মানদুয়ের ক্ষীণ আঁকুপাঁকুর মতো। প্রযোজক ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলেন। লোকটা তাঁর কাঁধে মাথা রেখে নেতিয়ে পড়ল, কয়েক মিনিট ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল তারা। লোকটা বৃদ্ধ, বিশীর্ণ মূখ, বড়ো বড়ো অসদৃশ্য চোখ, মস্তো হাঁ করে খাবি খাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত আরো একবার টলে উঠে বৃদ্ধ কিছটা আত্মস্থ হল। সাহায্যকারীর দিকে একবার চেয়ে মৃদু ঘড়ঘড়ে গলায় বললে:

‘নিজ গুণে মাপ করে নেবেন, কাহিল হয়ে পড়েছিলাম...’

‘কত দূরে থাকেন?’ জিজ্ঞেস করলেন প্রযোজক।

‘বৈশি দূরে নয়,’ প্রযোজকের গায়ে ভর দিয়ে বললে বৃদ্ধ, থুথুধুড়ে, রোগা, প্রায় প্রেতাকার বৃদ্ধের পাশে প্রযোজককে দেখাল যেন সত্যিই এক দৈত্য।

‘বেশি দূরে নয়,’ পুনরুত্তর করলে বৃদ্ধ, ‘ওই যে বাড়িটা রাস্তার শেষে, ওইখানে থাকি...’

প্রযোজক বললেন, ‘আমি আপনাকে পেঁাছে দেব, আমার পথেই পড়বে।’

বুড়োকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

হাঁপাতে হাঁপাতে, কী যেন বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছিল বৃদ্ধ। সময়ে তাকে ধরে রেখেছিলেন প্রযোজক, অসুস্থ পিতাকে লোকে যেভাবে নিয়ে যায়। এইভাবেই চুপচাপ বরফ-ঢাকা ফুটপাথে হোঁচট খেতে খেতে তারা পেঁাছিল বাড়ির ফটকে, গদুহার মতো অন্ধকার একটা দেউড়িতে।

‘এইখানে,’ বলে দরজায় ঠেস দিল বুড়ো। প্রযোজক দাঁড়িয়ে ছিলেন তার সামনে। ধীরে ধীরে মাথা তুললে বুড়ো, চেয়ে দেখলে রাস্তাটা, অন্ধকার ঠাণ্ডা আকাশ, তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রযোজকের দিকে।

বললে, ‘ওহে ছোকরা,’ তার পাতলা, প্রায় কালো ঠোঁটের ওপর হাসির একটা ফ্যাকাশে ছায়া ফুটল, ‘জানেন কি, কোন শহরে আছেন?’

চুপ করে রইলেন প্রযোজক। বৃদ্ধ তার শীর্ণ মুখখানা তাঁর মুখের কাছে এনে জোর গলায় বললে:

‘আপনি আছেন ইলিয়ামে।’

‘ইলিয়ামে?’ পুনরুত্তর করলেন প্রযোজক, ‘আমাদের শহরটাকে প্রাচীন ষ্ট্রয়ের সঙ্গে তুলনা করছেন কেন বলুন তো?’

‘মাপ করবেন, আমি বৃদ্ধ, প্রাচীন ইতিহাসের বুড়ো মাস্টার... এমন কোনো নগর আমার জানা নেই, যার কিংবদন্তী ষ্ট্রয়ের মতো অমন মহিমাম্বিত। আর আমাদের আজকের শহর—মনে হয় না কি আপনার? — ইলিয়ামের সঙ্গে শৃঙ্খল তুলনীয় নয়,’ খুবই মৃদু স্বরে বললে সে, ‘বীরত্বে তাকে ছাড়িয়েও গেছে...’

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন না প্রযোজক। গদুহার মতো কালো দেউড়ির নির্বাক স্তব্ধতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দু'জন, চারপাশের বাড়িগুলি উঠেছে যেন দুর্গের প্রাচীর।

‘তা, আপনি ঠিকই বলেছেন,’ বললেন প্রযোজক, ‘তবে আমাদের ট্রয়ে ট্রোজান ঘোড়ার ঘটনা ঘটবে না। কদাচ নয়!’

আবেগভরে কর্মরদন করলেন তাঁরা, পরস্পর শব্দভরাগ্নি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সিংহের থাবা



ইউরা তেমন ছেলে নয়, বড়োরা যাদের হামেশাই বলে: ‘পায়ের কাছে ঘঁরঘঁর করবি না বলছি’। না, ছোটো হলেও—বয়স ওর মাত্র সাত—তার গোটা দিন কাটত পার্কে বা রাস্তায় কিংবা চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানাটা ছিল তার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে। প্রায়ই সেখানে

যেত সে, ভারি ভালো লাগত জন্তু-জানোয়ার।

কিন্তু এ কথা কবুল করতে তার ভয়ংকর লজ্জা হত যে চিড়িয়াখানায় ঢোকার মূখে টিকিট-ঘরের কাছে স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো প্ল্যাস্টার-অব-প্যারিসের প্রকাণ্ড সিংহটাই তার ভালো লাগত সবচেয়ে বেশি।

প্রথম ওটাকে দেখার পর থেকে সে আর উদাসীন থাকতে পারে নি।

‘চিড়িয়াখানা পাহারা দেয় ও, ডাকাতেরা যাতে জন্তু-জানোয়ারের অনিষ্ট না করে, তাই না মা?’ মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সে।

‘হ্যাঁ,’ অন্যমনস্ক জবাব দিয়েছিল মা, আর এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মা ওর কথায় আপত্তি না করায় ভারি খুশি হয়েছিল সে।

প্রবেশমূখে প্ল্যাস্টারের প্রকাণ্ড সিংহটা সগর্বে উঁচু হয়ে থাকত, আর প্রত্যেক বার ইউরা তাকে বন্ধুর মতো সম্মান করে শ্রদ্ধা-সম্ভাষণ জানাত।

...সাইরেন বাজছিল শহরে, মায়েরা উৎকণ্ঠিত হয়ে, ছেলেপিলেদের জুড়টিয়ে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল শেলটারে। ভূগর্ভ কুঠরির বেষ্টিতে বসেছিল ইউরা, হিম হয়ে আসছিল তার ছোট বন্ধুখানা। তার অচেনা ভয়ংকর এক বজ্রনির্ঘোষ পরিষ্কার

ভেসে আসছিল এখানে, এই তলকুঠরিতে। মাঝে মাঝে যেন ভয় পেয়ে কেঁপে উঠছিল জায়গাটা, দেয়ালের বাইরে থেকে কীসব যেন ঝরে পড়ছিল, শোনা যাচ্ছিল কাচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌।

‘ডাকাতের দল! ফের উড়ে এসেছে,’ অস্থির হয়ে বলাবলি করছিল মেয়েরা; বিস্ফোরণের আওয়াজটা বেশি জোরালো হলেই নুশাচিহ্ন করছিল বুড়িরা।

হঠাৎ বাড়িটায় এমন একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল যেন মনে হল গাছ ওপড়াবার মতো ক’রে বাড়িটাকে কে যেন ভিত্তি সমেত তুলে ফেলতে চেয়েছিল, তারপর কী ভেবে তাতে ক্ষান্ত হয়ে কেবল ভয়ানক দুলিয়ে দিলে।

‘এটা কাছেই পড়েছে,’ বললে ইউরার মা, ‘সম্ভবত সামনেই।’

ভুল হয় নি তার। বিপদ-সংকেত কেটে গেলে সবাই দেখতে ছুটল কোথায় বোমাটা পড়েছে। ইউরাও ছুটল মায়ের সঙ্গে। বোমাটা পড়েছিল চিড়িয়াখানায়, একটা মাদী হাতি মারা পড়েছে, জখম হয়েছে বানর, খোলা পেয়ে একটা ভয়-চকিত নেউল ছোট্ট ছোট্ট করছে রাস্তায়।

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে ইউরা বারবার কেবল বলছিল:

‘মা, সিংহটা!’

ইউরার এই কান্নার মধ্যে এত বেশি হাহাকার ছিল যে মা অনিচ্ছাতেও তাকাল ইউরা যেদিকে দেখাচ্ছিল। অপরূপ তার প্রতিমা, প্ল্যাস্টারের প্রকান্ড সিংহটা থাবার ওপর বিরট শাদা মাথাটা নামিয়ে কাত হয়ে আছে। পেছনকার দুটো পা নেই, সামনের একটা থাবা খন্ড-খন্ড হয়ে গেছে, কিন্তু কেশর তার এখনো একইরকম রাজোচিত, দৃষ্টি বরাবরের মতোই কঠোর ও অপলক।

‘ডাকাতেরা ওকে মেরে ফেলেছে, মা,’ চেঁচাচ্ছিল ইউরা, ‘ওদের সঙ্গে লড়েছে...’

স্বস্তের গোড়ায় ভাঙা টুকরো-টাকরার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল সে। খুঁজছে সে, হুহু করে জল গাড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা খুঁজেই পেল সে, ঝট করে পকেটে তা পুরে নিলে।

‘ইউরা, কী করছিস ওখানে?’ হাঁক দিল মা, ‘কীসব নোংরা ঘাঁটিছিস। ভূত সাজবি কেবল। চলে আয় এক্ষুনি আবর্জনা ছেড়ে...’

ইউরা কিন্তু যেতে পারে না। স্তম্ভটার চারপাশে কেবলি সে ঘোরে, কাত হয়ে শূন্যে থাকা সিংহটা দেখে, যেন বরাবরের মতো মনে করে রাখতে চায় এই নির্বাক হতভাগ্য পশুর চেহারাটা, কয়েক দশক ধরে যে চিড়িয়াখানার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জন্তু-জানোয়ারের শাস্তি রক্ষা করেছে। বোমার গর্ত, ভাঙা রেলিং, উল্টে যাওয়া বৃথ, টিকিট-ঘর, যার কয়েকটা থামই কেবল টিকে আছে, এইখানে পাকেই ঝোপের মধ্যে ছোটোছুটি করে বেড়ানো মেরু শেয়াল — কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই তার। দেখছে সে কেবল সিংহটাই।

একবার ইউরার মায়ের কাছে এল ধুলোমাখা এক সৈনিক। টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল সে, ক্লান্ত চোখে ইউরা তাকিয়ে দেখছিল তাকে, প্রতি মুহূর্তেই চোখ তার বুজে আসছিল। সেদিন এত সে ছুটোছুটি করেছিল যে সৈনিকটি কী বলছিল তার কানে বিশেষ ঢুকছিল না। আর সৈনিকটি বলছিল ফ্রন্টের কথা, কেমন যুদ্ধ চলছে, জার্মানদের সঙ্গে কি ভাবে লড়ছে, কে কী বীরত্ব দেখাল, মায়ের ভাই পেয়েছে লাল ঝাণ্ডা অর্ডার। মায়ের খেয়াল হল ইউরা ঘুম্নে ক্লান্তিতে চেয়ার থেকে গাড়িয়ে পড়ছে। তাকে সে শোয়াতে নিয়ে গেল। পোষাক ছেড়ে বিছানায় বসে ইউরা বললে:

‘মিশা মামা লাল ঝাণ্ডা অর্ডার পেয়েছে, সত্যি?’

‘সত্যি, লড়েছে সে সিংহের মতো। বড়ো হলে তুই-ও অর্মানি নির্ভয়ে লড়বি। মিশা মামা এসে তোকে শেখাবে।’

ইউরা বললে, ‘ওই সিংহটার মতো লড়েছে?’

‘ওই সিংহ আবার কোনটা?’ বললে মা, ‘লাল ফোঁজীরা যখন লড়ে, তখন লোকে বলে সিংহের মতো লড়ছে...’

‘তার মানে, ওই সিংহটার মতোই লড়েছে,’ মার কথায় কান না দিয়ে বললে ইউরা, ‘তার মানে ভালোই লড়েছে... আমিও অর্মানি লড়ব...’

‘নে হয়েছে, ঘুমো,’ বললে মা, ‘নয়তো ফের সাইরেন বাজবে, তার আগেই ঘুমিয়ে নে।’

সাইরেন এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইউরাকে সব সময় তল-কুঠরিতে টেনে আনা সম্ভব হয় না। কখনো সে উধাও হয়ে যায় রাস্তায়, নয়তো চিলে-কোঠা দিয়ে উঠে পড়ে চালে, নয়তো হাজিরা দেয় ফাস্ট-এইড কেন্দ্রে। বিমান-বিধবংসী কামান, বাড়ির দুলদুলি, বোমা বিস্ফোরণের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

‘কোথায় যাস বল তো তুই?’ জিজ্ঞেস করে মা, ‘খুঁজে খুঁজে কোথাও পাই না। খবরদার, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাবি না কক্ষনো। বাবা বাড়ি নেই, হাতে একেবারে স্বর্গ পেয়েছে। আসুক না জাহাজ থেকে ফিরে, দেখাবে তোকে। একেবারে অবাধ্য হয়ে পড়েছে।’

‘বাড়ির পেছনে যে আমি ব্যারিকেড বানাচ্ছি...’ গুরুত্ব দিয়েই বললে ইউরা।

‘ব্যারিকেড?’

‘রাস্তায় ব্যারিকেড তুলছে মা, আমি নিজে দেখেছি। আমরাও তুলব। ছেলোপিলেদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে...’

তিন দিন পর, প্রচণ্ড একটা হামলার পরে ওকে আনা হল বিস্ফোরণের ঝাপটায় অজ্ঞান অবস্থায়। ফ্যাকাশে হয়ে আলুথালু চুলে কাঁপা কাঁপা হাতে মা তার পোষাক খুললে। চুপচাপ শব্দে রইল সে, ততক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে। হাওয়ার সামান্য ঝাপটা খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সে।

আস্তে করে দোষী-দোষী ভঙ্গিতে সে বললে, ‘বাড়ির পেছনে ব্যারিকেড বানিয়েছি মা। বেঁচে আছি, মা, ভয় নেই।’

মা তার পকেটে রুমাল খুঁজতে গিয়ে যত রাজ্যের জিনিস বার করলে।

‘পকেটে এসব কী জঞ্জাল জড়ো করেছিস?’ ইতিমধ্যেই ধূসর হয়ে ওঠা প্রকাণ্ড এক টুকরো প্ল্যাস্টার বার করে জিজ্ঞেস করলে মা।

‘হাত দিয়ো না মা, ফেলো না,’ চেঁচিয়ে উঠল ইউরা, ‘এটা সিংহের থাবা। রেখে দাও। আমার দরকার আছে। ওটা আমার স্মৃতিচিহ্ন।’

অবাক হয়ে মা দেখলে প্ল্যাস্টারের টুকরোটা। সত্যিই তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মস্তো একটা বাঁকা নখর।

‘এটা দিয়ে কী হবে তোর?’ জিজ্ঞেস করলে মা, ‘ওই আবর্জনা থেকে খুঁজে এনেছিস বুদ্ধি?’

‘ওটা মনে রাখার জন্যে,’ ছোট্ট কপাল কঁচকে বললে ইউরা।

‘মনে রেখে তোর কী লাভ, ইউরি, সোনা আমার,’ স্নেহে বললে মা।

‘প্রতিশোধ নেব... ওই ডাকাতগুলোর ওপর। পড়ুক-না একবার আমার সামনে। দেখাব...’

সংসার



‘শোনো গো, দাশা, কথা আছে,’ বললে সেমিওন ইভানোভিচ।

স্বামীর দিকে দাশা এমনভাবে চাইলে যেন প্রথম দেখছে এই বৃষস্কন্ধ, গুরুগম্ভীর লোকটাকে, ধীর-স্থির যার ভাবভঙ্গি, কঠোর চোখ, বহুদিন যার মুখে হাসি নেই, দাশার সঙ্গে একটা রসিকতাও করে না। অ্যাপ্রনের খুঁটে হাত মদুছে চেয়ারে বসল দাশা, দূরে কোণের দিকে যেন চেয়ে বললে:

‘জানি গো সেমিওন, কী বলবে?’

‘জানো? জানলে কোথেকে?’

‘বুকের মধ্যে টের পাই গো। নাও বলো...’

‘দরজাটা ভেঁজিয়ে দাও, ওলিয়া যেন না শোনে...’

‘ওলিয়া গেছে জল আনতে। আর নিজেই আমি বলছি, ঠিক না হলে ব’লো... দেখেছি তো, কিস্তিয়া মরার পর কেমন দন্ধে আছ। তা কিস্তিয়া মরেছে লেনিনগ্রাদ রক্ষা করতে গিয়ে, সুন্দর মরণ, নিষ্পাপ মরণ, কিন্তু এই ফ্যাসিস্ট গভর্নাবদের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে, সেমিওন ইভানোভিচ, প্রতিদিন, প্রতি দণ্ডে শোধ তুলতে হবে। হারামজাদারা যা করছে, বলার নয়, জিব নড়ে না, এমন বীভৎস। কিস্তিয়ার জন্যে, আমার ভাইয়ের জন্যে ঘেন্না করি ওদের। ওদের ওপর শোধ নিতে চাও, ফ্রণ্টে যাবে ঠিক করেছ, তাই না? ঠিক বলেছি কিনা?’

হাঁটুর ওপর চড় মেরে উঠে দাঁড়াল সেমিওন ইভানোভিচ, বোঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললে:

‘ও গো আমার বুদ্ধিমতী! ঠিকই বলেছ গো, তাই বটে। মত যাতে আবার না পালটায় তাই ফর্মুও পূরণ করে এসেছি। এই

হল ব্যাপার ওলিয়ার মা, আরো একজন সৈন্য বাড়ল। কাজ করতে আর পারছি না, মনটা টগবগ্ করছে। পুরনো সেপাই আমি, গোটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লড়েছি, বন্দুক চালাতে এখনো ভুলি নি। তবে সময় বড়ো কম, ওলিয়ার মা। কী কী লাগবে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দাও...’

‘সবই ঠিক করে দেব গো,’ আস্তে করে বললে দাশা।

জানলায় গিয়ে তাকিয়ে দেখল সে: ওলিয়া আসছে কি? রাস্তায় লোক অনেক, যেন পরবের দিন। সবাই হেঁটে যাচ্ছে, কেননা ট্রামগাড়ি চলছে না। বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ টানছে লোকে, তাতে চ্যালা-কঠ, কীসব বস্তু; কোনো কোনোটায় শাল, মাফলার জড়িয়ে বসে আছে বড়ো কি বড়ি।

জলও আনা হয় স্লেজে চাপিয়ে। আনা হয় তা গামলা, ক্যানেষ্ট্রা, বালতি, লোহার বাক্সে করে। রাস্তায় পা হড়কায় লোকে, ছলকে পড়ে জল, সঙ্গে সঙ্গেই তা জমে বরফ হয়ে যায়। শীত পড়েছিল প্রচণ্ড। উপসাগর থেকে ঝাপটা দিত হাওয়া, লোকের মুখে চোখে মারত মূঠো মূঠো করকরে তুষারকণা। লোকে হাঁটত হাঁ-মুখ পর্যন্ত কালো কাপড় জড়িয়ে, যেন আধা-মুখোশে মুকাভিনেতা। অবিরাম চলমান রকমারি জটলাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল দাশা। আধা-মুখোশগুলোর নিচে বরফের ঝালর গড়ে উঠছে নিঃশ্বাস জমে। মুখ থেকে বেরচ্ছে শাদা শাদা ভাপের কুন্ডলী। এই জনস্রোতের মধ্যে জলভরা বালতি হাতে ওলিয়াকে ঠাহর করা গেল না। শিগগিরই ওলিয়ার ফিরে আসার কথা।

জানলা থেকে ফিরে দাশা বললে, ‘আমারও একটা কথা আছে গো। আমিও মত স্থির করেছি। তুমি যখন ফ্রন্টে যাচ্ছ, তখন আমি তোমার বদলি হয়ে কাজটা চালাব। আমায় বলতে দাও গো সেমিওন, থামিও না, শোনো যা বলছি। শহর আমাদের ঘেরাও হয়ে পড়েছে। কত যে লোকের কণ্ট কী বলব। শহর হয়ে উঠেছে ফ্রন্ট, খবরের

কাগজে তাই লিখছে। তা কথাটা সত্যি। তাই যদি হয়, তাহলে তুমি যাও ভাইয়ের জন্যে হিটলারীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে, আমি তোমার জায়গায় খাটব। এখনো আমার তাকৎ আছে গতরে, চালিয়ে নেব। চিন্তা করো না। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, খাটতে ভালোবাসি। তোমায় ডোবাব না। বোয়ের জন্যে লজ্জা পেতে হবে না... কাজ-কর্ম বৃদ্ধি গো। কারখানা ছেড়েছিলাম তো কেবল ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে...’

‘কিন্তু এখন?’ জিজ্ঞেস করলে সেমিওন ইভানোভিচ।

‘এখন মানে?’

‘বলছি, পেতিয়া তো এখনো ছোটো। ওলিয়ারও মাত্র বারো বছর। রোগা-পটকা। তুমি আমি যদি দুজনেই চলে যাই, তাহলে ছেলেমেয়েগুলোর কী হবে গো? ঘর ভেঙে পড়বে গো ওলিয়ার মা, সেটা ভেবেছ?’

‘ভেবেছি সেমিওন, ভালো করেই ভেবেছি। ঠিক করেছি, ছেলেমেয়েদের পাঠাব পরোখাভিয়েতে। পদ্রনো সই আছে সেখানে, তারও পেটের কটি আমারগুলোরই বয়সী, বলব ওদের ঠাই দিতে। বাস, হাত খোলসা। সে দিনকাল তো আর নেই যে সংসারের ভাবনা ভাবব। হয়ত ফের দেখা হবে, হয়ত না। ঘরবাড়ি আমাদের ধ্বংস করছে দৃশমনে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি চলে? তোমার হয়ে তো কেউ লড়ে দেবে না, নিজেকেই লড়তে হবে... ঠিক বলছি কিনা?’

‘ঠিকই বলেছ গো ওলিয়ার মা,’ বললে সেমিওন ইভানোভিচ, ‘ভালোই বলেছ।’

ভেতরে এল ওলিয়া। বালতিটা রান্নাঘরে রেখেই সে ঘরে এসে ছোটো চুল্লিটার কাছে গিয়ে তার জমে যাওয়া নীল হয়ে ওঠা ছোটো ছোটো হাত দুখানা গরম করতে লাগল। মা-বাপকে আজ তার কেমন অদ্ভুত ঠেকল। বললে:

‘মা, তোমরা অমন কেন বলো তো? কী হয়েছে? আরো কেউ মারা গেছে নাকি? না, সত্যি, কী যেন লুকোচ্ছ তোমরা?..’

‘না বাছা, তোর কাছে লুকোবার কিছু নেই,’ বললে দাশা, ‘পোষাক ছেড়ে মন দিয়ে শোন কী ঠিক করেছি আমরা।’ তারপর হঠাৎ দম নিয়ে হড়বড় করে সে বললে, ‘বাপ যাচ্ছে ফ্রণ্টে, আমি কারখানায়, তোদের পাঠাব পরোখিভিয়েতে লিওল্যা মাসির কাছে... এই হল ব্যাপার...’

চুল্লিতে দড়টো কাঠ গুঁজে ওলিয়া তার অনিচ্ছায় জ্বলন্ত নিচু আগুনটা দেখিছিল। মাথা না তুলেই সে জিজ্ঞেস করলে:

‘কিন্তু আমি পেত্কা পরোখিভিয়েতে যাব কেন?’

‘নইলে এখানে সংসার চালাবে কে বাছা? রুটির জন্যে লাইন দাও রে, কাঠ আনো রে, জল বও, পেতিয়াকে খাওয়াও, কে করবে? এই ফিরবে পাড়ার ছেলেগুলোর কাছ থেকে, দেখাশোনা করতে হবে তো... আমি না থাকলে কে চালাবে?..’

‘না মা, পেত্কার সঙ্গে পরোখিভিয়েতে যাব না, ভালো লাগে না আমার লিওল্যা মাসিকে। সারা দিন কেবল বকবক করে... এখানে কে চালাবে? আমি চালাব।’

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে, শীর্ণ কাঁধ থেকে ওভারকোটটা খসিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরুর করল:

‘এখন আমি খারাপ চালাচ্ছি? জল আনছি, কী এমন কাজ! কাঠ কোথেকে আনতে হয় জানি, সতের নম্বরের ভাল্কা আমার সাহায্য করবে, চুল্লি ধরাব কীই বা আমাদের ষোড়শ ব্যঞ্জন লাগবে খেতে! রুটি — তাও ভাল্কার সঙ্গে পালা করে লাইন দেব। পেত্কা কে তো এখনই আমি রোজ খাওয়াই। ভেব না আমি ছোটো, ছোটো এখন আর কেউ নেই। সবাই আমরা বড়ো। দরকার

যখন, চলে যাও দৃজনেই। তুমি তো বাড়িতে মাঝে মাঝে আসবে? আসবে না?... যাক গে। কষ্ট হবে আমার—বয়ে গেল, সবারই এখন কষ্ট। পরোখাভিয়ে-টরোখাভিয়ে কোথাও আমি যাচ্ছি না। শুনলে মা। এই ঠিক রইল মাগো, কোনো ভাবনা নেই। এসো তোমায় চুমু খাই... বাস, ভারি আমার কাজ...’

হাত



এমন ঠাণ্ডা যে গরম দস্তানার মধ্যেও হাত জমে যায়। চারিপাশ থেকে বন আক্রমণ করেছে খাল-খন্দ ভরা সঙ্কীর্ণ রাস্তাটার ওপর। দ্বু'ধারে তার গভীর নালা, তাতে চোরাবালির মতো তুষারকণার স্তূপ। গাছগুলো তাদের ডাল দিয়ে চেপে ধরছে গাড়িটাকে, কেবিনের ছাতে পড়ছে তুষারের ঢেলা, কাঠিগুলোয় আঁচড়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্কের গা।

তার ড্রাইভারির জীবনে রাস্তা সে দেখেছে অনেক, কিন্তু এমনটা কখনো দেখে নি। আর এখানেই তার কাজ, যেন বলদ সে। এই সবে এসে পেঁপঁছলে ডাগ-আউটে, অপারিসর, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ক্লান্ত কমরেডদের মাঝখানে মাথাটি একটু রাখতে না রাখতেই ফের হাঁক, চলো রাস্তায়। ঘুম হবে পরে। কাজ আছে। ডাক দিচ্ছে রাস্তা। এখানে বলা যাবে না, কাজ তো আর ভালুক নয় যে বনে পালাবে। ঠিক তাই পালাবে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি গাড়ি একেবারে গাড্ডায়। তখন ডাকো কমরেডদের ঠেলে তুলতে। একার সাধ্য হবে না, সে চিন্তাও করো না। আর ঠাণ্ডা কী? যেন এই বন পথটায় খোদ উত্তর মেরু এসেছে ট্র্যাফিক পল্লিস হয়ে।

এই কুয়াশা নামছে, এই আবার লাদোগা হুদ থেকে বইছে হাওয়া; এমন হাওয়া সে কোথাও দেখে নি — অন্তর্ভেদী, ফুঁসন্ত, দীর্ঘ। কখনো শূন্য হছে তুষার-ঝড়, দ্বু'পা আগের কোনো জিনিসই দেখা যাবে না। টায়ারও তো লোহার নয়, দেবে যায়। আর এই যখন শেষ ট্রিপ, তখন যে কমরেড গাড্ডায় নেমেছিল, তাকেও তুলে নিতে হয় বৈকি; সবচেয়ে বড়ো কথা, মাল পেঁপঁছতে হবে সময় মতো। কিন্তু কেমন আছে ওটি, ওই মালটি?..

গাড়ি থামিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল বলশাকভ, ভারি পায়ে তুষার মাড়িয়ে গেল ট্যাঙ্কের কাছে। ওপরে উঠল সে, শীতের দৃপ্তের মলান আলোয় তার চোখে পড়ল, শীতের প্রকোপে সার্টিনের মতো মসৃণ হয়ে ওঠা ট্যাঙ্কের গা বেয়ে অবিরাম ধারা বইছে। পিঠ বেয়ে তার একটা হিম কাঁপুনি বয়ে গেল। ট্যাঙ্ক চোয়াচ্ছে। জোড়ের জায়গায় ফেটে গেছে ট্যাঙ্ক। জোড় খুলে এসেছে। পেট্রল বেরিয়ে আসছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল ছোট ধারাটাকে, কিছুতেই যা আটকাবার নয়। রাস্তায় এত ঝামেলা, তার ওপর গিয়ে পৌঁছতে হবে ফাঁকা ট্যাঙ্ক নিয়ে? তার জীবনে যত দৃষ্টিনা ঘটেছে, সব মনে করল সে, কিন্তু এমন দুরবস্থা তার মনে পড়ল না। ঠান্ডায় জ্বলে যাচ্ছে মুখ। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে কোনো সুরাহা হবে না।

বরফস্তরের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল সে, ফিরে চলল কেবিনে। রাজনৈতিক পরিচালক তার মেসচর্মের ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে নিঃশ্বাসে গরম লোমের মধ্যে ঠান্ডা নাক গুঁজে বসে ছিল।

‘কমরেড রাজনৈতিক পরিচালক,’ ডাক দিলে বলশাকভ, ‘একটু ঝামেলা আছে।’

‘কী ব্যাপার, এসে গেছি নাকি?’ সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলে রাজনৈতিক পরিচালক।

‘এসে গেছিই বটে,’ বললে বলশাকভ, ‘ট্যাঙ্ক চোয়াচ্ছে। কী করা যায় এখন?’

কেবিন থেকে গাড়িয়ে এল রাজনৈতিক পরিচালক। চোখ রগড়ে হোঁচট খেলে সে, কিন্তু কী ব্যাপার দেখে চিন্তিতের মতো হাতে চাপড় মারতে মারতে বললে:

‘পরের কেন্দ্রে গিয়ে তেলটা ঢেলে রেখে মেরামত করা যাবে। কী বলো?’

‘সেটা ঠিক উচিত হবে না,’ বললে বলশাকভ, ‘সে কী করে হয়, তেল যে আমরা আর কোথাও নয়, নিয়ে যাচ্ছি লেনিনগ্রাদে, জরুরী ফ্রন্টে। টেলে রাখা যাবে কী ভাবে? তা চলবে না।’

‘কিন্তু করবে কী?’ ভাঙা জোড় বরাবর পেট্রলের ধারার দিকে চেয়ে বললে রাজনৈতিক পরিচালক।

‘হুকুম দিন, চেষ্টা করে দেখি জোড়টা বোজানো যায় কিনা,’ বললে বলশাকভ।

নিজের যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুললে সে, মনে হল তা কেবল নির্যাতনের যন্ত্র। লোহাগুলোয় যেন হাতে ছাঁকা লাগে। তাহলেও ছেনি, হাতুড়ি, আর পাথরের মতো এক টুকরো সাবান নিয়ে সে গাড়ির ওপর উঠল। পেট্রল গড়াতে লাগল তার হাতে, কেমন যেন তা অদ্ভুত। হিমেল আগুনে তা যেন পোড়াচ্ছে, দস্তানা ভিজে উঠল তাতে, ওভার-অলের আঁস্তিন চুইয়ে উঠল। থুতু ফেলে নির্বাক মরিয়াপনায় বলশাকভ জোড়টায় হাতুড়ি পিটলে, ডলে দিলে সাবানটা। পেট্রলের চোয়ানো বন্ধ হল।

বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে সে গেল তার নিজের জায়গায়।

পাড়ি দিল তারা কিলোমিটার দশেক। গাড়ি থামিয়ে ট্যাঙ্কটা দেখতে গেল বলশাকভ। জোড়টা ফের খুলে গেছে। পেট্রল ঝরছে ট্যাঙ্কের গোলালো পিঠ বেয়ে। ফের কেঁচে গন্ডুষ করতে হবে। ফের ঝন্ঝনিয়ে উঠল ছেনি, ফের পেট্রলে জ্বলে গেল হাত, ফের সাবানের প্রলেপ পড়ল ভাঙা জোড়ের ওপর। চোয়ানি বন্ধ হল। রাস্তার কিন্তু তখনো শেষ নেই।

কতবার যে সে নেমে এসে ট্যাঙ্কে উঠেছে, তা আর মনে নেই তার, পেট্রলে হাত পোড়ানির যন্ত্রণা সে আর টের পায় নি, তার মনে হয়েছিল এসবই কোনো স্বপ্ন, — এই নিঝুম বন, সীমাহীন তুষারস্তুপ, হাত ভেজানো পেট্রল।

মনে মনে সে হিশেব করছিল কতটা মূল্যবান জ্বালানি নষ্ট হয়েছে, হিশেবে দেখা গেল তত বেশি নয় — চল্লিশ পঞ্চাশ লিটার; কিন্তু প্রতি দশ-বিশ কিলোমিটার পর পর মেরামত না চালালে সবই বৃথা যাবে। স্থান-কালের চেতনা হারানো এক লোকের একরোখামিতে সে ফের গোড়া থেকে সব শুরুর করতে লাগল।

হয়রানিতে তার মনে হতে লাগল যে সে যাচ্ছে না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, প্রতি চল্লিশ মিনিট অন্তর টেনে নিচ্ছে ছেনি, আর ফাটলটা ক্রমেই বড়ো হয়ে ঠাট্টা করছে তাকে, তার তোড়জোড়কে।

মোড়ের পর হঠাৎ শুরুর হল অদ্ভুত একটা ফাঁকা এলাকা, বিশাল, অব্যবহৃত, ধবল। রাস্তাটা গেছে বরফের ওপর দিয়ে। সুপ্রসর একটা দীর্ঘ জানোয়ারের মতো ফোঁসফোঁস করল তার ওপর, কিন্তু কোনো ভয় হল না তার। এই আনন্দে সে নির্ভাবনায় গাড়ি চালান যে বন শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে স্টিয়ারিংয়ের ওপর মাথা ঠুকে যাচ্ছিল তার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে উঠছিল। ঘুম যেন উঠে বসেছিল তার ঘাড়, তার পেছনে দাঁড়িয়ে কোন এক দৈত্য তুলতুলে মোটা দস্তানা পরা হাতে তার মাথা আর কাঁধ চেপে ধরছিল। লাফাতে লাফাতে গাড়িটা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আর তার জমে যাওয়া ক্লান্ত দেহের কোন এক অভ্যন্তরে ছিল দুর্বোধ্য এই এক হর্ষ — সে যে পারবে তাতে তার সন্দেহ নেই। এবং পারল সে। মাল পেঁপেছিল।

...ডাগ-আউটে ডাক্তার তার ছাল-ওঠা, বিকৃত, পোড়া-পোড়া হাত দেখে অবাক হয়ে বললে:

‘কী হয়েছে?’

‘জোড় মেরামত করেছিলাম কমরেড ডাক্তার,’ যন্ত্রণায় ঠোঁট চেপে বললে সে।

‘রাস্তায় থামলে হত না?’ বললে ডাক্তার, ‘বাচ্চা তো নন, বোঝা উচিত, এই ঠান্ডায় পেট্রলে হাত ভেজানো...’

ও বললে, ‘থামা যে চলত না।’

‘কেন? অত তাড়া কিসের? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন পেট্রল?’

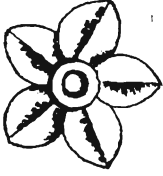
‘লেনিনগ্রাদে, ফ্রণ্টে,’ গোটা ডাগ-আউট গমগমিয়ে সে বললে সজোরে।

একদৃষ্টে ডাক্তার তাকিয়ে রইল তার দিকে। টেনে টেনে বললে:

‘ব-টে, লেনিনগ্রাদে! ব্লুঝেছি! আর বলতে হবে না। দিন, ব্যাণ্ডেজ করে দিই। চিকিৎসা করতে হবে।’

‘করুন-না চিকিৎসা। সকাল পর্যন্ত চিকিৎসা চালান। সকালে আবার রাস্তা... ব্যাণ্ডেজে বরং গাড়ি চালাতে তেমন ঠান্ডা লাগবে না। আর যন্ত্রণা, সেটা আমরা দাঁত চেপে সয়ে যাব...’

আপেল গাছ



শেলটারে বাতি নিবে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই
চেয়ার-বোঁগি ঠেলাঠেলির শব্দে আর কোলাহলে
তা ভরে উঠল। তারপর কে যেন চিৎকার করলে:
‘চুপ করুন কমরেডরা, শান্ত হয়ে বসে
থাকুন!’

অন্ধকারেই বসতে শুরু করল লোকেরা। হামলা চলছে কয়েক
ঘণ্টা ধরে। শিল্পী বসেছিল তার ক্যাম্প চেয়ারে, এইটা নিয়েই
সে বেরিয়েছিল গ্রীষ্মে স্কetch করতে। এখন তার এই নিজের
বানানো হালকা তেপায়াটা খুবই কাজে লাগছে। থাকত সে একতলার
ছোটো একটা বাড়িতে, পেঁয়াদ পাড়ার চওড়া চওড়া রাস্তায় তেমন
বাড়ি এখনো টিকে আছে। বাড়ির সামনে ছিল বাগান, তাতে
একটা পুরনো পোড়ো ফোয়ারা, নলগুলো তার মর্চে ধরা, পাথরে
শ্যাওলা জমেছে, এখন তা ঢাকা পড়েছে গভীর তুষারে। বাড়িটা,
বাগানটা, ফোয়ারাটা নিয়ে শিল্পীর এখন ভাবনা সবচেয়ে কম।

তার চেতনা জুড়ে ছিল আশেপাশের লোকদের আলাপ, আতঙ্ক
ও বিস্ময়ের অস্ফুটোক্তি, শিশুদের কান্না। কালো অন্ধকারে সে যেন
তখন আপাদমস্তক আলখাল্লায় ঢাকা।

‘আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল,’ বিরক্ত স্বরে বললে কে
যেন।

শিল্পী ভাবল, সত্যি, কী বোকামি হয়েছে যে চলে যায় নি।
সত্যি, চলে গেলে কোনো কাপড়রুখতাই হত না তার। এখন সে
আঁকছে পোস্টার, নাম আছে তার, রাস্তায় ক্লাবে ফ্রণ্টের ডাগ-আউটে
তা টাঙানো থাকে — সেটা সত্যি। কিন্তু লেনিনগ্রাদে বসেই তা
আঁকতে হবে এমন কি কথা ছিল। তাছাড়া আঁকার মতো অবস্থা
এখানে হয়ে উঠেছে অসহ্য দুষ্কর। ঠান্ডা স্টুডিও, জমে যাওয়া

আঙুলে পেনসিল ধরাই কঠিন, চুল্লিটা অচল, গরম হয়ে নেবার উপায় নেই। তার ছোটো বাড়িটায় বোমাবর্ষণের আশ্রয়স্থল স্বভাবতই কিছু নেই, ছুটতে হয় পাড়ার বড়ো বাড়িটায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। ঠাণ্ডা লেগেছে তার, হয়রান হয়ে গেছে, কাশে, ভরপেট খাবার জোটে না বহুদিন। ঠাণ্ডায় কী একটা চটা পড়েছে হাতের ওপর। বাত কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা হবে। বাড়ি থেকে শিল্পীসংঘ পর্যন্ত অতটা দূর হাঁটতে কষ্ট হয় তার, ট্রাম নেই। এখন বাতিও নিবে গেল। সে শুনছে যে ভলগা অঞ্চলে গেলেই মিলবে আলো জ্বলা শহর, গরম কুঠরি, অপরিপূর্ণ আহার, তার কমরেডরাও আছে সেখানে, সময় মতো চলে গিয়েছিল... সত্যি এই অন্ধকারে, ঠাণ্ডায়, অনশনে, মাথায় কখন বোমা পড়বে তার অপেক্ষায় বসে থাকা কী বোকামি...

থেকে থেকে আগাগোড়া কেঁপে উঠছিল বাড়িটা, তখন চুপ করে যাচ্ছিল সবাই, তারপরেই শব্দ হচ্ছিল উৎকট হৈচৈ। ধীরে ধীরে আবার শান্ত হয়ে আসছিল সবাই। মনে হল অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। সময়ের ধারণা লোপ পেয়েছিল শিল্পীর। তল-কুঠরিতে সে এসেছিল সন্ধ্যায়। এখন নিশ্চয় ঢের রাত। হামলাটা চলছে বিদ্যুৎচৌকির লম্বা সময় নিয়ে। কেবলি ফিরে ফিরে আসছে বিস্ফোরণের শব্দ... ‘বোমা ফেলছে’ — বিধ্বংস হয়ে ভাবলে সে। এত যেটা ভালো লাগত সেই শহরটাও বদলে গেছে। তার জন্যে যন্ত্রণা করে উঠল তার, কান্না পেল। সবই কী বিষণ্ণ, নিরানন্দ। বিপদ-সঙ্কেত কেটে গেলে রাস্তায় বোরিয়ে সে বুক দেখবে আরো কত ভাঙা বাড়ি, অগ্নিকান্ড, ধ্বংসস্তূপ... কড়ি-বর্গায় আটকিয়ে শূন্যে ঝুলছে খাট, আলমারি, বাসা-পাতা মানুষের করুণ উপকরণ।

কোণের দিকে মিহি গলায় কেঁদে উঠল একটা শিশু, ভালো দেখা যায় না। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছেলেটার মৃদুখানা কল্পনা করলে শিল্পী, জল-ভরা বিস্ফারিত চোখ। হয়ত ঘুমোচ্ছিল,

জেগে গিয়ে অন্ধকারে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে। ঠিক এমনি একটা শেলটারের ছবি আঁকলে হয়, শুধু মোমবারতির আলো থাকা চাই। দপদপে শিখা, লোকেদের মূখের ওপর কম্পমান আলো, দেয়ালে কালো ছায়া, উৎকর্ষিত সব মূর্তি, পদ্রনো ওভারকোট জড়ানো বৃদ্ধা, এক কোণে ফিস্‌ফিস্‌ করে আলাপ করছে তরুণতরুণী, যুবতী মায়ের বুক আঁকড়ে শিশু।

আলো বলকাল সিঁড়িতে, খোলা দরজা দিয়ে আঁঙনা থেকে ভেসে এল বিপদ-মুক্তির আওয়াজ। শেষ পর্যন্ত থামল তাহলে।

বেরবার জন্যে তাড়াহুড়ো করলে না শিল্পী, সংকীর্ণ করিডরটায় লোকের ভিড় লম্বা হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সে, তারপর ঠান্ডা দেয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে এল প্রায় সবার শেষে।

ভয় হচ্ছিল তার, এক্ষুনি, এই কাছেই বৃদ্ধা ভগ্নস্তূপ চোখে পড়বে। ভাবছিল এমনি হোঁচট খেতে খেতেই সে পেঁাঁছে তার ছোট্ট বাড়িখানায়, এখান থেকে যা মাত্র দু'পা দূরে।

রাস্তায় বেরিয়ে বিহ্বল হতভম্ব হয়ে সে থেমে গেল।

চোখ-ধাঁধানো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সব ছেয়ে গেছে। শ্যাম-নীল আকাশে অগ্নি-নিরোধ দেওয়ালগুলোর ওপরে তুহিন কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে প্রায় বেগুনী রঙের প্রকাণ্ড এক চাঁদ, ধবল মেঘপালের মতো আকৃষ্ণিত শাদা শাদা মেঘ সেখানে। শীতে আলোতে যেন ঝন্‌ঝন্‌ করছে আকাশ। পোড়ো মাঠে বড়ো বড়ো বাড়ির ফাঁকা দেয়ালগুলো যেন রোঞ্জে ঢলাই করা। মধুর মর্মরধ্বনি উঠছে তুমার থেকে। রাস্তা বরাবর বিপুল তুমারস্তূপের ওপর মখমলী-নীল ছায়া। রাস্তাটা খুবই সাধারণ, অথচ জ্বলজ্বল করছে কী এক অজানা লাভণ্যে।

নিজের বাড়ির দিকে এগুলা সে, জায়গাটা সে চিনতেই পারছিল না। বাগানে এল, স্বপ্নের মতো তা রূপময়। গাছগুলোয় জমেছে

তিন আঙুল পদরু বরফ। প্রতিটি শাখাই যেন নিপদুগ শিল্পীর হাতে গড়া, ফুলকি ঠিকরোচ্ছে, ছটা দিচ্ছে, দ্বর্বোধ্য কী এক আলো কাঁপছে চুড়োয়, তুষারের ফার-টুপি সেখানে, মনে হল যেন এক জমকালো নাচের সাজ পরেছে তারা, ঝলমলিয়ে হাত ধরাধরি করে তারা এক্ষুনি নাচতে শুরুর করবে শিল্পীকে ঘিরে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবে হীরে।

অপূর্ব এই বাগানটার মাঝখানে রূপে মোহময় একটা গাছ। অন্য গাছগুলোর যা কিছু শোভা-জ্যোতি, ঝলক, ফুলকি, হীরে — সবই এখানে বহুগুণ, আর সবই এমন একটা পূর্ণতা পেয়েছে, মানুষের হাতে যা অসম্ভব। আশ্চর্য একটা হিমেল আগুনে গাছটা জ্বলছে, ধবল এক অগ্নিকুণ্ডের মতো দপদপ করছে তার তুষার-শিখা, মনোহরতের জন্যেও তার মাতামাতি থামছে না।

নির্বাক এক তন্ময়তায় দাঁড়িয়ে রইল শিল্পী, কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। জায়গাটা চিনতে পারছিল না সে, ভেবে পেল না কি ক'রে সে বাগানটায় এসে পড়ল, কোথায় সে আছে।

আশেপাশে চেয়ে দেখল সে। লোক চলছে রাস্তা দিয়ে। কানে এল তরুণদের হাসি, তুষারকণার উচ্ছল মর্মর। টুপি খুলে এক মনোহর সে দাঁড়িয়ে রইল চোখ বুজে। সম্ভবত ফিরল তার। চোখ মেলে সে যেন পৃথিবীতে ফিরে এল। দাঁড়িয়ে আছে সে তার নিজেরই বাগানে, চলে এসেছে সোজা তুষার-ঢাকা ফোয়ারাটার কাছেই। কিন্তু বাগানের বেড়াটা সে পেরল কি করে? বেড়া নেই। বিস্ফোরণে, বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় বেড়াটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বহুদূরে, একেবারে নিঃশেষে সাফ করে দিয়েছে ওই জীর্ণ পুরনো তত্তাগুলো। চোখ-ধাঁধানো রূপের ওই গাছটা তারই পরিচিত পুরনো আপেল গাছ, নিরহঙ্কারে বরাবরই যা দাঁড়িয়ে থাকত ফোয়ারাটার কাছে।

তাকিয়ে দেখল সে, ঐন্দ্রজালিক বেগুনী জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছে শহরটা, চারিপাশে তার অপরিমেয় অনন্য শোভার এক অপরূপ শহর।

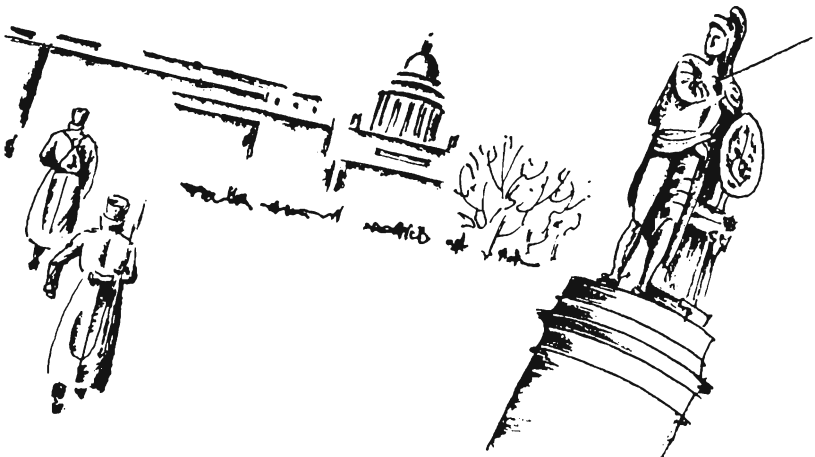
শহরটা সে এমনভাবে দেখতে লাগল যেন তার পুনর্জন্ম হয়েছে। তল-কুঠরিতে যেসব বিষম চিন্তায় সে জর্জরিত হয়েছিল, তার চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। সে কী? রূপ, বীর্ষ, শ্রম, মহিমার এই অপরূপ জগত ছেড়ে চলে যাব? এখান থেকে চলে যাওয়া কি সম্ভব? কদাচ নয়, কোথাও নয়!

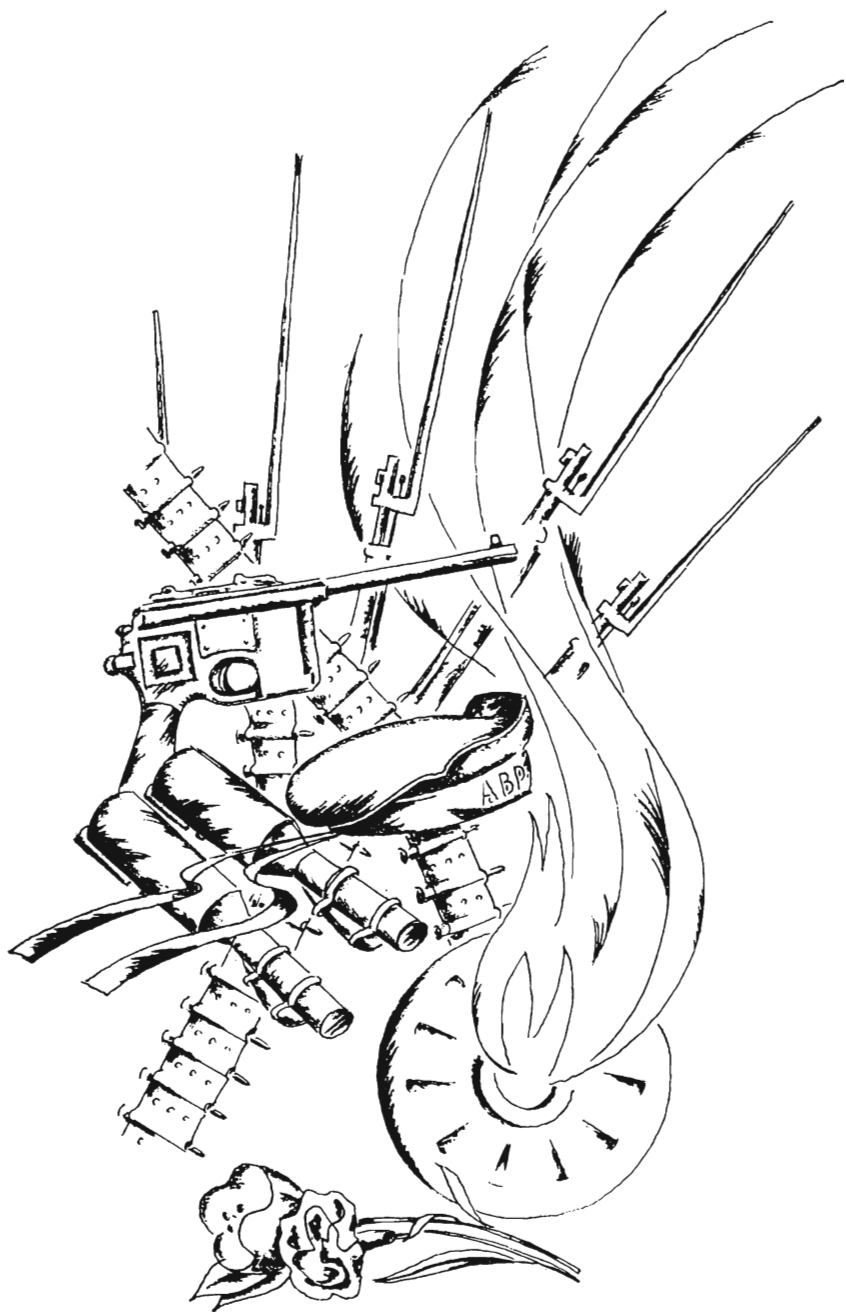
এ শহরকে রক্ষা করতে হবে শেষ নিঃশ্বাস, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, তার নগরপ্রাচীর থেকে হঠাতে হবে শত্রুদের, নিঃশেষে ধ্বংস করতে হবে তাদের, আর চলে যাওয়া — কদাচ নয়! আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল শিল্পী, চোখ তার সরে না, বিস্ময়ের তার আর শেষ নেই, বুক তার ভরে উঠেছে বিপুল এক হর্ষ ও গর্বে।





আত্মকথা





প্রথম লেখা



ছোটোতে আমি রান্নার ডেকিচ খুব ভালোবাসতাম। আত্মহারা হতাম তাদের ঝলক দেখে। কোথাও বেড়াতে গেলে সর্বাগ্রে যেতাম রান্নাঘরে, তাকে সারি দেওয়া পেতলের ছোটো বড়ো হলদে হলদে ডেকিচগুলো দেখতাম মুগ্ধ হয়ে। তাক থেকে সবচেয়ে ছোটো ডেকিচটা দেওয়া হয় আমায়। সেটার ওপর এতই গুরুত্ব দিই যে চারপাশের লোকেরা বলত: ‘ভবিষ্যতে ও বাবুর্চি হবে।’ তখন সেটা আমি টুপি মতো মাথায় পরি। বড়োরা তাতে হাসাহাসি করে বলিছিল: ‘ও সৈনিক হবে,’ ঘৃণাক্ষরেও তাদের সন্দেহ হয় নি আমার সঠিক ভাগ্য-গণনাই তারা করেছে। জীবনে আমায় অংশ নিতে হয়েছে চারটি যুদ্ধে।

সাত বছরে আমি লিখতে পড়তে শিখি। যা পেতাম সবই পড়ে ফেলতাম। আমার বেশ বড়ো এক দাদা ছিল, সে যখন জোরে জোরে কিছু পড়ত ভারি ভালো লাগত শুনতে। গোলাপী রঙের চিট বইগুলোর কথা মনে পড়ে — পুরুষিকনের বিভিন্ন রচনা। কী প্রকাশন তা জানি না, তবে পুরুষিকনের প্রতিটি কাব্যই আলাদা আলাদা বই হিসেবে ছাপা হয়েছিল। এইসব চিট বইয়ের দাম ছিল কয়েক কোপেক মাত্র। তারপর ‘শাল্‌ক্‌ বুর্গেরের কন্যা রোজা বুর্গের’ নামে এক দীর্ঘ উপন্যাসের কিস্তির পর কিস্তি পড়ে শেষ করি। ইংরেজদের সঙ্গে বুর্যোরদের লড়াইয়ের কথা ছিল তাতে। রোমাঞ্চোপন্যাসটা পড়ি গানের তালে তালে, আমার ভাসিয়া কাকু গাইতে ভালোবাসতেন ‘ট্রান্সভাল, ট্রান্সভাল, স্বদেশ আমার’।

তখন রুশ-জাপান যুদ্ধ চলছিল। আমার আট বছর পূর্ণ হয়েছে। এক সন্ধ্যায় দাদা পড়ে শোনাচ্ছিল জোন্সার উপন্যাস

‘বিপর্যয়’। আমি বসে ছিলাম মন্ডমন্ডের মতো, মূখ থেকে তার চোখ সরাই নি, ফ্রান্সের ভাগ্যবিধায়ক সংঘর্ষটার ছবিতে তন্ময় হয়ে যাই। সে রাতে ঘুম ভালো হয় নি। স্বপ্ন দেখি, বিনা সওয়ারে ঘোড়া ছুটছে, বাড়ির ভেতর থেকে গুলি চালাচ্ছে সৈন্যেরা, গাছ জ্বলছে, মাঠ ভরে উঠেছে মৃতদেহে, কামান লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে অশ্বারোহী বাহিনী। ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে, তখনো আমার চোখের সামনে ঘোড়ার মূখ, ফেনায়িত গ্রীবা, কানে যেন বাজছে গোলাগুলির শব্দ। সকালে আমি হেরিং মাছের মোড়কের একটা ছেয়ে রঙের পদ্রু বড়ো মতো কাগজ নিয়ে চার ভাঁজ করি।

দাদা বললে, ‘কী করবি কাগজটা? ফের আটা লাগাবি বৃষ্টি? এমনিতেই একেবারে আটা-মাখা। দ্যাখ তোর প্যাণ্টে কত আটা।’

বললাম, ‘না, আটা লাগাব না। অন্য দরকার আছে।’

বসলাম একটা নিরিবিলি কোণে। ভাসিয়া কাকুর ছুতোরের কাজের প্রকাণ্ড মোটা পেনসিলটা নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক লোকের মতো কালো কালো মোটা হরফে লিখতে লাগলাম কি ভাবে জোল্যা যে লড়াইটার কথা লিখেছিল, তাতে আমিও যোগ দিয়েছি। লিখতে লাগলাম নিবিষ্ট মনে, এমনভাবে যেন সবকিছু আমার চোখে দেখা। খুঁটিনাটি মনে যা ছিল দিলাম, নতুনও বানালাম। এগুতে লাগল কাহিনী। দ্বিতীয় একখানা পদ্রু ধূসর কাগজ নিয়ে চার ভাঁজ করে আটা দিয়ে জুড়লাম, কিন্তু টের পেলাম গল্পে আমার কিছু একটার ঘাটতি। বৃষ্টিলাম: ঘাটতি হয়েছে ছবির। সুতরাং যেমন পারলাম আঁকলাম, বিনা সওয়ারে ঘোড়া, লম্বা বাড়ির জানলা দিয়ে গুলি চালাচ্ছে সৈনিক। কাজটা শেষ করে সগর্বে পড়ে শোনালাম আমার প্রথম লেখা। বাড়ির সবাই হাসাহাসি করলে আমায় নিয়ে, আমার হিজিবিজি লেখা আর ছবিগুলো নিয়ে।

‘ওহ, কী আমার লেখক!’ বললে ভাসিয়া কাকু, ‘উৎরোয় নি ভায়া...’

‘ওহ, কী আমার শিল্পী!’ বললে দাদা, ‘দ্যাখো, দ্যাখো, ঘোড়াটা হয়েছে একেবারে কুকুরের মতো।’

বিচলিত হয়েছিলাম আমি। খুবই মন খারাপ হয়ে যায় লেখাটা নিয়ে। বটেই তো, এ আবার লেখা। কিন্তু সত্যিকারের লেখকেরা কি ভাবে লেখে! সবকিছু যখন অমন চমৎকার মনে রেখেছে, তখন নিশ্চয় এই জোল্যা নিজেই লড়াই করেছিল।

আমার প্রথম লেখাটা ভোলার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু মোটা মোটা ধূসর কাগজ ভাঁজ করে চিত্র সহযোগে লিখে যাওয়ার টানটা ছিল আমার অদম্য। তবে তা আর কাউকে পড়ে শোনাতাম না, কেননা জানতাম লোকে ঠাট্টা করবে।

বাবা আমার নাপিত, একবার আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যান তাঁর বন্ধুর বাড়িতে, ভজনেসেনস্কি রাস্তায়। বন্ধুটি থাকত আসবাবপত্র সমেত ভাড়া করা একটা ঘরে। লোকটা বড়ো ফরাসী, সেও নাপিত। মদুখানা ভালো মানুষের মতো, মস্তো পদ্রুৎটু মোচ, সরু সরু শাদা হাত। এমন সাবলীল ভঙ্গিতে সে মাথা নোয়ালে এবং প্রায় লাফাতে লাগল ঘরখানায় যে মনে হবে সে বুদ্ধি কোনো সার্কাসের পদ্রনো খেলোয়াড়, কিংবা ব্যায়ামবীর অথবা ম্যার্জিসিয়ান। সম্ভবত লোকটা ফুর্তিবাজ, রসিকতা ভালোবাসে। রুশী বলত প্রায় বিশুদ্ধ, রাশিয়ায় আছে অনেক দিন, তবে কয়েকটা শব্দের উচ্চারণ কেমন হাস্যকর।

আমায় বললে, ‘খোঁকা, কী বড়ো খোঁকা! খোঁকার বয়স কত?’
বয়স বললাম।

এমনভাবে একটু লাফিয়ে উঠল যেন আমার জবাবটায় অবাক হবার মতো কিছু আছে।

‘পাড়িস তুই খোঁকা?’

‘ইশকুলে পাড়ি আমি, নিম্ন প্রাইমারিতে,’ বললাম সগর্বে এবং গদ্রুৎসহকারে।

‘আর বড়ো হয়ে তুই কী হবি খোঁকা?’

কী বলব ভেবে পেলাম না।

হেসে বাবাই জবাব দিলেন, ‘ও চায় লেখক হতে... যুদ্ধ নিয়ে একটা লিখেছেও।’

‘যুদ্ধ নিয়ে?’ অবাক হয়ে সুর টেনে বললে ফরাসীটি (নাম তার জাঁ কের্‌সি), ‘কোন যুদ্ধ? জাপানীদের সঙ্গে?’

‘না,’ ফরাসীটির সহৃদয় বাদামী চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ, অনেক আগেকার ঘটনা, জার্মানদের সঙ্গে যখন লড়াই করে ফরাসীরা। জোয়াল নামে এক লেখক আছে, সে লিখেছে...’

‘জোয়াল!’ চের্‌চিয়ে উঠল জাঁ কের্‌সি, ‘ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ, সেদান! সেই যুদ্ধের কথা বলছিঁস ছোটো খোঁকা?’

‘সেই যুদ্ধ,’ বলে অপেক্ষা করতে লাগলাম এই বুদ্ধি সে হেসে ওঠে (লোকটাকে আমার ভালো লেগেছিল, চাই নি যে সবার মতো সেও আমায় ঠাট্টা করবে), ‘তবে আমি লিখেছি কেবল ঘোড়ার কথা, তাতে লড়েছিল ঘোড়সওয়ার দল।’

‘জানিস খোঁকা,’ হঠাৎ আমার হাত ধরে সোফায় নিজের পাশে বসিয়ে চের্‌চিয়ে উঠল কের্‌সি, ‘আমি নিজেই সেখানে ছিলাম। ঘোড়া হাঁকিয়েছি। তখন ওটাকে কী বলত? মিত্রালিয়েজ খোঁকা, মিত্রালিয়েজ! এখন যেমন মেশিনগান, তেমনি, মারা পড়ল আমার ঘোড়া, পড়ে গেলাম আমি, জখম হলাম। এখনো আমার পায়ে দাগ আছে। ওহ্, ভারি মজার খোঁকা তুই। তাহলে যুদ্ধে কী হয়েছিল তাই লিখেছিঁস? আমার তখন বিশ বছর বয়স, আমার বন্ধুরা রওনা দিলে গরুস্থানে (বুঝলাম বলতে চাইছে ‘গোরস্থান’) আমি কিন্তু তখনো জিন্দা-জিন্দা... আমি খোঁকা বড়ো হয়েছি, তুই এখনো ছোটো, অনেক কিছু দেখবি। তাহলে লেখক হতে চাস তুই?..’

অনর্গল কথা কয়ে চলল সে, আমায় কিছু বলবার ফুরসত দিলে না। চেয়ে ছিলাম তার দিকে, বই থেকে উঠে আসা একটা লোকের দিকে চেয়ে দেখতে কী ভালোই না লেগেছিল। ও যদি পাশের ঘর থেকে টেনে আনত কোনো জঙ্গী ঘোড়া, সদ্যটকেস খুলে বার করত অশ্ব-পদুচ্ছ শিরস্ত্রাণ, কোণ থেকে তুলে ধরত ঝক্‌ঝকে কুপাণ, তাহলে অবাক হতাম না আমি। তবে আমায় আরো শ্রম্ভিত করে সে আমার দিকে ঝুঁকে গোপন-গোপন ভাব ফুটিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে:

‘আচ্ছা খোঁকা, সত্যিকারের লেখক তুই দেখেছিঁস কখনো?’

নেতিবাচক মাথা নাড়লাম আমি।

‘দাঁড়া, তোকে দেখাব।’ দরজার দিকে ছুটে গেল কেঁঁসি, দুয়োর খুলে, ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ঘাড়ি বার করে, সময় দেখে ফিরে এল সোফায়। ছবি-ওয়ালা একটা ফরাসী পত্রিকা পড়ছিলেন বাবা, আমাদের কথাবার্তায় তাঁর কান ছিল না।

কেঁঁসি বললে, ‘এখানে এক সত্যিকারের লেখক থাকেন খোঁকা, শিগগিরই স্নানের ঘরে যাবেন। এই গুঁর সময়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করা যাক। খুব নিয়মানুবর্তী, সত্যিকারের লেখক, খোঁকা...’

মিনিট দশেক পরে সত্যিই পায়ের শব্দ শোনা গেল করিডরে। কে যেন কাছিয়ে আসছে আমাদের ঘরের দিকে, তারপর দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল।

কেঁঁসি অমনি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে খুব লঘু ভঙ্গিতে দরজা খুলে আমায় ঠেলে দিলে করিডরে, কাঁধ ধরে ইঙ্গিত করলে ডাইনের দিকে। তাকাতেই একটা পিঠ চোখে পড়ল, ধীরে ধীরে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা, মোটা, দীর্ঘকায়, পরনে সবুজের ওপর কালো চোঁখুপি কাটা কোট, চওড়া খাটো প্যান্টটাও একই কাপড়ের, সবুজ-কালো মোজা, কাঁধে প্রকাণ্ড, তুলতুলে তোয়ালে।

চওড়া হিলের ওপর মদুটকো জুতোটায় যেন করিডরের গালিচা দেবে যাচ্ছিল। কী একটা শিস দিচ্ছিল সে, তুড়ি দিচ্ছিল আঙুলে। কেঁসি ফের আমার ঘরে টেনে আনল।

‘দেখলি, দেখলি তো?’ বিজয়ের সুরে চেঁচাল সে, ‘সত্যিকারের লেখক খোঁকা, বই লেখে, ‘বির্জোভকা’য় লেখে।’

সে সময় ‘বির্জোভকা’ (স্টক-একস্‌চেঞ্জ সংবাদ) ছিল খুবই জনপ্রিয় পত্রিকা। ‘বির্জোভকা’র নাম আমার শোনা ছিল, আর চোঁকো ইন্টের মতো চাঁদি-ওয়ালা এই মোটা লোকটা যে ঠিক ওই কাগজটাতেই লেখে তাতে কেঁসির ওপর আমার ভরসা বাড়ল। মনে হল ও আমার ধাম্পা দিচ্ছে না, সত্যি কথাই বলছে, সত্যিই লোকটা লেখক, ‘বির্জোভকা’য় লেখে।

‘নাম জানিস গুঁর?’

বললাম, ‘জানি না।’

‘গুঁর নাম রেশ্‌কো-রেশ্‌কভস্কি। ‘বির্জোভকা’য় গুঁর লেখা পড়েছিঁস?’

সসঙ্কোচে বললাম, ‘‘বির্জোভকা’ আমি পড়ি না।’

‘তাতে কী হয়েছে খোঁকা, তাতে কী হয়েছে,’ বললে কেঁসি, ‘সত্যিকারের লেখককে তো দেখলি। তুইও লেখক হবি। তোর ওপর আমার ভরসা আছে রে খোঁকা।’

হঠাৎ আমাকে তুলে ধরে সে চুমু খেল আমার গালে।

পরে পালোয়ানদের নিয়ে, ফরাসী কুস্তি নিয়ে রেশ্‌কো-রেশ্‌কভস্কির উপন্যাস পড়েছিলাম, কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। ভাসিয়া কাকুর সঙ্গে সাক্ষাৎে যাই একবার, সেখানে যে কুস্তি দেখি, সেটা উপন্যাসের চেয়ে অনেক ভালো।

অনেক বছর কাটল তারপরে। বড়ো বড়ো ছত্রে ভরা, বেটপ ছবি আঁকা আমার স্বহস্তনির্মিত ধূসর খাতাখানা এ সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে বহু দিন। ‘যুদ্ধ’ নামে উপন্যাস লিখেছি একখানা।

জার্মানরা প্রথম যে গ্যাস প্রয়োগ করে তার কথা আছে একটি অধ্যায়ে। তা নিয়ে যখন খাটছিলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিখার এক ফরাসী সৈন্যের কথা যখন লিখি, তখন হঠাৎ গত শতকের সত্তর সালের ফরাসী সৈনিক, সহৃদয় সাবলীল জাঁ কেঁসির কথা মনে পড়ে। গ্যাস আক্রমণের সময় আমার যে ফরাসী চরিত্রটি পাহারায় থাকার সময় মারা যায়, তার নাম আমি দিয়েছি জাঁ কেঁসি। ও যে মারা যায়, তাতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমার।

প্রাসাদ



একবার, যখন আমি খুবই ছোটো, বেড়াতে যাই দিদিমার সঙ্গে। সে সময় অর্ধশতক আগে একেবারেই অন্য চেহারা ছিল পিটার্সবুর্গের। রাস্তা দিয়ে যেত ছ্যাকরা গাড়ি, মালগাড়ি টানত ইয়া-ইয়া পার্টিকলে রঙের ঘোড়া, শোখীন কোচ গাড়ির জানলায় পর্দা ঝুলত, ঝন্ঝন্ করত ঘোড়ায় টানা ট্রাম, শব্দ উঠত অমনি-বাসের চাকায়; পথচারীরা হাঁটত ধীরেসুস্থে; নেভা নদীর ধূসর সীসা-রঙা তরঙ্গে দুলত ছোটো নৌকো, সাধারণ যাত্রীতে বোঝাই ছোটো ছোটো সরু সরু স্টিমার ছুটত ধোঁয়া তুলে।

সেতু ছেড়ে আমরা ফিরলাম চকের দিকে, সামনে প্রকাণ্ড শীত প্রাসাদ, তার বিপরীতে অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকে আছে প্রধান হেড-কোয়ার্টারের ভবন। আমরা যাচ্ছিলাম সোজা প্রাসাদের দিকে।

‘কোথায় যাচ্ছি দিদিমা? ওখানে কি ঢুকতে দেয়?’

‘জার শহরে না থাকলে ঢুকতে দেয়,’ বললে দিদিমা, ‘পরসায় নিয়ে দেখতে দেয়, বেড়ানো হয় আর কি।’

সত্যিই প্রাসাদের চাপরাশীরা দর্শকদের দল বেঁধে ঘরের পর ঘর, হলের পর হল দেখিয়ে বেড়াল। পরে জেনেছিলাম প্রাসাদে প্রকোষ্ঠ আছে হাজারের বেশি, শতাধিক সিঁড়ি, প্রচুর ছবি আর মূর্তি। শিগগিরই হাঁপিয়ে উঠলাম আমি, দিদিমা কিন্তু ফিস্‌ফিসিয়ে বললে:

‘এখানে বসতে দেয় না। চল, চল, খোদ পিটারকে দেখব।’

‘কোন পিটার দিদিমা,’ একইরকম ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম।

‘কোন পিটার, বোকাটা? সেই পিটার, যে পিটার্সবুর্গ বানিয়েছে, নিজে কুড়ুল দিয়ে প্রথম কুটির গড়েছে এখানে।’

‘তাহলে সে ছদ্মতোর ছিল...’

‘ছদ্মতোর মানে? সে ছিল জার, বোকাটা।’

শীত পরিখা পেরিয়ে আমরা করিডরে এলাম, দূর থেকেই আমি দেখেছিলাম গ্যালারির মাঝখানে উঁচু এক চেয়ারে বসে আছে খুবই লম্বা একটা মোমের মূর্তি, সবুজ পোষাক, রাগী-রাগী চেহারা, সরু কালো মোচ, তার প্রত্যেকটা রোঁয়া জ্বলজ্বল করছে যেন তেল মাখানো।

হঠাৎ আমাদের সঙ্গে খানসামা ছুটে গিয়ে কুর্নিশ করলে একটা লোককে, বসে ছিল সে, কানে কানে কী যেন বললে, তারপর জোর গলায় ঘোষণা করলে:

‘জার প্রথম পিটার আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন!’

তা শুনে জার টানটান হয়ে উঠলেন, কী একটা খসখস করে উঠল, মৃদু ঝন্ঝন্ শব্দ শোনা গেল, তারপর দানবের মতো দৈর্ঘ্য পুরো সিঁধে হয়ে জার দৃষ্টিহীন কাচের মতো চোখে আমাদের দিকে চেয়ে মাথা নোয়ালেন এবং ফের সামান্য খ্যাঁসখ্যাঁস শব্দে ধীরেসুস্থে বসে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আঁতকে কে একজন মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দিদিমা আমায় জোরে ধরে রেখেছিল, পাছে আমার হাত কাঁপে। হাত কিন্তু আমার কাঁপে নি, শূন্য ভারি কৌতূহল হয়েছিল, ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম:

‘আরেক বার অভিবাদন করুক।’

কিন্তু এই সময় খানসামা তাড়া দিল, আর দিদিমা বললে:

‘কী সখ! তোকে কেবল অভিবাদন করাই ওর কাজ, তাই না?’

আরো এগিয়ে গেলাম আমরা, যে জানলাটার কাছে পেঁছিলাম তার ওপাশেই বাগিচা। খানসামা তার ছোটো দর্শকদলকে জড়ো করে বাগানটা দেখিয়ে বললে:

‘এখানে বাগিচা কখনো ছিল না, তা করার কথাও ছিল না। কিন্তু জারের ইচ্ছে হল প্রাসাদের সামনে বেড়াবে, হুকুম দিলে বাগান করতে হবে। নিয়ম-মতো ফুলের কেয়ারি, হাঁটা-পথ, সবই হল, কেউ যাতে ব্যাঘাত না ঘটায়, তার জন্যে এই দেখুন কী উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে।’

‘ওটা পিটার নয়, ওটা একালের জারের হুকুম,’ বললে দিদিমা।
পায়ের ওপর উঁচু হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে খানসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা বাগানটায় দোঁড়োদোঁড়ি করা যাবে?’

‘না, থোকা,’ গম্ভীরভাবেই বললে খানসামা, ‘তুই যদি বড়ো মানুষও হোস, তাহলেও এ বাগানে তোর বেড়ানো চলবে না।’

‘হ্যাঁ, চলবে!’ দুর্বোধ্য বিদ্বেষে চোঁচিয়ে উঠলাম আমি, আর দিদিমা হেসে বললে:

‘নে হয়েছে, হয়েছে! কী দামাল, বোকার মতো বকিস না। নে, চল যাই বাড়ি, সময় হয়েছে।’

জার ছাড়া যেখানে কেউ বেড়াতে পারে না, সেই রহস্যময় বাগানটার দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করলাম আমি। জারকে আমি কখনো দেখি নি, শুধু শুনেছি যে সবাই তাকে টিটকারি দেয় ‘নিকোলাশকা’* বলে, আমার কাছে মনে হত সে এক বিছঁছিরি অথর্ব বামন, মাথায় টুপি, থুতনিতে লম্বা চুঁচলো দাড়ি।

চোন্দ বছর কাটল, বিপ্লবী জনগণ ছুড়ে ফেললে জারকে। সেটা ফেব্রুয়ারি মাস। আর সেই সতেরো সালেরই অক্টোবর রাতে, লাল রক্ষীরা, নাবিক ও সৈনিকেরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ে জয়লাভ করলে। প্রাসাদ এল বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের হাতে।

আঠারো সালের বসন্তে আমি প্রাসাদের বাগিচা ঘেরা উঁচু পাথুরে প্রাচীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। চুপচাপ, উষ আবহাওয়া।

* জার নিকোলাসের ব্যঙ্গাত্মক উপনাম। — সম্পাঃ

বাগিচায় পাখির কাকলী, নির্জন চকে তা বেশ শোনা যাচ্ছিল। তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল আলেকসান্দ্রভ্ বাগানের পাখিরা, এখন নৌসেনাবিভাগের সম্মুখস্থ মেহনতী বাগিচা। নেভা নদীর বরফ গলে গেছে, সমুদ্র থেকে উষ্ণ বাতাসের ঝাপটায় উত্তাল হয়ে উঠেছে জল, এখনো তার কোথাও কোথাও পাক খাচ্ছে বরফের টুকরো।

প্রাসাদের বাগিচার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বৃষস্কন্ধ একটি লোক, বিশেষ লম্বা নয়, মুখখানা শান্ত, ছোটো ছোটো জোরালো ঘায়ে হাতুড়ি পিটিছিল দেয়ালে। কিছু কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখিছিল, পুরো বৃষতে পারিছিল না কী করছে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

লোকটা হাতুড়ি ছেড়ে শাবল নিলে। উঁচু বেড়ার সঙ্গে একা যুদ্ধমান এই লোকটাকে এতই অদ্ভুত লাগিছিল যে আমরা আর পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম:

‘কী করছেন কমরেড?’

‘পাঁচিলটার কথা বলছেন?’ বললে সে, ‘ওর মেয়াদ ফুরিয়েছে। জার নেই। কারো কাছ থেকে বাগানটাকে আর আগলে রাখার দরকার হবে না। হুকুম হয়েছে পাঁচিলটাকে ভাঙতে হবে। আমাদের সমবায় কাজটা নিয়েছে। ভাববেন না আমি একা। অন্যেরা খেতে গেছে। আমি একা আছি, যন্ত্রপাতি দেখিছি, শৃংখলা চাই তো। আর বসে যখন আছি, একটু করে ঘাও মারছি।’

দেখলাম, পাঁচিলে হাতুড়ি, শাবল, ইস্পাতের কীসব কীলক। তার সাফল্য কামনা করে আমরা যে যার কাজে চলে যাই।

আর মাস খানেক পরেই জায়গাটায় হয় নগর-জোড়া স্দুবোৎনিক,* এমন হৈট্টে, এমন হাসিখুশি, যে মনে হল লোকেরা এসেছে কোনো

* স্দুবোৎনিক — বিনা বেতনে স্বেচ্ছাসেবী পরিশ্রম, প্রধানত ছুটির দিন স্দুবোতা বা শনিবারে। — সম্পাঃ

পরবে, কেননা অর্কেস্ট্রা বাজছিল, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেউ কেউ শূরু করে দিয়েছিল নাচ।

হাজার হাজার লোকে দেয়াল ভাঙছে, পাথরের টালি খসাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদী তীরে, পাথর বোঝাই করছে মাল স্টিমারে। দূর থেকে মনে হতে পারত সবাই যেন যার যা খুশি খেটে যাচ্ছে, কোনো পরিকল্পনা নেই — কিন্তু সেটা ঠিক নয়। পরিকল্পনা ছিল এবং খুবই পাকা। কারখানার তরুণেরা, লাল ফোঁজীরা, নারিকেরা, নারী পুরুষ কিশোর সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে নিজের নিজের অংশে কাজ করছিল উৎসাহ করে।

কাজের ফাঁকে ঘাম মূছে আমি একমুহূর্ত থেমে তাকিয়ে দেখলাম বিচিত্র দৃশ্যটা: প্রাসাদের দেয়াল, বাগিচা, — এবং হেসে উঠলাম। পাশের লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল হাসি কি কেন। হাসির আসল কারণটা ওদের কাছে ভাঙলাম না, কেননা ওদের কাছে কবুল করতে সঙ্কোচ হল যে দূর অতীতের একটা ঘটনা আমার মনে পড়েছে। সেই — আমি যখন ছোটো, প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখাছিলাম বাগিচাটা, জারের খানসামা আমায় বলেছিল, ও বাগানে কখনো আমার বেড়ানো চলবে না, আর আমি বলেছিলাম, ‘হ্যাঁ, চলবে!’

আর এখন আমি বাগিচায় বেড়াচ্ছি শূরু নয়, সমগ্র জনগণের সঙ্গে মালিক হয়ে বসেছি তার। মনে হল সেই বড়ো গোমড়া-মুখ খানসামাটার সঙ্গে একবার দেখা হলে হত। এখন কী বলত সে?

সন্ধ্যা নাগাদ প্রাচীর আর রইল না। রইল না তার ওপরকার উঁচু উঁচু শিকগড়লো। ভাঙা ইঁট-পাথরের মধ্যে বসে বিপ্লবী গান গাইছিল তরুণ-তরুণীরা। ফুল-ভুঁইগড়লোর মাঝে মাঝে নাচ জুড়েছিল নারিকেরা — অক্লান্ত নর্তক সব। ফুটিতে পতপত করছে তাদের টুপি ফিতে।

ভাবখানা এমন যেন নতুন তরুণ মনিবেরা এসেছে, টেলে সাজতে শুরুর করেছে পুরনো দ্বনিয়া, কারো সাধ্য নেই তাদের জয়োজ্জ্বল সর্বশক্তিমান তারুণ্যকে রোধে। মাথার ওপর নাচছে লাল ঝাণ্ডা, ছেলেমানুষের মতো ভাবলাম, ‘কেমন হয় যদি কেদারায় বসা মোমের জার পিটারকে টেনে এনে জানলা খুলে দেওয়া হয় এবং তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করেন নতুন বিপ্লবী শহরের নির্মাতাদের।’

আরো বছর কাটল। বহুবার আমি বেড়াতে এসেছি এই প্রাসাদের বাগিচায়, তার অনতিদীর্ঘ তরুণীথর তলে বসেছি বেষ্টিতে। কতবার কানে এসেছে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে এসে মা-বাপে গল্প করেছে প্রাসাদের কথা, সেকালের কথা, এই বাগিচাটার কথা যেখানে বেড়াতে পারত কেবল একটি লোক, শিশুদের কাছে এর মধ্যেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার নাম — জার।

আর শিশুরা সাধারণত অবাক হয়ে অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকত, কেননা এসব পুরনো কাহিনী তাদের আর স্পর্শ করে না, এই বৃহৎ প্রাসাদ আর এই বাগানটা তাদের কাছে মনে হয় অতি সাধারণ ব্যাপার।

একবার কানে এল বড়ো এক শ্রমিক গল্প করে শোনাচ্ছে তার উৎকর্ষ নাটিকে কি ভাবে যৌবনে সে এই শীত প্রাসাদ দখল করছিল, গোলাগুলির ঝলক দেওয়া রাইফ্র অঙ্ককার দিয়ে ছুটে আসে সে, ব্যারিকেড ডিঙিয়ে ধেয়ে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে আলো-ঝলমল এই গ্যালারিতে, ১৮১২ সালের জেনারেলদের ছবি টাঙানো সেখানে। তারপর তারা বন্দী করে সাময়িক সরকারের মন্ত্রীদের, কম্পমান হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিক সৈনিক নাবিকদের দিকে এমনভাবে চেয়েছিল যেন এসব লোককে জীবনে এই প্রথম দেখছে।

তারপর বাগিচার কথা যখন সে শুরুর করল, বলল কি ভাবে
পাঁচিল ভেঙে রেলিংগুলো টেনে নিয়ে যায়, তখন ছেলেটা হেসে
উঠে বললে:

‘জানি, জানি রেলিংগুলো এখন কোথায়, আমাদের স্টাচেক
রাস্তায়, নতুন পার্কে। কী মজা। তাহলে তুমিই ওগুলো বয়ে
এনেছিলে?’

‘আমিও খানিকটা,’ বললে বড়ো মজুর।

‘ঠিক করেছিলে,’ ছেলেটা বললে কাজের লোকের ঢঙে, ‘অমন
রেলিং আবর্জনায় ফেলে দিতে কষ্ট হবে। আর আমাদের ওখানে
দিব্য মানিয়ে গেছে। ওখানেই থাকুক।’

চলে গেল ওরা, আমি হাঁটতে লাগলাম নদীতীরের রাস্তা
দিয়ে, মনে হল, শহরটাকে কী বদলে দিয়েছে অক্টোবর বিপ্লব, চেনা
যায় না, এখন তার নাম লেনিনগ্রাদ, এমন একটা আশ্চর্য নতুন
জীবন লাভ করেছে শহরটা যে সে কথা আমার শৈশবের দিনে
বললে কেউ বিশ্বাসই করত না।

নেভাঙ্ক সৱণী



একেবাবে দেয়াল ঘেঁষে রইলাম আমি, তারপর চট করে তা ছেড়ে দিয়ে সামনে লাফিয়ে গেলাম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম একটু, কান পেতে থেকে পা বাড়ালাম; ফের আমার দেহ এঁটে রইল দেয়াল বরাবর যেন টিকিটিকি, পরে সিধে হয়ে এগিয়ে গেলাম ফুটপাথের মাঝামাঝি এবং সমান ক্ষিপ্ৰতায় ফের এলাম দেয়ালে। দেখে মনে হবে না নাচাছি, যদিও গতিগল্লো ছিল হিশেব করা, তার পুনরাবৃত্তি হাঁছিল তালে তালে।

এ গতি কারো চোখে পড়া সম্ভব ছিল না, কেননা তা ঘটাছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অবশ্য সম্পূর্ণ অন্ধকার কখনো হয় না। এটাও সেইরকম। যে অন্ধকার আমায় ঘিরে ছিল, তাতে মাঝে মাঝে চালের ওপর বিস্ফোরণের মিটমিটে গোলাপী ঝলক দেখা যাচ্ছিল, তখন ফুটে উঠছিল বাড়িগল্লোর কালো কালো কোণ, চালের ঢাল, এঁটে বন্ধ করা নিজাঁব জানলার ফালি, পিচ্ছিল রাস্তার নিজর্জনতা। তারপর সব ফের তলিয়ে যাচ্ছিল কালো ধোঁয়াটে কুয়াশায় এবং কোন দিকে যাচ্ছি তা নিশ্চিত জানা থাকলেই এগুনো সম্ভব হাঁছিল।

হামাগুঁড়ি দিতে পারতাম আমি, তাহলেও কারো চোখে পড়তাম না, যদিও যাচ্ছিলাম আমি নেভাঙ্ক সৱণী দিয়ে... নেভাঙ্ক সৱণী? আমাদের পাগল ঠাওরেছেন! সবচেয়ে অন্ধকার রাতে, শীত বা শরতের সবচেয়ে গহন নিশাতেও এখানে বাতি জ্বলে রাস্তায়, দীপ দেখা যায় বাড়িতে, আলোর কোনো না কোনো লক্ষণ থাকবেই। তবে এ হল, যাকে বলা যায় শতকের সবচেয়ে মৃত প্রহরে, লেনিনগ্রাদ অবরোধের সময়কার নেভাঙ্ক সৱণী। একটি আলোকবিন্দুও এ অন্ধকারে থাকা উচিত নয়, তা ছিলও না।

তাছাড়া এইসব অঙ্গভঙ্গি আমি করছিলাম আড়িমুড়ি ভাঙার জন্যে নয়, কিংবা কেউ যখন আমায় দেখতে পাচ্ছে না, সেই সুযোগে গতির একটু স্বাধীনতা ভোগ করার লোভেও নয়।

রাস্তাটা নিস্তব্ধ নয়, যদিও আমার চারপাশের সবকিছুই যেন আড়ষ্ট, লুপ্তায়িত। থেকে থেকে কানে আসছিল কাছেই কোথাও গোলা ফাটার আওয়াজ। তারপরেই শোনা যাচ্ছিল কাচের বন্‌বন্‌, চাপা ঝুপঝাপ, যেন দেয়াল থেকে খসে পড়ল একসার ইন্ট, শহরের এই চাপা গোঙানির পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল প্রতিধ্বনিতে; মৃদুহৃদের জন্যে প্রথমটা সবজেটে-নীল, তারপর ঘৃষ্মরঙা-গোলাপী শিখায় আলো হয়ে উঠল সবকিছু, তারপর বাতাস ভরে উঠল হরেকরকমের অজস্র ধ্বনিতে। কোনোটা শিস দিচ্ছে, কোনোটা গজরাচ্ছে, বিছছিরিরকমের বিষম সুরে কি একটা চড়বড় করছে কানের ওপর, যেন লোহার ডানাওয়ালা হিংস্র, বিষাক্ত, অপরিচিত কীসব পতঙ্গ উড়ে এসেছে।

অ্যাডমিরালটি ভবনের দিকে যাচ্ছিলাম একা আমিই নয়। যাচ্ছিলাম নেভাল স্কি সরণী ও প্রাসাদ-চত্বরের কোণের দিকে, সামরিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে। এই পথটা না নিয়ে আমার উপায় নেই, তার বিপদ লাঘব করাও সম্ভব নয়। অগ্ন্যুৎসব গোলা দাগা হচ্ছে, উপায় নেই কিছ্‌। সামনে আমার কে যেন দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিল আর থেকে থেকে বলছিল: ‘শয়তান তোকে নিলে বাঁচি!’ তারপর হঠাৎ ওই একই মেয়েলী কণ্ঠস্বর একই সুরে চাপা গলায় বলে উঠল: ‘ওহ ভগবান!’ অস্ফুটোক্তির এই পালা-বদলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমাদের চারপাশের ওই গর্জন, খেঁকানি আর শিসের।

কিন্তু এই গলাটার আগে শোনা যাচ্ছিল আরেকটা গলা — অল্পবয়সী, সংযত তার ঝঙ্কার, প্রায় যেন কাতরে উঠল তা: ‘কী এটা! এটা কী!’

শনশনে শিসটা এত কাছ দিয়ে গেল যে আমি অনিচ্ছাতেই দেয়াল ঘেঁষে এলাম। মদুহুতের জন্যে চোখও বদুর্জেছিলাম। হঠাৎ হাসি পেল আমার! এই কি নেভিস্কি? এটা লেনিনগ্রাদ? অসম্ভব!

এক্ষুনি চোখ খুলব, কাল-যন্ত্রে চেপে চলে যাব আমার বাল্যকালে। কী দেখছি? নেভিস্কি, রোদে ভরা। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। কী একদল সুপদুরদুয ঘোড়সওয়ার চলেছে। সংখ্যায় অনেক, ঘোড়াগুলো সব একরকমের। একদল সওয়ারীর গায়ে বর্ম, শিরস্ত্রাণে রুপোলী ঈগল। অন্যদের ফারের টুপি, আরেক দলের মাথায় শক্ত শ্যাকো। ঝলমল করছে বর্ম, রেশমের মতো চিকচিক করছে ঘোড়া। ওরা সব রক্ষী বাহিনী, রণদেব ময়দানে চলেছে মে' প্যারেডে। তারপর নেভিস্কি দিয়ে ছুটছে কৃষ্ণ-দ্যুতির তরঙ্গ। কোচ-গাড়ি, বিলাস শকট, আমি জানি কারা যাচ্ছে — রাজদুত আর গণ্যমান্যরা। সন্ধ্যায় আলোয় আলো, জ্বলে দীপাবলী, চর্বি ঢালা সরা। কত সরা, রাখা হয়েছে তা ফুটপাথের কিনারে, আর বাতি জ্বালানো কোচ-গাড়ি আর হেড-লাইট জ্বালানো উঁচু উঁচু, বড়ো বড়ো চাকার মোটরগাড়ি যাচ্ছে আর আসছে।

চোখ মেললাম। অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পাশেই কী এক নারকীয় গন্ধক শিখায়। আমার চারপাশে লুর্দিয়ে পড়ছে কালো কালো ছায়া। খুব কাছেই শোনা গেল একটা চাপা আঘাত। ফের শোনা গেল বাতাসের শিস, নিষেধ, ক্ষ্যাপামি। কোথেকে একটা ইন্ট ঝরে পড়ল। দেয়ালে তা এমনভাবে এসে লাগল যেন কোনো পালোয়ান তা ছুড়ে মেরেছে; টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। কালচে কুয়াশায় ভেসে উঠল কেমন একটা বাদামী ধুলো।

সঙ্গে সঙ্গেই সামনে থেকে শোনা গেল: ‘শয়তান তোকে নিলে বাঁচি’, এবং তারপরেই: ‘ওহ্ ভগবান!’ দ্বিতীয় একটা ইন্ট পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কানের পাশ দিয়ে

শনশন করে গেল সেটা, ফের শুনলাম একটা মেয়ের গলা কাতরিয়ে
জিজ্ঞেস করছে, ‘কী এটা? কী এটা?’

থেমে গিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন বাতাসে এই
বিচ্ছিন্নি জিনিসগুলোর তোলপাড় থিতুয়ে আসবে। যুদ্ধের ঠিক
আগে নেভিস্ক সরণীর এই জায়গাটা আমার মনে পড়ল। রাস্তা
ভরা লোকের কেউ-ই আর তখন মে’ প্যারেডের কথা মনে রাখে
নি। নেভিস্ক সরণীই এত বদলে গিয়েছিল যেন শতবর্ষ পেরিয়ে
গেছে। কেউ বলতে পারত না আগেকার মে’ প্যারেড, রাষ্ট্রদূতদের
কোচ-গাড়ি, পথচারীদের পায়ের কাছে ধূমায়মান সরা-প্রদীপের
কথা। নেভিস্ক তখন বিজলী বাতিতে নেয়ে উঠেছে। মোটরের
হেড-লাইট আর ট্রামের আলোয় একেবারে তলিয়ে গেছে জার-
আমলের আলোকসজ্জা। হাজারে হাজারে লোক যাচ্ছে যে যার
নিজের কাজে, সিনেমায়, দোকানে, দাঁড়িয়ে থাকছে ফুটপাথে,
খবরের কাগজ পড়ছে, কথা কইছে, অপেক্ষা করছে ট্রাম আর
বাসের।

এসবই ছিল, এসবই চলছিল... কিন্তু এখন চোখ মেললেই আমি
পেঁছে যাব প্রাগৈতিহাসিক তমসায়, এক কোণ থেকে যদি উঠে
আসে কোনো ডাইনোসিরাস, অবাক হব না। আমার সারা জীবন
কেটেছে এই শহরে। ওটাও দেখা দরকার। তা থেকে পরিগ্রহ
নেই... আর এই এলাকাটা নিয়ে ওরা এত লেগে পড়েছে কেন!
আমার সামনের বড়িড়টার মতো আমারও ইচ্ছে হয়েছিল চেঁচাই:
‘শয়তান তোদের নিলে বাঁচি!’ — এমন সময় ঘূর্ণ্যমান ধাতব পিশাচ
ফের শুরুর করল তার খেল। মেয়েটা ফের চেঁচিয়ে উঠল: ‘কী
এটা? কী এটা?’

তখন মেয়েটাকে ভেঙে সারা রাস্তা ফাটিয়ে বড়ি ক্ষীপ্ত গলায়
চেঁচিয়ে উঠল: ‘‘কী এটা? কী এটা?’ গোলার টুকরো, হাঁদা
কোথাকার, গোলার টুকরো!’

এই সময় নতুন একটা বিস্ফোরণের আলোয় আমি দেখলাম যে আমরা সবাই একেবারে এসে পড়েছি সম্পাদকীয় অপিসের কাছে। ফের ঘন হয়ে এল রাত, কিন্তু মৃত্যুবর্ষী অনলাভার শেষ নিব্ব-নিব্বতে দেখতে পেলাম মেয়েটাকে বৃড়ি ফটকে ঠেলে দিয়ে নিজে তার পেছদ্ব নিলে।

সুচিভেদ্য অন্ধকার নামল।

...ফের আমি নেভস্কি সরণীতে। তখন তার আর সেই অতীত চেহারা নেই যখন তার ওপর দিয়ে পদক্ষেপ করে গেছে ‘ভারিয়গ’ আর ‘করেইৎস’ জাহাজের বীর নাবিকরা, প্রাক-সমর নেভস্কিও তা নয়। তাহলেও জ্বলজ্বলিয়ে উঠেছে, সন্ধ্যার আলোয় তা আলোকিত। অসংখ্য লোক সেখানে, ট্রাম আর নেই, কিন্তু প্রচুর বেড়েছে মোটর বাসের সংখ্যা, অবিরাম ছুটছে ট্রলিবাস, প্লাই-উডের দেয়াল দেওয়া ভেঙে পড়া বাড়ির জায়গায় উঠেছে সত্যিকারের ভবন... চোখ বৃজে আমি বিস্ফোরণের গোলাপী বলক দেওয়া প্রাগৈতিহাসিক রাতে ফিরে যেতে পারতাম, ইচ্ছে হল না।

সারা জীবন এই শহরে কাটিয়েছি। জানি, এখান থেকে মৃছে গেছে এই নোটিশ: ‘গোলাগুন্ডি চলার সময় রাস্তায় এই দিকটা বেশি বিপজ্জনক’, মৃছে গেছে ক্ষত ও গহবর, শৃধৃদ্ব স্মৃতি রেখে ধৃদ্বসমৃদ্বপ সর্পিয়ে নিয়েছে কালস্রোত।

ধোঁয়া ছাড়েছে কারখানার চির্মনি, নেভা নদীতে জাহাজ, পার্কে ভ্রাম্যমাণ নরনারী। বৃদ্ধ, পলিতকেশ আমি, হেংটে যাই যেসব জায়গা দিয়ে তা এতই পরিচিত যে মনেও পড়ে না। যাই, যে বাড়িতে জন্মেছিলাম। সেখানে এক ফলকে লেখা আছে: ‘এখানে ছিলেন হেৎসেন’। পরের রাস্তার নাম গোগল সরণী। সামনে জের্বিনস্কি রাস্তা। কপাল আমার ভালো। যে বাড়িতে আমার জন্ম, সেটা দৃই সাহিত্যিক ও একজন খ্যাতিনামা বিপ্লবীর নামাঙ্কিত রাস্তার মাঝখানে। ফের পড়ি, ‘এখানে ছিলেন হেৎসেন’। পড়তে

যেমন গর্ব হয় তেমন কষ্ট। এই বাড়িতেই আমি লিখেছিলাম আমার প্রথম কবিতা, প্রথম গদ্য। হেৎসেনের পরেও টিকে আছে বাড়িটা, আমার পরেও টিকে থাকবে। শহরটা গড়া হয়েছিল অনেক দিনের মেয়াদ মনে রেখে। তাই ভেবে আনন্দ হয় যে বাড়িটা কমিউনিজমের আমলেও খাড়া থাকবে — আয়ু তার তখনো ফুরবে না।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।
আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union